সন্দেশ

ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

মাঘ ১৪০২

চলছে

সত্যজিৎ রায়ের

অপ্রকাশিত, সম্পূর্ণ

ফেলুদা-উপন্যাস

ইন্দ্রজাল রহস্য

সম্পাদক

লীলা মজুমদার

বিজয়া রায়

Hard Copy,Scan & Edit - Debjyoti

This e-copy is scanned and preserved by Dhulokhela Team Members

Anyone Can Contribute to our project by giving their rare magazines for scan.

Reach us at
optifmcybertron@gmail.com

সন্দেশ

টেলিভিশন-পোস্টার

গ্র্যানাডা নিবেদিত

'শার্লক হোমস্'

জেরেমি ব্রেট (হোমস্)

এডওয়ার্ড হার্ডউইক (ওয়াটসন)

১৩২০/১৯১৩ সালে উপেন্দ্র কিশোর রায়চৌধুরী প্রতিষ্ঠিত
ছোটদের সেরা মাসিক পত্র

তৃতীয় পর্যায় বর্ষ ৩৫ সংখ্যা ১০। মাঘ ১৪০২ ফেব্রুয়ারী ১৯৯৬

পোস্টার। শার্লক হোমস্।
গোয়েন্দা সন্দেশ। রেবন্ত গোস্বামী। ৯
নিকুঞ্জের ন্যাকামি। লীলা মজুমদার। ১১
একশ তিয়াত্তর পয়েন্ট দুই। দীপঙ্কর সরকার। ২৭
খেরোর খাতা। সত্যজিৎ রায়। ৩৩
ইন্দ্রজাল রহস্য। সত্যজিৎ রায়। ৪০
সোনার খনির সন্ধানে। নলিনী দাশ। ৪৯
রুদ্ধ ঘরের রোমাঞ্চ। অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়েল,
অনুবাদ ঃ রত্না সান্যাল ভট্টাচার্য। ৫৬
শানিদার গুহার রহস্য। দিলীপ মজুমদার। ৭৬
সব হতে আপন। মীরা মুখোপাধ্যায়। ৭৮

কুইজের উত্তর। ৮০
ফেলুদা ফটো অ্যালবাম। সন্দীপ রায়। ৮১
ভাইপোর সন্ধানে লুবিন খুড়ো। উইলিয়াম হিথ-রবিনসন।
অনুবাদ : চিত্রলেখা বসু। ৮৯
কিঙ্কর হত্যা রহস্য। তপন বন্দ্যোপাধ্যায়। ৯৬
প্রতিযোগিতা। ১০৭
এমন কী দূর। শৈলেন কুমার দত্ত। ১১২
ঘাসফুল। রমিতা সেনগুপ্ত। ১১২
ফেলুদা ইলাস্ট্রেশান এ্যালবাম। সত্যজিৎ রায়। ১১৩
রকেট অন্তর্ঘাত রহস্য। অমিতানন্দ দাশ। ১২১
খেলাধুলো ঃ বিশ্বকাপের টুকরো খবর। প্রসাদরঞ্জন রায়। ১৩৭
হাত পাকাবার আসর। ১৪১

ফেলুদা ক্যালেন্ডার

প্রচ্ছদ : সন্দীপ রায়
অলঙ্করণ : উইলিয়ম হিথ-রবিনসন, সত্যজিৎ রায়, সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়, দেবাশীষ দেব, সমীর দাস, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য
নামাঙ্কন : সত্যজিৎ রায়, শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য, সন্দীপ রায়

সম্পাদক
লীলা মজুমদার
বিজয়া রায়
সহযোগী সম্পাদক
সন্দীপ রায়
শিল্প বিভাগ
সন্দীপ রায়। শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

কালি প্রিন্টার্স অ্যান্ড বাইন্ডার্স, ১০৯বি কেশবচন্দ্র সেন স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০০৯ থেকে মুদ্রিত
সন্দেশ কার্যালয়, ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ কলকাতা ৭০০০২৯ থেকে অমিতানন্দ দাশ কর্তৃক প্রকাশিত
স্বত্বাধিকারী : সুকুমার সাহিত্য সমবায় সমিতি
দাম ২০ টাকা

অনিবার্য কারণবশতঃ ফেলুদার সঙ্গে আড্ডা এবং আরও কিছু বিভাগীয় রচনা এমাসে যাবে না। প্রকাশিত হবে
পরবর্তী সংখ্যায়

নতুন 'সন্দেশ'-এর নতুন আকর্ষণ!

পুরনো 'সন্দেশ' থেকে

আধুনিক বাংলা শিশু-সাহিত্যের জনক উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী। তাঁর-ই হাতে 'সন্দেশ' পত্রিকার পত্তন ১৩২০/১৯১৩ সালে। প্রথম দুই পর্যায়ে 'সন্দেশ' সম্পাদনা করেছেন আরও দু'জন। সুকুমার রায় ও সুবিনয় রায়। ১৩৬৮/১৯৬১ সাল থেকে তৃতীয় পর্যায়ে 'সন্দেশ'-এর সম্পাদক হয়েছেন পাঁচজন। সত্যজিৎ রায়, সুভাষ মুখোপাধ্যায়, লীলা মজুমদার, নলিনী দাশ ও বিজয়া রায়। এই তিন আমলেরি পুরনো 'সন্দেশ' থেকে বাছাই করা দারুণ সব লেখা এবং ছবি—নতুন 'সন্দেশ'-এর নতুন আকর্ষণ!
গল্প, উপন্যাস, জীবন-কথা, ছড়া ও কবিতা, প্রবন্ধ, ভ্রমণ-কাহিনী, স্মৃতিকথা, নাটক, রূপকথা-উপকথা, বিজ্ঞান, ইতিহাস, কমিক্স, এমনকি ইলাস্ট্রেশন—মাসে মাসে কিছু-না-কিছু থাকছেই—আহা, সাত রাজার ধন! চিরকেলে, অফুরন্ত হীরে-মানিক!
মনে রেখো, 'সন্দেশ' শুধু ছোটদের সেরা মাসিকপত্র-ই নয়, ১৯১৩ সাল থেকেই ভারতবর্ষের একটা জোরালো সাংস্কৃতিক আন্দোলন!

সন্দেশ

লীলা মজুমদার ও বিজয়া রায় সম্পাদিত
ছোটদের সেরা মাসিকপত্র

সন্দেশ কার্যালয় ১৭২/৩ রাসবিহারী অ্যাভিনিউ, কলকাতা ৭০০০২৯। ফোন ৪৬৬-৪৯১৯
নিউ স্ক্রিপ্ট-এর দোকান এ-১৪ কলেজ স্ট্রিট মার্কেট, কলকাতা ৭০০০০৭

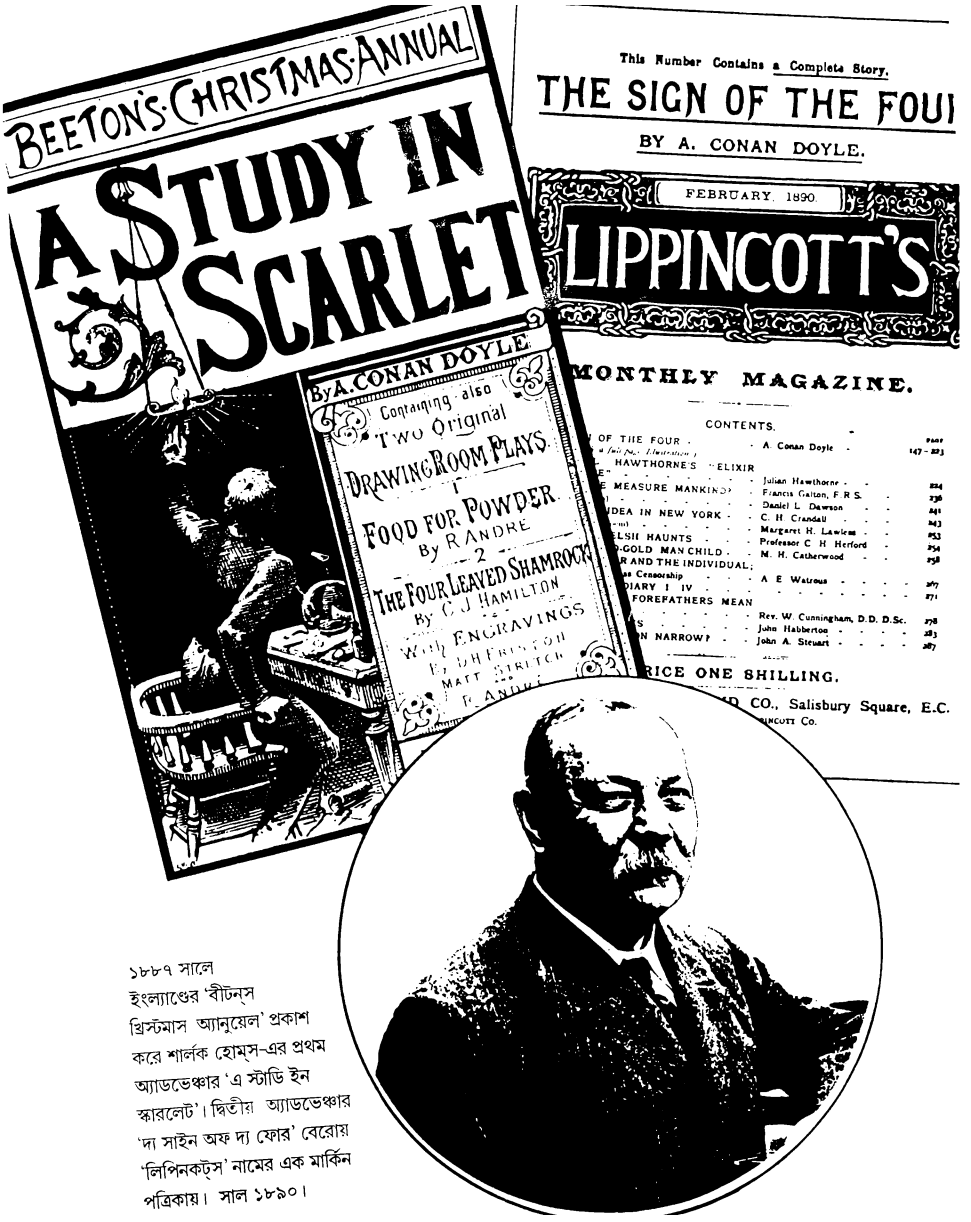

১৮৮৭ সালে ইংল্যাণ্ডের 'বীটন্‌স খ্রিস্টমাস অ্যানুয়েল' প্রকাশ করে শার্লক হোমস-এর প্রথম অ্যাডভেঞ্চার 'এ স্টাডি ইন স্কারলেট'। দ্বিতীয় অ্যাডভেঞ্চার 'দা সাইন অফ দ্য ফোর' বেরোয় 'লিপিনকট্‌স' নামের এক মার্কিন পত্রিকায়। সাল ১৮৯০।

মাঘ ১৪০২ সন্দেশ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৬

গোয়েন্দা-সন্দেশ

রেবন্ত গোস্বামী

হোক না যতই ঘুঘু পালাবে কোথায় পাখি?
যেখানে সে উড়ে আজ যাক না—
আছে প্রিয় টিকটিকি
শেষে দেখো ঠিক ঠিকই
পাকড়াবে তার দুটোপাখনা।

ঐ তো পাইপ মুখে শার্লক হোম্‌স্ দেখি
বলছেন, 'শুনে নাও ডাক্তার,
হোক খুনী যত পাকা
কোথাও সে রাখে ফাঁকা—
আমি শুধু খোঁজ করি ফাঁকটার।'

ধূমায়িত কাপ হাতে সুব্রতকে বলেন
দিক্‌পাল গোয়েন্দা কিরীটী,
'কিছু ধোঁয়া পুরে দিতে
বুদ্ধির গোড়াটিতে
খুলে গেল রহস্য-সিঁড়িটি।'

মাথাটায় টোকা দিয়ে বেঁটে গুঁফো বললেন,
'দরকার কিছু নেই যাওয়ারও।
জানেন না— খাটিয়েই
দামী মশলাটি এই
কাজ করে এরকুল পোয়ারো?'

জয়ন্ত বলে ডেকে, 'মানিক, দুখানা নয়,
তিনখানা ডিশ করো প্রস্তুত।
কেস হাতে সকালেই
সুন্দরবাবু এই
আসছেন— শোনো ঐ ভারি বুট।'

'গোয়েন্দা গল্পে কি 'করিয়া' 'খাইয়া'-গুলো
পাঠকের ভালো লাগে পড়তে?
অজিতটা হলো কী যে'
ব্যোমকেশ বলে, 'নিজে
হবে বুঝি কলমটা ধরতে।'

ফেলুকে মৌন দেখে তোপ্‌সেকে কাছে ডেকে
চুপি চুপি বললেন জটায়ু,
'ভেরী সাসপিশাস ঐ-
লোকটা— কী দশাসই!
আমার তো ভয়ে প্রাণ গতায়ু।'

রহস্য জটগুলো খুলেছেন একে একে,
কে না চেনে কর্নেল নামেতে?
'জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা
দুইয়ে আনে সফলতা'—
চিঠিতে জানান তিনি খামেতে।

'গোয়েন্দা সবই দেখি বয়সী পুরুষ কোনো
তাও তারা কাজ করে একাকী।
গন্ডালু আমরা যে
ব্যর্থ কি কোনো কাজে—
সন্দেশে পড়ো নি সে লেখা কি?'

বইয়ে পড়ি এইসব গোয়েন্দা নায়কেরা
যেই হাতে তুলে নেন কেস্‌টা,
মক্কেল খুশি আর
দুশমনও হুঁশিয়ার—
বানচাল হবে সবই চেষ্টা।

যতই অজেয় হ'ন বুদ্ধি ও দৃষ্টিতে,
আটুন যত না কিছু ফন্দি—
পাঠকের কাছে ওঁরা
চিরকালই দেন ধরা,
তার হাতে দু'মলাটে বন্দি।

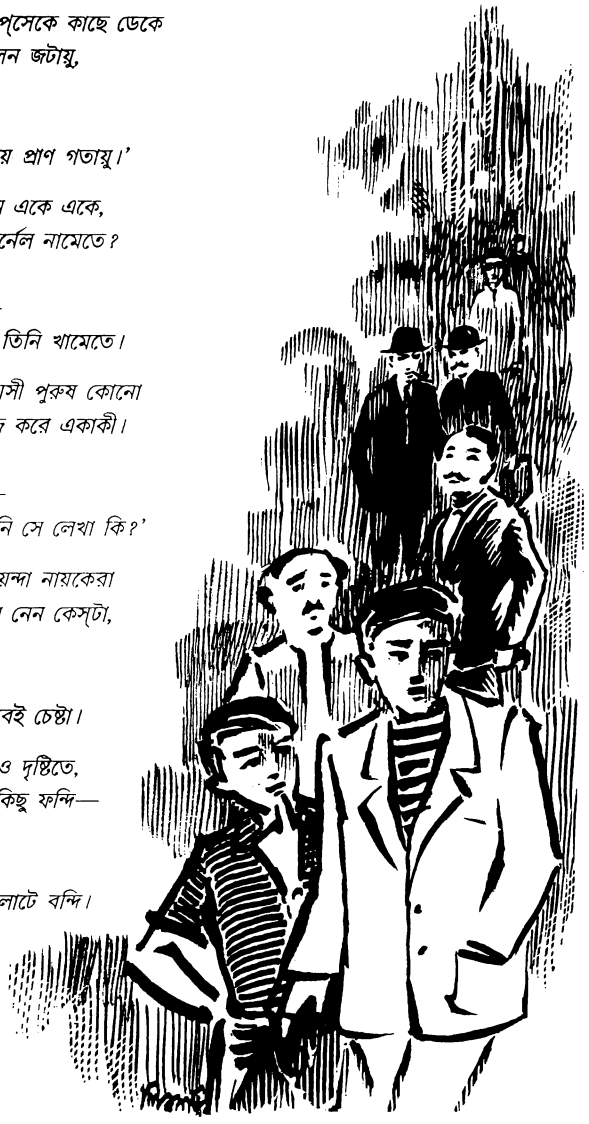

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

নিকুঞ্জের ন্যাকামি

লীলা মজুমদার

গোয়েন্দা আপিসে চাকরি পেয়ে অবধি গুপির ছোট মামার দিনগুলো নানারকম লোম-হর্ষক অভিজ্ঞতায় ভরে থাকত। গুপি হিংসায় জ্বলে যেত। অঙ্ক ভুল করত। তাই নিয়ে স্কুলে আর বাড়িতে দু'জায়গায় অশান্তি হত। গুপির দাদামশাই মাঝে মাঝেই ওর বাবাকে বলতেন, 'ভাগ্যিস' চাঁদুর চাকরি-স্থল বর্ধমানে, নইলে তোমার ছেলের পড়াশুনা হয়েছিল আর কি!' অথচ ছোট মামা যখন কলকাতায় আসত তখন ওর জন্য বড় বড় চিংড়ি মাছ খুঁজে আনা হত; গয়লাবাড়িতে গিয়ে বেশি করে দুধ চোখের সামনে দুইয়ে আনা হত, নইলে নাকি পায়েস ভালো হত না। বলা বাহুল্য সেই দুদিন গুপিকে দাদুর বাড়িতে যেতে দেওয়া হত না, যাতে ছোট মামার ওর উপর বড় বেশি প্রভাব বিস্তার করতে না পারে। গুপির হাসি পেত। কারণ তাতে গুপির খুব বেশি অসুবিধে হত না। যেহেতু রবিবারে পানুদের বাড়িতে গিয়ে, বড় মাস্টারের গল্প শোনা আর রামকানাইয়ের হাতে তৈরী ভালো মন্দ খাওয়া আজকাল একটা নিয়মের মধ্যে দাঁড়িয়ে গেছিল। পানুর মাঝে পায়ের অসুখ হয়ে চলাফেরা বন্ধ হয়ে গেছিল, এখন সে-সব একেবারে সেরে গেছে। এবার সে স্কুলের স্পোর্টসে যোগ দিয়ে বেগুন-তোলা রেসে প্রথম হয়ে 'দুর্গমের দুঃসাহসী' বলে একটা বেজায় ভালো বই প্রাইজ পেয়েছিল। সেই বই পড়ে গুপির আর পানুর চুল খাড়া। ছোট মামাও বইটা চেয়ে নিয়ে বর্ধমানে গিয়ে পড়েছিল। ফিরিয়ে দেবার সময় বলেছিল, 'বই মন্দ তা বলছি না, কিন্তু আমার একেক দিনের অভিজ্ঞতা এর চেয়েও শত-গুণে রহস্যময় ও রোমাঞ্চকর।'

আশা করি এর থেকেই সবাই বুঝতে পেরেছে যে পানুদের বাড়িতেই ছোট মামার গুপির সঙ্গে দেখা হত। মাঝে মাঝে পানুর মেজ কাকা আর তাঁর সি-আই-ডি বন্ধু কানু সামন্তও এসে হাজির হতেন। দু' একবার দিল্লীর পুলিসের চীফ বিনু তালুকদার পর্যন্ত এসে-ছিলেন। সেই নেপোর বইয়ের ব্যাপারটা থেকে এদের নিজেদের একটা দলের মতো উঠেছিল। বিনু তালুকদার অনুপস্থিত থাকলেও সে-ই ছিল এক রকম দলের চাঁই।

পুজোর ছুটির আগের রবিবার সকালেই গুপি শুনেছিল যে ছোট মামা এসেছে দেখা করে যেতে, কারণ ছুটিতে তার আসা হবে না। নাকি কোনো বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কাজের ভার তাকে দেওয়া হয়েছে। শুনে বড় মাস্টার মুখের উপর একটা হাত ঢাকা দিয়ে একটু খক্ খক্ করে কেশে নিয়ে, অন্যমনস্কভাবে কাঠের ঠ্যাঙের উপর খানিকটা চুলকে নিলেন। বলা বাহুল্য এই শেষের ব্যাপারটা ঘটেছিল সেই রবিবার সন্ধ্যার আগে পানুদের বাড়িতে।

বড় মাস্টার সবে বরানগরে তাঁর মামার বাড়িতে গুপ্তধন আবিষ্কারের রোমাঞ্চময় এক গল্প ফেঁদেছেন, এমন সময় স্বয়ং ছোটমামা এসে উপস্থিত। অমনি তখনকার মতো গল্পটা শিকেয় তোলা রইল। তার বদলে ছোটমামাকেই সবাই ঘিরে ধরল। পাশের ঘর থেকে নেপো বেড়ালের ফ্যাঁস ফ্যাঁস আর মেঝের উপর নখে শান দেবার খড়-খড় শব্দ শোনা যাচ্ছিল। আজকাল রবিবার বিকেলে তাকে ঘণ্টা তিনেক কুকুরের কলার আর চেন্ দিয়ে বেঁধে রাখতে হয়। তা না হলে বড় মাস্টার মশাই আর ছোটমামা দুজনের ছাল-চামড়া আস্ত থাকত না।

বড় মাস্টারমশাই উঠে পড়লেন, নাকি নুন গোলায় তাঁর নতুন ছাত্রকে সাত দিনে সত্তরটা অঙ্ক শিখিয়ে দিতে হবে। উনি চলে গেলেই ছোটমামা পা গুটিয়ে আরাম করে বসে বলল, 'হ্যাঁরে পানু, আমি যদি এখন কিছু না খাই, তা হলে রাতে কি আটটার মধ্যে রামকানাই আমাকে কিছু খাইয়ে দিতে পারবে? সাড়ে নটার ট্রেনটা ধরে বর্ধমান যেতে চাই।'

রামকানাই ছোটমামার সামনে একপেয়ালা চা আর ফুলকপির শিঙ্গাড়া নামিয়ে রেখে বলল 'ও আবার নতুন কি কথা হল? প্রত্যেক রবিবার ত রাতে না খেয়ে ওঠেন না।' পানু বলল 'রামকানাইদা থামো।' আরেকটু সন্ধ্যা হতেই, একবার চারদিকে তাকিয়ে দেখে ছোটমামা নিচু গলায় বলল, 'তোরা একটু কাছে আয়। কে কোথায় শুনে ফেলবে ভয় করে। তদন্তের সময় সাবধানের মার নেই।'

'কিসের তদন্ত, ছোটমামা, সেই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা নাকি?'

পানু গুপি আরো কাছে ঘেঁষে বসল। 'ঠিক তাই। মুস্কিল হয়েছে যে আমার দুজন হেল্পার দরকার। কিন্তু কাজটা খুব বিপজ্জনক। প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। ভাবছি তোদের সাহসে কুলোবে কি না।'

শুনে দুজনেই রেগে গেল। 'আহা, কি কাজ তাই বল না। তোমার চেয়ে আমাদের কম সাহস নাকি? তা হলে আর আমাদের বেছে নিতে না।' ছোটমামা একটু হাসল। 'অসাধারণ সাহসের জন্য তোদের বেছে নিচ্ছি না। তোরা লোকের ভিড়ে বেমালুম মিলিয়ে যেতে পারবি বলেই বলছি। কাক-পক্ষীও তোদের গোয়েন্দার চর বলে চিনতে পারবে না। আচ্ছা, ঢিল-টিল ভালো ছুঁড়তে পারিস্ তো?'

গুপি বিরক্ত হয়ে বলল, 'ভালো ছুঁড়তে পারি মানে?' 'মানে আমার গায়ে-পায়ে লাগবে না তো? আমার আবার একটু লাগলেই বড্ড লাগে। ব্যথা ট্যথা একেবারে সইতে পারি না। শরীরে ভিটামিন ডি'র অভাব।'

গুপি বলল, 'বাজে কথা রাখ। কিন্তু যাব কি করে? বাড়ি থেকে দিলে, তবে তো যাব।'

ছোটমামা কাষ্ঠ হাসি হাসল, 'চাঁদু অত কাঁচা কাজ করে না হে। তোদের অঙ্কর স্যার আমার ছোটবেলার বন্ধু, তা জানিস্? সে-ই তোদের গার্জিয়ানদের বলে, তোদের বর্ধমনে তার বাড়িতে নিয়ে গিয়ে অঙ্ক কষাবে!'

পানুরা তো হাঁ। পুজোর ছুটিতে অঙ্ক কষতে হবে? ছোটমামা উঠে দাঁড়াল। 'থাক্, তবে দরকার নেই। আমার কপালে যা থাকে হবে। নেপোকে তো একাই খুঁজে এনে দিয়েছিলাম। ব্যাটা এখন আমাকে খামচালে কি হবে।'

রেগে চলেই যাচ্ছিল। কিন্তু পানু ছুটে গিয়ে তাকে জাপ্টে ধরতেই ধপাস্ করে সে তক্তাপোষের উপর বসে পড়ল। 'তুমি গার্জিয়ানদের রাজি করাও, ছোটমামা, আমরা গিয়ে অঙ্ক কষব। তাকে কি হয়েছে। অ্যানুয়েলে বেশি নম্বর পাব।'

ছোটমামা বলল, 'বেশি হাতি পাবি! অঙ্ক কষবার কতটুকুই বা সময় পাবি। আর তার-ও হয়তো দরকার-ই হবে না। কারণ এও মনে রাখিস যে প্রাণ হাতে নিয়ে ঘুরতে হবে। এতটুকু ফস্কালেই হয়ে গেল। খালি তোদের মা-বাবাদের জন্য একটু দুঃখ হয়। কে জানে তারা হয়তো তোদের অভাবে কাতর হবে। কিছুই বলা যায় না।'

এই বলে ছোটমামা খাবারের সন্ধানে ও ঘরে সরে পড়ল। পানু একটু গম্ভীর হয়ে যাওয়াতে, গুপি বলল, 'চল্, বেশ মজা হবে। বিপজ্জনক না আরো

কিছু। ওর বড় সায়েব কোনো গুরুত্বপূর্ণ কাজ ওকে দিল আর কি! তবে গতবারের ভালুকের ব্যাপারটাও কম উপভোগ্য ছিল না! এবং আরেকটু হলেই বেশ গুরুতর-ও হয়ে উঠত। অন্ততঃ আমার পক্ষে।'

ছোটমামার যেমন বলা তেমনি কাজ! দেখতে দেখতে গার্জিয়ানদের সঙ্গে অঙ্ক স্যার সব ব্যবস্থা করে ফেললেন। এর মধ্যে যে আবার ছোটমামা আছে সেটা ঘুণাক্ষরেও জানা গেল না। মহালয়ার দিন সকালে একটা লড়ঝড়ে পুরনো ডজ্ গাড়িতে করে অঙ্ক স্যার এসে গুপি পানুকে তুলে নিলেন। গাড়ির চালকটিও তেমনি কিম্ভুত, রোগা টিংটিঙে, এক মুখ দাড়ি, একটা চোখের উপর সবুজ তাপ্পি লাগানো। ন্যাশনাল হাই-ওয়েতে পড়েই গুপি বলল, 'ও দাড়ি আমার চেনা। আর তাপ্পিটাও আমার সেই নাটকের হারানো তাপ্পিটা না?' চালক কাষ্ঠ হাসি হেসে দাড়ি তাপ্পি খুলে ফেলতেই, ভিতর থেকে ছোটমামা বেরিয়ে পড়ল। গর্বের সঙ্গে বলল, 'গাড়িটা একজনরা ফেলে দিয়েছিল। কুড়ি টাকা দিয়ে কিনে নিজে সারিয়েছি। সেই পুরনো লোহালক্কড় দিয়ে।' এরা শুনে অবাক। পথে ওরা পরটা আর কাবাব খেল। বর্ধমানে পৌঁছতে সাড়ে তিন ঘণ্টা লাগল। লোহালক্কড় আর পুরনো পার্টস দিয়ে সারানো পঁয়ত্রিশ বছরের পুরনো গাড়ি তার চেয়ে আর কত তাড়াতাড়ি যাবে?

বর্ধমানে পৌঁছবার কিছু আগে একটা হিম-ঘর আছে। সেখানে আসতেই, অঙ্ক স্যার বললেন, 'চাঁদু, একটু অসাবধান হয়ে পড়ছ নাকি?' ছোটমামা গাড়ি থামিয়ে তাড়াতাড়ি দাড়ি তাপ্পি পরে অচেনা লোক হয়ে গেল। তারপর যেই গাড়িতে স্টার্ট দিয়েছে, অমন একটা কালো অ্যাম্বাসাডর ওদের গা ঘেঁষে হুস্ করে বেরিয়ে গেল। গাড়িতে একজন আধাবয়সী মোটা ভদ্রলোক বাজপাখির মতো চোখ করে ওদের এক নজর দেখে নিলেন, এইটুকু গুপির চোখে পড়ল।

বর্ধমান স্টেশনের পিছন দিয়েই শের শা'র তৈরি সেকালের গ্র্যাণ্ড ট্র্যাঙ্ক রোড গেছে, এখন তাকে ন্যাশনাল হাইওয়ে টু বলে। তারি উপরে একটা খাবারের দোকানের মাথায় ছোটমামার আপিস। ছোটমামা তার সুটকেস নিয়ে সেইখানেই নেমে পড়ল। অঙ্ক স্যার চালকের জায়গায় বসলেন। পানু গুপি বেশ নার্ভাস। কিন্তু উনি বেশ দক্ষভাবেই আরো খানিকটা এগিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের একটা সরু গলি ধরে, ধান খেত পেরিয়ে, তালপুকুর ছাড়িয়ে, হয়তো মাইল পাঁচেক গিয়ে একটা ছোট গ্রামে ঢুকলেন। বড় বড় আম কাঁঠাল গাছে ঘেরা গাঁ, চারদিকে ধান খেত, মাঝখান দিয়ে পথ গিয়ে গ্রামটাকে দুই ভাগ করে দিয়েছে। ডান দিকে একটা কাঠ-গুদাম তারপরে একটা কালো দীঘি, তারপরে একটা পাঁচীল-ঘেরা শ্যাওলা ধরা পুরনো দোতলা বাড়ি। তার চার দিকে ফল-ফুলের বাগান, অযত্নে জঙ্গল হয়ে রয়েছে। সবটাই কেমন নড়বড়ে পোড়ো-পোড়ো দেখাচ্ছিল। খালি এক মানুষ উঁচু পাঁচীলটা আর লোহার পাতের ফটকটাকে সদ্য মেরামত করা হয়েছে বোঝাই যাচ্ছিল।

অঙ্ক স্যারে তিনবার হর্ন দিতেই গেটটা খুলে গেল। ওরা ভিতরে ঢুকতেই পানু গুপি স্তম্ভিত হয়ে দেখল বাড়ির এক পাশে সেই কালো অ্যাম্বাসাডর গাড়িতে ঠেস দিয়ে বাজপাখি ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে। তাঁর আদ্দির পাঞ্জাবীর একটা পকেট এমন ভাবে ছিল যে দেখেই বোঝা গেল ভিতরে কম করেও একটা বিভলবার আছে। গুপিদের হাত পা হিম। এই নাকি প্রাণ হাতে করে রে বেড়ানো? অঙ্ক স্যার কিন্তু হাসি মুখে এগিয়ে গিয়ে বললেন, 'এদিকে সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন তা হলে, কাকা?' লোকটি কাষ্ঠ হেসে বলল, 'এরা কারা?'

অঙ্ক স্যার আড় চোখে গুপিদের দিকে চেয়ে নিচু গলায় বললেন, 'কাকাকে প্রণাম কর। এরা আমার দুটি ছাত্র, কাকা, ছুটিতে একটু কোচিং নেবে।' কাকা তাই শুনে হো-হো করে হেসে উঠলেন, 'তা হলে যেমন গুরু তেমনি চ্যালা বল! কিন্তু সাবধানে কাজ কর, ব্যোমকেশ। সবাইকে সব কথা বলে কাজ নেই। গাড়িটা বুঝি সের দরে কিনলে?' এই বলে কাকা চলে গেলে অঙ্ক-স্যারকে একটু গম্ভীর মনে হল। গেটটা ভিতর থেকে তালা দিয়ে বাড়ির চওড়া বারান্দায় গিয়ে উঠলেন। অমনি ভিতর থেকে টিকলো নাক, টিংটিঙে

রোগা একটা গেঞ্জি-পরা লোক বেরিয়ে এসে, গাড়িটাতে স্টার্ট দিয়ে বাড়ির পিছন দিকে চলে গেল। অঙ্ক স্যার জিজ্ঞাসা করলেন 'কেমন লাগছে?' ওরা চমকে উঠল। 'উনি কে মাস্টার মশাই?' 'শুনলেই তো, আমারে কাকা। এটা আমদের পৈত্রিক বাড়ি। একতলাটা ওঁর দোতলাটা আমার। ওঁর হার্টের ব্যামো। তবু উনিই দেখাশোনা করেন। আর দেখ, গুপি, তোমার ছোটমামার কথা ওঁর সামনে কখনো বলবে না, তা হলেই কিন্তু সব পণ্ড হয়ে যাবে। এবার চল, চানটান করতে হবে। অবিনাশ বেজায় ভালো রাঁধে। শুঁটকো লোকটার নাম অবিনাশ।'

দোতলায় পানুদের দক্ষিণমুখী ঘরে কে যেন ওদের ছোট স্যুটকেস দুটি রেখে গেছিল। দুটি সরু তক্তাপোষে পরিপাটি দুটি পাতলা তোষক দিয়ে বিছানা পাতা। জানলার সামনে সরু লম্বা একটা কাঠের টেবিল। একটা আলনা, একটা বেঞ্চি, একটা পুরনো কাঠের চেয়ার, দুটি টুল, অথচ ঘরের দেয়ালে আশ্চর্য সব নক্সা কাটা, পাহাড়-পর্বত নদী-সাগর। এদিকে বিজলি-বাতি নেই। বোধ হয় কোনো পূর্ব-পুরুষ শখ করে আঁকিয়েছিলেন।

বেজায় খিদে পেয়েছিল। তাড়াতাড়ি তোয়ালে সাবান নিয়ে ওরা বাড়ির পিছনে কুয়োর পাড়ে গেল। সেখানে একজন সামনের দাঁত ভাঙ্গা ষণ্ডা মার্কণ্ড লোক গামছা পরে দাঁড়িয়েছিলেন। সেই জল তুলে বালটি বালটি ওদের গায়ে মাথায় ঢেলে দিল। সে যে কি আরাম, যে ও ভাবে না নেয়েছে সে বুঝবে না। ওরা গা মাথা মুছছে, এমন সময় লোকটা জিজ্ঞাসা করল 'কোত্থেকে আসা হচ্ছে? কি উদ্দেশ্যে?'

বিনু তালুকদারের চ্যালার কানে কথাগুলো ঠক্ করে লাগল। এ তো জল তোলার লোকের ভাষা নয়। পানু বলল, 'ব্যোমকেশ বাবুর ছাত্র আমরা। ছুটিতে ওঁর কাছে পড়বে বলে এসেছি।' ওদের বুক ঢিপ ঢিপ করতে লাগল।

বিনু তালুকদারের বলেন, চারদিকে চোখ খাড়া রাখতে হয়। এতটুকু বেমানান কিছু চোখে পড়লে, সেই সূত্র ধরে অনুসন্ধান চালাতে হয়। যখন তখন শরীয় বিপদের সঙ্কেত দেয়। না শুনলে পস্তাতে হয়। ওদের প্রত্যেকটা লোমকূপে বিপদের সঙ্কেত।

গুপি বলল, 'তুমি কে?' লোকটা বলল, 'আমি নিকুঞ্জ।' এই বলে বালটি ভরে জল নিয়ে রান্নাঘরের দিকে চলে গেল। রান্নাবাড়িটা একতলা; আসল বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া। বড় সিঁড়ি দিয়ে নামলে একদিকে যেমন সদর দরজা দিয়ে বেরিয়ে যাওয়া য়ায়, তেমনি পিছনের দরজা দিয়ে ঢাকা অন্দরের বারান্দাতেও চলে যাওয়া য়ায়। সেটা গেছে সোজা রান্না ঘরে।

ওরা দোতলায় গিয়ে শুকনো কাপড় পরে, চুল আঁচড়ে সেইখানে গেল। দরজার কাছে থান পরা চুড়ো করে চুল বাঁধা মোটা একজন মেয়েমানুষ ওদের দেখেই খনখনে গলায় চেঁচিয়ে উঠলেন, 'এ আবার কাদের জুটিয়ে আনলিরে ট্যাপা? বলে এমনিতেই মাথার ঘায়ে কুকুর পাগল, আবার গোদের উপর বিষফোঁড়! তবে না—' অঙ্ক স্যার ছুটে এসে তাঁর মুখ চেপে ধরে বললেন, 'স্-স্-স্-চুপ, বড় পিসি, চুপ!' কিন্তু ল্যাকপ্যাকে অঙ্ক স্যার ঐ জাঁদরেলের সঙ্গে পারবেন কেন? একবার গা ঝাড়া দিতেই ট্যাপা ছিটকে খাবার ঘরের ও পাশে নিয়ে পড়লেন। ওরাও গুটি গুটি সেদিকে এগুল।

বড় পিসিমার খোঁপা খুলে গেছিল, বাঁধতে বাঁধতে বললেন, 'অ্যাই, খবরদার! আগে বল্ তোরা কে? খবরদার যদি ভাগ বসাবার চেষ্টা করেছিস্! আমি আগেই বলেছি—' নিকুঞ্জ একটা শুকনো কাপড় গায়ে জড়িয়ে এস উপস্থিত হতেই বড় পিসি থেমে কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলেন। নিকুঞ্জ গুপি পানুর দিকে ফিরে এদিকে সাদা সাদা মুক্তের মতো সুন্দর দাঁত বেরে করে, ওদিকে শ্যেনদৃষ্টিতে চেয়ে বলল, 'চল, চল, অবিনাশের রান্না খেলে আর ভুলবে না। পিসিমা পরিবেষণ করবেন। বসে পড়ুন ব্যোমকেশ বাবু, অত চিন্তার কি আছে?' অঙ্ক-স্যার ততক্ষণে উঠে পড়েছিলেন।

খাবার ঘরে সরু সরু টেবিল আর টুল পাতা। যেন অনেক লোকের বসবার ব্যবস্থা। কিন্তু বসল শুধু অঙ্ক স্যার আর ওরা দুজন, নিকুঞ্জ নাকি নিরামিষ ঘরে বড় পিসিমার হাতে খায়। তার কনুইয়ে উপরে এক

গোছা মাদুলী বাঁধা। সে একটা টুলে ছোঁয়া বাঁচিয়ে বসে রইল। খাবার পর ওরা যখন আঁচাতে গেল, অবিনাশ জল ঢেলে দিল।' পানু জিজ্ঞাসা করল, 'ঐ নিকুঞ্জ ওকি এখানে কাজ করে?' অবিনাশ ফিক করে হেসে বলল, 'তা করে। আবার করায়-ও বলতে পার।' এই বলে সে রান্নাঘরে গিয়ে ঢুকল।

অঙ্ক স্যারকে কাছের গোড়ায় দেখতে না পেয়ে, ওরা দোতলা নিজেদের ঘরে চলে গেল। ঘুম পেয়েছিল বেজায়; একে ভোরে ওঠা, তায়ে এতদূর গাড়িতে এসে, ভর পেট খাওয়া। চোখ জড়িয়ে আসছিল। বাস্তবিক বেজায় ভালো রাঁধে। সপাট শুয়ে পড়ল দুজনে। এর মধ্যে অঙ্ক স্যার দরজা ঠেলে ঢুকে বললেন 'দরজায় ভিতর থেকে খিল না দিয়ে কখনো শোবে না। এই রকম বিপজ্জনক কাজে হাত দিয়েছ আর এত অসাবধান! আর দেখ, চাঁদুর নাম মুখে আনবে না। অঙ্কের খাতাটাতা এনেছ আশা করি?' শুনে ওরা তো অবাক! অঙ্ক কষতে এসেছে আর খাতা আনবে না! অঙ্ক-স্যার ব্যস্ত হয়ে উঠলেন, 'হয়েছে, হয়েছে। অত উত্তেজিত হবার কি আছে? ও বেলায় বসা যাবে খন। ইয়ে-কি-বলে, ঐ নিকুঞ্জ, অবিনাশের সঙ্গে বেশি কথা না বলাই ভালো। দরজায় খিল দিও।' এই বলে উনি চলে গেলেন। গুপি উঠে দরজায় খিল দিতে দিতে বলল, 'ট্যাঁপা বড় খ্যাপা!' অমনি দুজনার ফিক-ফিক হাসি। হঠাৎ নিচে থেকে কর্কশ গলার আওয়াজ শোনা গেল। 'বড্ড বাড় বেড়েছে, না!! বের করে দেব এখান থেকে!! নিকুঞ্জর গলা মনে হল। হঠাৎ থেমেও গেল। মন্দ বলে নি ছোটমামা, দিন-গুলো রহস্য রোমাঞ্চে ঠাসা। সেই কথা ভাববে ভাবতে ওরা ঘুমিয়ে পড়ল।

দুই

ঘুম ভাঙ্গল দরজায় গুম্-গুম কীল আর প্রবল কড়া নাড়ার শব্দে। দরজা খুলতেই অঙ্কের বই হাতে অঙ্ক-স্যার আর খুঞ্চিপোষে, অর্থাৎ ছোট ছোট খুরো দেওয়া পুরনো এক বর্মী ট্রেতে তিন পেয়ালা চা আর ছোলার ছাতুর কচুরির সঙ্গে ঝাল ঝাল আলুর দম নিয়ে অবিনাশ ঢুকল। পাঁচ মিনিটের মধ্যে দোতলার ছোট চানের ঘরে হাত মুখ যায় ওরা এসে টুল টেনে সরু টেবিলে বসল। অঙ্ক-স্যার চেয়ারটাতে বসলেন।

আগে খাওয়া-দাওয়া হল। তারপর ঘরের দরজা খুলে রেখে, খুব জোরে জোরে ঘণ্টাখানেক অঙ্ক কষা। তার মধ্যে একবার বড়-পিসিমা আর একবার নিকুঞ্জ বাজে আছিলায় ঘুরে গেল।

নিকুঞ্জের পায়ের শব্দ কাঠের সিঁড়ি দিয়ে মিলিয়ে যেতেই, পানু লাফিয়ে উঠে বলল, 'নিশ্চয় আমাদের উপর— 'উঃ' অঙ্ক স্যার বেজায় জোরে ওর হাতে চিমটি কেটে, ঠোঁটের উপর আঙ্গুল রেখে চুপ করতে বললেন। তারপর দেয়ালের আঁকা সুন্দর ছবিগুলোর দিকে দেখিয়ে খুব জোরে জোরে বলতে লাগলেন, 'আমার ঠাকুরদার একজন চীনে বন্ধু এই ছবি এঁকেছিলেন, ছবির নাম রিভার অফ লাইফ। উপরে দেখ বরফের পাহাড়ের বুকে নদীর উৎপত্তি। ছোট নদী, তার তীরে ছোট্ট ছোট্ট ছেলেরা খেলা করছে দেখ। তারপর নদীতে কত উপনদী এসে মিলেছে, নদী-বড় হয়েছে। নদীর তীরে যারা পুঁথি নিয়ে পড়তে বসেছে, তারা আরেকটু বড় ছেলে। তারপর নদী এঁকে-বেঁকে পাহাড় থেকে সমতল মাটিতে নেমেছে। যারা মাছ ধরতে আর তীরের ধান-খেতে কাজ করছে, তারা আর ছোট ছেলে নয়, বয়সে যুবক হয়েছে। তারপর দেখ নদীর তীরে বড় বড় শহর গ্রামে; আধ বুড়োরা দোকানে বসে টাকা গুণছে। তারপর দেখ নদী প্রায় মোহানায় এসে গেছে, বুড়োরা তীরে বসে মালা জপছে। একেবারে শেষে দেখ নদী গিয়ে সমুদ্রে পড়েছে। থুথুড়ে বুড়োরাও বালির উপর দেহ রেখেছে। এই হল রিভার অফ লাইফ, জীবন-নদের বিখ্যাত প্রাচীন চীনে চিত্র। —পানু দেখতো দরজার বাইরে কেউ আছে কি না।' পানু গুপি অবাক হয়ে অঙ্ক স্যারের কথা শুনছিল। বাস্তবিক ছবিটা বড় ভালো। স্যারের কথায় চমকে উঠে পানু দরজাটা একটু ফাঁক করে দেখে এল।

'না, স্যার, কেউ নেই। খালি ঐ নিকুঞ্জ পা টিপে টিপে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল দেখলাম।' অঙ্ক-স্যার কাষ্ঠ হাসলেন। 'ঠিক যা ভেবেছিলাম। চল, এবার একটু বেড়িয়ে আসা যাক।' দরজা খোলাই রইল, যাতে যার খুসি এসে দেখে যেতে পারে। ওরা নিচে এসে, রান্না বাড়িতে উঁকি মারল। মাংসে মশলা মাখা হচ্ছিল। অবিনাশ মাখছিল। নিকুঞ্জ টুলে বসে দেখছিল। বড়-পিসিমা তোলা উনুনে পাটিসাপ্টা ভাজছিলেন। এক গাল হেসে নিকুঞ্জ বলল, 'বুঝতেই পারছ, খোকাবাবুরা, রাতের খাওয়াটি বেড়ে হবে। এ-সবের সঙ্গে লুচি, ছোলার ডাল, বেগুন-ভাজা। বেরুচ্ছ নাকি?'

অঙ্ক-স্যার বললেন, 'হ্যাঁ, গাড়িটা নিয়ে ওদের একটু শহর দেখাই। শুধু পড়লে শরীর নষ্ট হবে। অবিনাশ, গোয়াল ঘরের চাবি দাও, গাড়ি বের করি। নিকুঞ্জ টপ করে টুল থেকে নেমে পড়ল। 'চলুন, আমি খুলে দিচ্ছি।' চাবি তারি কাছে ছিল। রান্না বাড়ির ও-পাশে কলা-বাগানে, তার আড়ালে গোয়াল-ঘর। একটাতে দুটো গোরু দেখা গেল। একটায় তালা দেওয়া। নিকুঞ্জ খুলে দিল, অঙ্ক-স্যার গাড়ি বের করলেন।

সামনের ফটক-ও নিকুঞ্জ খুলল, আবার বন্ধও করল। আমরা শহরের দিকে চললাম। কিন্তু ছোটমামার আপিসের সামনে থামলাম না। গাড়ি আস্তে করে তিনবার পঁক পঁক করতেই দোতলার একটা জানলা দিয়ে একটা হাত একটা সাদা রুমাল নেড়ে দিল। অঙ্ক-স্যার আবার স্পীড বাড়িয়ে এগিয়ে গিয়ে ডান দিকে ঘুরেই, একটা বাঁশ বাগানের পাশে চায়ের দোকানের পিছনে থামলেন। বললেন, 'কোনো ভয় নেই, এটা আমার এক আত্মীয়ের দোকান। চাঁদুর রাঁদেভু, অর্থাৎ একসঙ্গে মিলবার স্থান।'

ততক্ষণে আলো কম আসছিল। ব্যস্ত হয়ে ওরা বারবার পথের দিকে তাকাচ্ছিল। এমন সময় উল্টো দিক দিয়ে সাইকেলে চেপে ছোটমামা এসে উপস্থিত। অঙ্ক-স্যারের কানের কাছে আচমকা ক্রিং করতে তিনি তো হাত-পা ছুঁড়ে ভির্মি যান আর কি! ছোটমামা কাষ্ঠ হেসে বলল, 'এই সাহস নিয়ে কাজে নামলে তো মার পৈত্রিক ধন উদ্ধার হল আর কি!' অঙ্ক-স্যার বললেন, 'আঃ চুপ। তোদের সঙ্গে আমাকে দেখা গেলে চলবে না। ওরা চিনে ফেলবে।'

এই বলে অঙ্ক স্যার অন্ধকারে গাড়ির মধ্যে গিয়ে বসলেন। ছোট মামা আমাদের নিয়ে চায়ের দোকানে ঢুকল। 'চাটা সত্যিকার খাওয়া নয়, শুধু এখানে বসে

থাকার অজুহাত, বুঝলি গুপি পানু। এর জন্য আপিস থেকে পঁয়তাল্লিশ পয়সার বেশি খরচ দেবে না। সামনের রাস্তার দিকে চোখ রাখ।' একটু পরেই বলল, 'ঐ যে! নজর করে দ্যাখ্।' ওরা দেখল দু'জন মহিলা, মাথায় কাপড়, পায়ে চটি, একজন আগে, একজন পেছনে হন্-হন্ করে হেঁটে চলেছে। 'নজর করে দ্যাখ। একজন বাঘ, একজন হরিণ, হরিণ যেমন বাঘের শিকার। তেমনি বাঘ হল আমাদের শিকার। চেহারা মুখস্থ করে নে, যাতে যে-কোনো সাজে চিনতে পারিস্। তোদেরই পাছু দিতে হবে, কারণ আমাকে এদিককার অনেকেই চেনে। যা, ওঠ! আবার দেখছিস্ কি? শেষটা শিকার হবে পগার-পার। আজ শুধু দেখে আয় কোথায় যায়। পরে সব খুলে বলব। লোমহর্ষক ব্যাপার।'

উঠে পড়ল দুজনে। যদিও মহিলার পিছনে গুপ্ত-চর লাগাটা ঠিক পছন্দ হচ্ছিল না। তবে টিকাটিকিদের অত ভাবলে চলে না। অন্যায়কারী ধরা নিয়ে কথা। কে যে বাঘ, কে যে হরিণ আর বলে দিতে হল না। একজনের জোরালো শরীর, বড় বড় পা ফেলে হাঁটে, মুখটা কালো তেলো হাঁড়ি। অন্যজনের পিক-পিক হাত-পা, খুর খুর করে অর্ধেক হেঁটে, অর্ধেক দৌড়ে চলে। খানিকটা পেছিয়ে পড়ে, আবার দৌড়ে সঙ্গিনীকে ধরে ফেলে। বাঘ যেন কিছুই দেখতে পাচ্ছে না এমনি ভাবে যাচ্ছে। খালি আলো পড়লেই মনে হতে লাগল, চোখ দুটো জ্বলছে। একটু একলা পেলে, একটু অন্ধকার পেলেই লাফ দিয়ে ঘাড়ে পড়তে কতক্ষণ!

পানু গুপি পথের অন্য ধার দিয়ে, যেন নিজেদের মধ্যে গল্প করতে করতে যাচ্ছিল। বাঘ গিয়ে একটা পোদ্দারের দোকানে ঢুকল; হরিণও খুর খুর করে ছুটে এসে, তার পিছন পিছন ঢুকল। ভিতরে লোকজন, আলো। গুপি পানু হাঁপ ছেড়ে বাঁচল। পানু বলল, 'কোথায় গেল দেখা হল। চল্, ফিরি। মাথা ধরে গেছে।'

খানিকটা যেতেই অন্ধকারের মধ্যে থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে ছোটমামা ওদের সঙ্গ নিল। 'কোথায় গেল?' 'পোদ্দারের দোকানে।' 'এই খেয়েছে!' বাঁশবনের ধার থেকে সরু গলায় গান শোনা যাচ্ছিল। ছোটমামা ছুটে গেল। 'ক্ষেপেছিস, ট্যাপা? সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করত চাস্ নাকি?' অঙ্ক-স্যার আমতা আমতা করে বললেন, 'সূর্য নেবার পর বাঁশ বাগান খুব ভাল জায়গা নয়, ভাই।' 'বোধহয় শুনে খুসি হবি যে ওরা পোদ্দারের দোকানে ঢুকেছে।' অঙ্ক-স্যার আঁৎকে উঠলেন। 'পোদ্দারের দোকানে? সে কি? ওরা সব পেয়ে গেল নাকি? নইলে যাদের পোড়ো বাড়ির ছাদ দিয়ে চাঁদের আলো ঢোকে, তারা গেছে পোদ্দারের দোকানে? কেন? পানু গুপি, তোমাদের কাছ থেকে এর উত্তর আশা করি।' ছোটমামা বলল, 'রাখ্, আর তেজ দেখাতে হবে না। ছেলেমানুষের উপর যত হামলা! তোমার আত্মীয়-স্বজনদের জন্য ওরা দায়ী নয়।' জোঁকের গায়েয নুন দিলে যেমন কুঁকড়ে ছোট্ট হয়ে যায়, অঙ্ক-স্যারের তেমনি হল। মুখে কোনো কথা নেই। সেই সুযোগে ছোটমামা তাপ্পি পরে ড্রাইভারের জায়গা দখল করল। স্ট্রার্ট দিতে গিয়েই রেগে উঠল, 'ইস্ ট্যাপা, তিন দিনেই দেখছি গাড়িটার দফা রফা করেছিস! গাড়ি-চালানো ছেলেঠ্যাঙানোর মতো অত সহজ নয়। না খেয়ে ঘুমিয়ে এত খাটলাম এটার পিছনে, হ্যাঁরে, তোর কি একটু দয়া-মায়াও নেই?'

বোধ হয় অঙ্ক-স্যারের একটু রাগ হল। বলে বসলেন 'গাড়িটাত আমার। আমি তো সেই কুড়ি টাকা দিয়েছিলাম নইলে আর তো কিনতে হত না। তখন তো তুই বাপে-তাড়ানো মায়ে-খেদানো বেকার যুবক। ট্যাক তোর গড়ের মাঠ। এখন না হয় কানু সামন্তের সুপারিশে টিকটিকি হয়েছিস্। মাইনে পাচ্ছিস্ কোয়ার্টার পাচ্ছিস্ আমাদের মতো — যাক্ গে। সে সব তুই বুঝবি না। ছোটমামা বলল, 'আরে তুই কি ঠাট্টাও বুঝিস্ না নাকি? এই আমাদের নিজেদের মধ্যে খ্যাঁচাখেঁচি করার সময় নাকি? ওরা পোদ্দারের দোকানে গেছে, তার মানে তো বুঝেছিস্ নিশ্চয় কিছু পেয়েছে।' উত্তেজনার চোটে অঙ্ক-স্যার চলন্ত গাড়ি থেকে নেমে যায় আর কি! ছোটমামা তাঁকে ভাগ্যিস চেপে ধরল।

'কি কি পেয়েছে?' 'হতে পারে উইল, নয়তো ধন-রত্ন।' অঙ্ক স্যার সীটের উপর এলিয়ে পড়লেন। ছোটমামা বেজায় বিরক্ত 'এতো মহা গেরো! নে, ওঠ্,

কোমর বাঁধ, ঝাঁপিয়ে পড়!'

ক্ষীণস্বরে অঙ্ক-স্যার বললেন, 'আমাকে কেন ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে. তোদের আপিসে টাকা দিই নি?' ছোটমামা ফ্যাক করে হেসে বলল, 'ওরাও দিয়েছে। কিছু বেশিই দিয়েছে।' 'এ্যাঁ কারা? কারা, কারা বেশি টাকা দিয়েছে?' 'দুজনরাই?' 'দুজনরাই মানে এরাও, আবার ওরাও।' অঙ্কস্যার বললেন। 'সব্বনাশ হয়েছে।' 'কিসের সর্ব্বনাশ? তোদের বড় সাহেবের মতো দুঁদে ডিটেকটিভ এ অঞ্চলে আর নেই। শুনেছি ওর কচ্ছপের কামড় একবার ধরলে আর ছাড়ে না।' 'তাহলে ওদেরই জয় হোক?' 'কাদের হবে? খুড়োর না পিসের? তারাও তা পরস্পরের শত্তুর। 'তুমি বাদ যাবে কেন? ভুলে যেও না, তোমার গুরুতর তদন্তের ভার আমার হাতে। আমি কি বসে আছি? দুজন দক্ষ চর লাগিয়েছি যাই বল্।' অঙ্ক-স্যার আমতা-আমতা করে বললেন, 'তিনপক্ষের হয়েই তোমরা তদন্ত করছ, এ কি খুব সৎ-কাজ হল?'

ছোট তো অবাক! ঘ্যাঁচ করে পথের ধারে অন্ধকারে গাড়ি থামিয়ে বলল, 'কিসের অসৎ? দুঃস্থ ওয়ারিশদের জন্য উইল আর সম্পত্তি খুঁজে দেওয়া কি খারাপ কাজ? 'তা নয়। কিন্তু তিনজন বিপক্ষ-দলীয় ওয়ারিশের হয়ে একজন'—'একজন আবার কোথায় পেলে? বড় সায়েব তার তিনজন সবচেয়ে দক্ষ ডিটেকটিভ লাগায়নি বলতে চাস্? ও উইল আর ধনরত্ন না বেরিয়ে যায় না। চল্, চল্, এখন আর রাত করলে হুঁকোমুখোর আবার সন্দেহ হবে। আবার দ্যাখ্, বিপদ্‌গ্রস্ত না হলে কেউ ডিটেকটিভ লাগায় না আমাদের বড়সায়েব কখনো বিপদ্-গ্রস্তকে ফিরিয়ে দেন না।'

ছোট মামা আপিসের পাশের গলিতে নেমে পড়ল। এতক্ষণে বোধ হয় খেয়াল হল যে গাড়িতে আরো দুজন আরোহী ছিল। বলল, 'ভালো কথা, ব্যাপারটা বোধ করি এতক্ষণে তোদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। পানু পিসির পিছনে আর গুপি খুড়োর পিছনে ছোঁক পাক করে ঘুরবি। কিন্তু খবরদার যেন ওরা টের না পায়। আমি কেঁচো খুঁড়ে সাপ বের করার আগেই যদি (এক) সেন-গুপ্ত, কিম্বা (দুই) সমাজপতি কৃতকার্য হয়, তাহলে আর আপিসে আমাকে মুখ দেখতে হবে না। কে জানে ওরাও হয়তো অলক্ষেও চর লাগিয়েছে। যাক ভেবে কাজ নেই। ট্যাঁপা বাড়িতে এ বিষয়ে ঠোঁট ফাঁকে করবি না। একটি লোককে বিশ্বাস করবি না। প্রত্যেককে সন্দেহের চোখে দেখবি। কাল সকালে দশটার সময়, ঠিক এই জায়গায় পানু অপেক্ষা করবি। হরিণ, বাঘ বাজার করে যখন ফিরবে, পিছন পিছন গিয়ে গতিবিধি লক্ষ্য করবি। গুপিকে খুড়োর বাড়ি দেখিয়ে দিস্ ফ্যাঁপা। সে বেরুলেই ফলো করতে হবে।'

গুপি বলল, 'কিন্তু ছোটমামা, খুড়ো যে আমাকে দেখেছে।' ভালোই তো, ভাববে যারা অঙ্কে এত কাঁচা, তারা আবার কি জানে!' ছোটমামা চলে গেলে ওরা দুজন অঙ্ক স্যারকে চেপে ধরল, 'স্যার, সব বাঁধা লাগছে। যেতে যেতে একটু ব্যাপারটা বুঝিয়ে না দিলে, শান্ত করা ভারি শক্ত।'

অঙ্ক স্যার দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'তা বলছি। কিন্তু ক্রমশঃ ব্যাপারটা এমনি ঘোরেল হয়ে দাঁড়াচ্ছে যে হতাশ হয়ে পড়ছি। শোন তাহলে। আমার ঠাকুরদা যেমনি চালাক তেমনি খেয়ালী ছিলেন। বেচা-কেনার ব্যবসা করে মেলা টাকা আর এই বর্ধমান করে দুটো বাড়ি করেছিলেন। মারা যাবার সময় ছোটবাড়িটা পিসির মেয়েকে আর বড় বাড়িটা ভাগাভাগি করে আমার বাবাকে আর খুড়োকে লেখাপড়া করে দিয়ে যান। তা ছাড়াও রাশি-রাশি ধনসম্পত্তি থাকার কথা ছিল, কিন্তু তার কোনো পাত্তাই পাওয়া গেল না। শুধু তাঁর উকীল শশধর মল্লিকের কাছে একটা সীল করা চিঠি রেখে গেছিলেন। খামের উপরে লেখা ছিল, 'আমার মৃত্যুর পনেরো বছর পরে খোলা হবে।' সেই চিঠি নিয়েই যত গোলযোগের শুরু।'

সামনে তিনটি সাইক্‌ল্ রিক্‌শ, একটা বাস, একটা গোরুর গাড়ি, তিনটে সাইকেল আর গোটা দশেক প্রাইভেট মোটর, দুটো ট্রাক্ আর পঁচিশটা পথযাত্রী পড়াতে, অঙ্ক-স্যারকে মিনিট পাঁচেক চুপ করতে হল। তারপর আবার বলতে লাগলেন।

'এই আষাঢ় মাসে ঐ পনেরো বছর শেষ হল শশধর মল্লিক আমাদের সামনে সীল ভেঙ্গে চিঠি পড়লেন। ঠাকুরদা এমনি বদ্-রসিক যে উইল লুকিয়ে রেখেছে। তিনজন ওয়ারিশের নাম দিয়েছে, এক, খুড়ো; দুই, পিসির মেয়ে টেঁপি; তিন, আমি। আমাদের মধ্যে যে উইল খুজে বের করতে পারবে, সে ব্যক্তি সম্পত্তির হদিস্ পেয়ে যাবে। কারণ সেটা উইলেই লেখা আছে। সম্পত্তির অর্ধেক তার, আর বাকিটা অন্য দু'জনের। এবার বুঝলে সমস্যাটা? উইল আমাদের খুঁজে পেতেই হবে। কারণ অন্যরা কেউ পেলে, যদি আমাদের ন্যায্য ভাগ না দিয়ে, বেমালুম চেপে গিয়ে নিজেই সব গাপ্ করে দেয়, তাই বা ঠেকাচ্ছে কে? বাড়ি-ঘর তো নয় যে দলিল থাকবে। স্রেফ টাকা, মোহর, সোনা, হীরে মণি-মুক্তো নিশ্চয়।

তারপর সে আর কি বলব, ঝগড়াঝাঁটি, রাগারাগি, পরস্পরকে সন্দেহ করা! পিসির বাত; বাড়ি থেকে বেরায় না। পিসে জুয়ো খেলে সর্বস্ব উড়িয়ে, স্বর্গে গেছে। পিসির মেয়ে টেঁপিকে পিসি কখনো শ্বশুর-বাড়ি পাঠায় নি। তারা নাকি গরীব। বেজায় চালাক পিসি, শুয়ে-পরামর্শ দেয়, টেঁপি সে-সব কাজে লাগায়। এদিকে ভয়ও আছে যথেষ্ট। এক ঝি রেখেছে সর্বদা তাকে সঙ্গে নিয়ে ঘোরে, কখনো একলা বেরোয় না। কাল তো তোমরা তাদের দেখেইছ। নিজেদেরই চলে না, ওর মাইনে দেয় কোত্থেকে কে জানে, এদিকে বাড়ির ছাদ দিয়ে জল পড়ে। একতলা ভাড়া দিয়েছে, ভাড়াটেদের সঙ্গে ঝগড়া হয়। এখন আবার পোদ্দারের দোকানে যাওয়া আসা কেন ভেবে পাচ্ছি না; নানা রকম সন্দেহ হচ্ছে।

আর খুড়োর কথা আর কি বলব। ঐ হিমঘরের সিকিউরিটি অফিসার হয়েছে। কি করে কে জানে। ঐখানেই থাকতে হয়, খাসা একখানা গাড়ি চড়তে পায়, অথচ এ বাড়িটাও দখল রাখতে চায়।'

গুপি বলল, 'তা চাইবে না কেন, স্যার? আপনিও তো কলকাতায় শ্বশুরবাড়িতে থেকে কাজকর্ম করেন, তাই বলে কি এ বাড়িটার অর্ধেক ছেড়ে দেবেন?'

চমকে উঠে অঙ্ক-স্যার প্রায় ল্যাম্প-পোস্টের সঙ্গে ধাক্কা লাগান আর কি? 'তুমিও তো কম যাও না, ছোকরা। সত্যি কথা বল, ওদের কারো চর নও তো?' শুনে গুপিও বেজায় রেগে গেল, 'কি বলছেন স্যার? আপনাকে সাহায্য করবার জনোই ছোটমামা আমাদের এনেছে, যাতে কারো না সন্দেহ হয়। আর আপনি আমাকে বিশ্বাসঘাতক বলছেন!' অঙ্ক স্যার অপ্রস্তুতের একশেষ। গুপির পিঠ চাপড়িয়ে দিতে গিয়ে গাড়িটা খানায় খেলেন আর কি! 'না, না কিছু মনে কর না, ভাবনা চিন্তায় আমার মাথার কি আর ঠিক আছে! তোমরাও ক্লান্ত। লুচি-মাংস ফেলে সব অন্য রকম মনে হবে, দেখো।'

বাস্তবিকই তাই। খাবার-দাবার তৈরিই ছিল, এদের জনোই অপেক্ষা করছিল। হাত ধুয়ে বসে পড়ল সবাই। তারপরে পিছনের বারান্দায় অবিনাশ হাত ধোবার জন্য গরম জল দিল। উপরে উঠবার সময় পানুর মুখে হাসি ধরে না। দুটো দুটো ধাপ এক সঙ্গে পার হতে লাগল। অঙ্ক স্যার পশ্চিমের ঘরটাতে ঢুকে পড়লেন। একবার শুধু ডেকে বললেন, 'মনে থাকে যেন, দরজায় খিল দিয়ে শোবে।'

ঘরে ঢুকেই দেখা গেল দেয়ালে ঝোলানো সবুজ ডোম দেওয়া ছোট একটা ল্যাম্প জ্বলছে। তক্তাপোষে দুটি মশারি। পায়ের কাছে সুজনি। খোলা জানলা দিয়ে ঝিরঝিরে হাওয়া দিচ্ছি। সত্যি মনটা ভালো হয়ে গেল। গুপি জানলার কাছে গিয়েই শিঠরে উঠল। পানু, শীগগির আয়। ঐ দ্যাখ্, খিড়কি দিয়ে বড়-পিসি বেরিয়ে যাচ্ছে না? এতরাতে বেরুনো তো ভালো বুঝছি না।'

পানু বলল, 'তা বেরুবে না কেন? সবে তো ন'টা বেজেছে। সারাদিন বেচারি হয়তো সময় পায় না। ওই নাকি এদের রাঁধুনি বামনী। ওরই রাঁধার কথা, অবিনাশের অন্য কাজ আর নিকুঞ্জ নাকি খুড়োর খেত খামার দেখে। ওভারসিয়ার। অঙ্ক-স্যার তো তাই বললেন।'

কাল বেলা দশটার মধ্যে কাজে লাগতে হবে, আর কথা নয়। দুজনে ঘুমের চেষ্টা করতে লাগল। একবার মনে হল কে দরজা ঠেলে দেখল, হয়তো অঙ্ক-

স্যার-ই হবেন। ঘর তো সারা বিকেল খোলাই ছিল! কারো সার্চ করার ইচ্ছা থাকলে করে গেছে নিশ্চয়। তারপর পায়ের শব্দ আস্তে আস্তে মিলিয়ে গেল। ওরা দুজনেও ঘুমিয়ে পড়ল।

তিন

পরদিন সকালে অবিনাশ দোতলায় ওদের ঘরেই চা টোস্ট ডিম পোচ এনে দিয়ে বলল, 'কাকা বোধ হয় দুগ্‌গো পূজো করবেন এখানে। খালি গোয়ালঘর থেকে গাড়িটা সরাতে বলেছেন।' অঙ্ক-স্যারও ওদের সঙ্গে চা খাচ্ছিলেন, তিনি গেলেন চটে। 'গাড়ি সরাতে হবে আবার কি? ঐ গোয়ালটা তো আমার। আমার অনুমতি না নিয়ে ওখানে কিছু হতে পারে না। খবরদার গাড়িতে হাতে দেবে না!'

অবিনাশ হাসল 'হাত দেবে না আবার কি? দেখন গিয়ে গাড়ি বাইরে টেনে ফেলে দিয়ে, দেয়ালে ঠুক-ঠুক করা হচ্ছে নাকি লাল সালুর উপর চাঁদমালা বসবে।'

অঙ্ক স্যার তো অবাক! বলে— গাড়ি তো লক্ করা, চাবি ওঁর কাছে, ঐ পুরনো ডজ্ গাড়ি পাঁজা কোলা করে তুলে বাইরে আনা কি চাট্টিখানি কথা? 'গাড়ি টেনে ফেললি কি করে, শুনি?' 'কেন, আঙ্গুল দিয়ে খুঁচিয়ে ব্রেক ছাড়ালাম, তারপর তার দিয়ে ইয়ে—' এই বলে অবিনাশ ধাঁ করে খালি ট্রে তুলে নিয়ে দে পিট্টান।

অঙ্ক-স্যার মাথা নেড়ে বললেন, 'আশ্চর্য!' তারপর অন্যমনস্ক ভাবে নিজের ডিম পোচ দুটো খেয়ে ফেলে, পানুর একটাও তুলতে যাচ্ছিলেন, তা পানু

দেবে কেন?

খাওয়াদাওয়ার পর হঠাৎ লাফিয়ে উঠে অঙ্ক স্যার বললেন, 'আর দেরি কেন? চটপট তৈরি হও, চাঁদুর কাছে যাওয়া দরকার। কিন্তু যাওয়া দরকার বললেই তো আর যাওয়া হয় না। সিঁড়ি অবধি গিয়ে দেখা গেল, সিঁড়ির মাথায় মজবুত টানা গ্রিলের দরজাটা কেউ টেনে বন্ধ করে ওদিক থেকে এই বড় তালা লাগিয়ে দিয়েছে। অঙ্ক-স্যার বসে পড়লেন। এই গ্রিল তিনিই করিয়েছিলেন, তালা তাঁরি কেনা। যাতে খুড়োর দল যখন তখন উপরে উঠতে না পারে তাই এই ব্যবস্থা। 'এখন নাও ঠ্যালা।' অঙ্ক স্যার মাথায় হাত দিলেন।

গুপি বলল, 'আমাদের আবার, ডিউটি আছে দশটায়। তার যে খুব বেশি দেরি আছে তাও নয়। ওঠ, পানু।' অঙ্ক-স্যার হাঁ। 'ওঠ পানু আবার কি? পাখি তো খাঁচায় বন্ধ।' পানু হাসল, 'বিনু তালুকদার বলেন সবার আগে পালাবার পথটি ঠিক করে রাখতে হয়। ছুঁচোরা তাই মাটির নিচের বাসার দুটি মুখ রাখে।' 'বিনু তালুকদার আবার কে?' পানু হঠাৎ গম্ভীর মুখ করে বলল, 'একজন লোক।' গুপি বলল, 'তা হলে আমরা যাই, স্যার? গাড়ি তো ওরা ঘেরাও করে রেখেছে। হেঁটে যেতে হবে বুঝতে পারছি। কাল স্যার, কাকার বাড়িটা তো দেখিয়ে দেননি? অবিশ্যি তার দরকার হবে না, কারণ কাকা অপারেশন-গোয়ালঘর চালাচ্ছেন। চলি।'

অঙ্ক স্যার মুখ তুলে বললেন, 'রোসো, বেরুবে কি করে? বিনু তালুকদারের পালাবার পথ ঠিক করেছ?' পানু বলল 'হ্যাঁ, স্যার।' 'হ্যাঁ? হ্যাঁ আবার কোথায়?' ঐ পায়খা— মানে বাথরুম দিয়ে, স্যার। ওর জানলার শিকে ঝাঁকি দিতেই দুটো খুলে এল। আপনার ঠাকুরদাকে স্যার, কনট্র্যাক্টর বেজায় ঠকিয়েছিল।' অঙ্ক স্যার এ-কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বললেন, 'তারপর কি করবে? ওখানে তো আর বাদুড়ঝোলা হয়ে থাকা যায় না।' 'না, স্যার। নিচে থেকে ঐ দিকটা দেখা যায় না। কার্নিশ ধরে একটু গেলেই ঐ বড় আমগাছটা পেয়ে যাবো। ওটা কি আপনার?' 'না, না, কাকার। তারপর বল।' 'তারপর আর কি! আমগাছের ডাল বেয়ে মাটিতে নেমে পড়ব। ওরা গোয়ালঘরে ব্যস্ত থাকুক। আমরা গেট টপকে সটকান দিই!' গুপি একটু বোকার মতো হাসতে লাগল।

অঙ্ক-স্যার লাফিয়ে উঠলেন, 'রাইট্! তবে তুমি যাবে না। তোমার শিকার তো এই বাড়িতেই রয়েছে। তুমি তার উপর শোনদৃষ্টি রাখবে। ঈগল পাখি যেমন ইয়ে—'

পানু বলল, 'ভেড়ার ছানার উপর—' গুপির রাগ দেখে কে! কেন স্যার, আমি সব ভালো জিনিস থেকে বাদ যাব কেন স্যার? তাছাড়া—' গুপির মুখটা একটু লাল হয়ে উঠল। স্যার বললেন, 'তাছাড়া কি?' পানু বলল, 'ও বলতে চায় স্যার, আপনার তা বয়স হয়েছে, আপনি কি আর জানলা বেয়ে, কার্নিশ পরিয়ে, আমগাছের ডাল ধরে নামতে পারবেন? তারপর গেট টপকাতে হবে।'

অঙ্ক-স্যার উঠে দাঁড়ালেন! 'কি, এত বড় কথা! তোমরা জান যে আমি যখন স্কুলে পড়তাম পরপর পাঁচ বছর আমি স্পোর্টসে অবস্টেকল্ রেসে থার্ড প্রাইজ পেয়েছিলাম। এই সামান্য কাজটুকু আমার কাছে কিছু নয়। তাছাড়া, আমার বয়স হয়েছে মানে কি? তেইশ বছরে কেউ বুড়ো হয় না। বুড়ো হতে অন্ততঃ তেত্রিশ হওয়া চাই।'

গুপি হাঁড়ি মুখ করে বলল, 'এখান থেকে গোয়াল-ঘর দেখা যায় না। চোখ রাখব কি করে? তার চেয়ে তিনজনেই যাই।' স্যার চটে গেলেন, 'এ কি রকম ডিসিপ্লিন তোমাদের দলের? একজনকে এটি আগলাতে হবে না? কেউ হাঁক দিলে তাকে ভাঁওতা দিতে হবে না?' 'আমাকে— আমাকে ছেলেমানুষ একা পেয়ে ওরা যদি সবাই মিলে—' স্যার হাসলেন। 'তোমাকে পেলে তবে তো! গ্রিল যেমন বাইরে থেকে তেমনি ভিতর থেকেও বন্ধ করা যায়। ওরাও ঢুকতে পারবে না। কিন্তু খবরদার, আমরা না ফেরা অবধি তালা খুলে দেবে না। এক যদি চাঁদু আসে। তবে তার বেশি সম্ভাবনা নেই, তার অনেক আগেই ওরা তাকে কচুকাটা করে দেবে।' গুপি না হেসে পারল না। 'কাকে

কচুকাটা করবে, স্যার? ছোটমামাকে? যে গোরিলা ঘোষালের সামনে থেকে জ্যান্ত ফিরে এসেছিল?' পানু বলল, 'হ্যাঁ স্যার। অতি সহজে। স্রেফ দৌড়ে।'

অঙ্ক-স্যার বললেন, 'তবে আর কোনো ভাবনা নেই। তালা দিয়ে আমরা দুজন বেরিয়ে যাই। গুপি, তুমি থাক। সমস্ত দোতলাটা তোমার রাজ্য। কারো কিছু বলার অধিকার নেই। এ-ঘর ও-ঘর করবে। নিজে আড়ালে থেকে, আমার ঘরের জানলায় গিয়ে কি হচ্ছে না হচ্ছে লক্ষ্য করবে। আর ইয়ে— কি বলে কাল যে-সব আঁক করালাম, তারপর থেকে কষে যাবে।' শুনে গুপি অজ্ঞান হয়ে যায় আর কি!

ভাগ্যিস্ বাথরুমটা যে-দিকে, সে-দিকের নিচেই ছোট আমবাগানটা। কাজেই ওদের প্রস্থান-পর্বটি কারো চোখে পড়ল না। অঙ্ক-স্যার একটু হুঁপ-হাঁপ করলেন বটে, কিন্তু নিরাপদে নিচে নেমে, দৌড়ে গিয়ে গেট টপকে, গুপিকে অবাক করে দিলেন। তবে হাঁটতে রাজি হলেন না। মোড় ঘুরেই একটা সাইকল্-রিক্স পেয়ে যাওয়াতে, হাঁপ ছেড়ে বাঁচলেন। বড়-রাস্তায় পৌঁছেই স্যার রিক্সটাকে ছেড়ে দিলেন। 'না হে, বড়ই রিস্কি। তুমি টেঁপির দলের পাছু নাও, তোমাকে কেউ চিনবে না। আমি ওর নিজের মামাতো ভাই, আমাকে চিনতে ওর বাকি নেই। তা-ছাড়া ওর ঐ ফেউটিকে বড় ভয় পাই। আমি একটু চাঁদুর আপিসে গিয়ে পরামর্শ এবং গা-ঢাকা দিই। গ্রিলে তালা দেওয়া মানেই কাকা আমাদের নজরবন্দী করে রাখতে চান। চাঁদুর সাহায্যে তাঁকে কেমন কলা খাওয়াই দেখো। আচ্ছা, এবার পথ দেখ।'

অঙ্ক-স্যার চলে গেলে পানু ছোটমামার দেখানো জায়গাটাতে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। বিনু তালুকদার তাই-ই বলেন। 'খবরদার, এক জায়গায় টার্গেটের মতো দাঁড়িয়ে থেকো না। ভিড়ের সঙ্গে মিশে হাঁটাহাঁটি করে বেড়াবে, তাহলে কারো তীর গায়ে লাগবে না।' পানু হাঁটাহাঁটি করতে লাগল। ভেবে আশ্চর্য হল যে দেড় বছর আগেও যে এক-পাও হাঁটতে পারত না, আজ সে স্বচ্ছন্দে দুর্বৃত্তদের পিছনে লেগেছে।

ঠিক এই সময় তারা দুজনে টুপ করে একটা অদ্ভুত সরু গলি থেকে বেরুল। বাঘ আর হরিণ। পাশাপাশি চলতে লাগল তারা খ্যাঁচাখ্যাঁচি করতে করতে। পানু লক্ষ্য করল আস্কারা পেয়ে পেয়ে হরিণের বেজায় বাড় বেড়ে গেছে। বাঘকে সে যা মুখে আসছে তাই বলছে। বাঘ মাঝে মাঝে তার দিকে আড়-চোখে চাইছে। মুনিবকে হরিণ এ রকম তাচ্ছিল্য করতে সাহস পাচ্ছে দেখে গুপি আশ্চর্য হয়ে গেল।

খট্ করে আবার বিনু তালুকদারের সেই কথা মনে পড়ে গেল— 'অস্বাভাবিক কিছু চোখে পড়লেই, সেই দিকে নজর রাখবে। কেউ দেখছে বলে যখন অন্যায়কারীরা সন্দেহ করে না তখন তারা স্বাভাবিক ব্যবহারই করে। এটা মনে রেখ।' এরা তা হলে অস্বাভাবিক ব্যবহার করছে কেন? এর মধ্যে কোনো রহস্য আছে। মেয়েদের উপর চোখ রাখতে হবে শুনে কাল ছোটমামার উপর একটু রাগ হয়েছিল। আজ পানু বুঝল ছোটমামার কি ভয়ঙ্কর বুদ্ধি।

হঠাৎ চোখে পড়ল বাঘের হাতের বাজারের থলিটার তলাটা কি রকম অস্বাভাবিক রকমে ঝুলে পড়েছে। পানুর গায়ের রক্তগুলো তাড়াতাড়ি চলতে শুরু করল। কালকের মতো রাস্তার অন্য ধার দিয়ে, ওদের চেয়ে হাত দুই পিছনে থেকে, পানু এগুতে লাগল। মেয়েমানুষ হলে কি হবে, বেশ পা চালিয়ে চলল ওরা। পানুরই বরং হাঁপ ধরে যাচ্ছিল। কোথায় যাচ্ছে আর বলে দিতে হল না এদিক-ওদিক এক নজর দেখে নিয়ে টুপ করে দুজনে আবার সেই পোদ্দারের দোকানেই ঢুকল। আজও দোকানে অনেক লোক। বাজারের থলি এতদূর বয়ে এনে ওদের বোধ হয় হাত ব্যথা হয়ে গেছিল। তাই থলি দুটোকে কাউন্টারের এক পাশে আড়াল করে রেখে, ওরা তর্ক করতে করতে ভিড় ঠেলে পোদ্দারের কাছে যাবার চেষ্টা করতে লাগল!

বিনু তালুকদার বলেন, 'সুযোগ কখনো ছাড়তে হয় না। আগে কাজ, তারপর বিচার। নইলে ব্রাহ্ম মুহূর্ত কারো জন্য বসে থাকে না।' কাজেই পানু আর অপেক্ষা করল না শ্যাঁৎ করে বাঘের লাল কালো ডোরা-কাটা থলি তুলে নিয়ে দে দৌড়!

আর যাবে কোথায়! সঙ্গে সঙ্গে ধর-ধর-পালাল-পালাল চোর চোর! পানু বেজায় অবাক হয়ে গেল। ওদের কি পেছনেও চোখ আছে নাকি! অবাক হলেও পায়ের বেগ কমল না। বাতাসের আগায় খড় কুটোর মতো ছুটল। এ গলির ভিতর দিয়ে, ও গলির পাশ কাটিয়ে, বাঁশ বন, আম বন, পানা পুকুর কোথায় পিছনে পড়ে রইল। বুক হাপরের মতো উঠছে পড়ছে, কান বোঁ বোঁ করছে, চোখে অন্ধকার দেখছে। এমনি হয়। মানুষের শক্তির একটা সীমা আছে। বিনু তালুকদারকে নাকি দু একবার পরাজয় স্বীকার করতে হয়েছে। তাতে লজ্জার কিছু নেই। একবার হেরে বেঁচে ফিরে এলে, আরেকবার চেষ্টা করে জয়লাভ হতে কোন বাধা নেই।

একটা নির্জন পুকুর-পাড়ে পানু বসে পড়ল। বসে পড়েই অবাক হয়ে চারদিকে তাকিয়ে দেখল। কোথাও কেউ নেই। কখন তারা পেছনে দৌড়ান ছেড়ে দিয়েছে কে জানে! পানু রেহাই পেয়েছে। কিন্তু বিনু তালুকদারই বলেন 'ভাগ্যকে বেশি পরীক্ষা করতে হয় না। ভালোয় ভালোয় প্রাণ নিয়ে পালান অনেক সময় দরকার হয়ে।' পানু বুঝল এই হল সেই রকম একটা সময়। গায়ের সার্ট খুলে তাই জড়িয়ে বাজারের থলিটাকে একটা পুঁটলি বানিয়ে, বগল দাবাই করে, ধীরে সুস্থে এগিয়ে চলল। যেন কিছুই জানে না।

এবার কে সার্ট পরা লাল-কাল থলি হাতে ছেলে বলে চিনবে। সবাই দেখবে গেঞ্জি গায়ে পুঁটলি বগলে একটা ছেলে যাচ্ছে। বুকে সাহস ফিরে এল। কিন্তু বড় বেশি দূরে চলে এসেছে, বড় অচেনা জায়গায়। এখান থেকে পথ চিনে অঙ্ক-স্যারের পৈতৃক বাড়িতে ফেরাই এক ব্যাপার। না জানে রাস্তার নাম, না জানে বাড়ির নম্বর। এখানে বাড়ির নম্বর থাকে কিনা তাই পানু জানে না।

তার চেয়ে বরং ছোটমামার আপিসে গিয়ে দেখলে ভালো হয়। সেটা অবিশ্যি ছোটমামার পছন্দ নয়। কারণ সেনগুপ্ত আর সমাজপতি, এরা, কিছু কাঁচা ছেলে নয়। কাজেই ছোটমামার আপিসে গুপি পানুকে না দেখা গেলেই ভালো। আর ছোটমামাও ওদের সঙ্গে থাকলেই দাড়ি তাপ্পি পরে থাকবে, ঠিক হয়েছিল। তবু নিরুপায় হয়ে সেখানেই যেতে হল। বিনু তালুকদার বলেন, 'যে মরিয়া হয়ে উঠেছে, সে কোন নিয়ম মানে না।'

উনি অবিশ্যি আইনভঙ্গকারীদের কথা মনে করেই বলেছিলেন। পানু এখন আবিষ্কার করল কথাটা আইনভঙ্গকারীদের শত্রুদের বেলাও খাটে।

ন্যাশনাল হাই-ওয়ে টু'র মোড়টা খুঁজে পেতে বেশি কষ্ট করতে হল না। মাত্র সাতবার জিজ্ঞাসা করতে হল। তারপর সামনেই দেখে ছোট্ট দরজাটা। তার পাশেই আরেকটা দরজা। তার পাশে ছোট একটা নেম-প্লেট। তাতে লেখা শশধর মল্লিক, এম-এ, বি-এল। এই নিশ্চয় সেই শশধর। স্যারের ঠাকুরদাদার উকীল। এই সব নষ্টের গোড়া, স্যার বলেছেন। বুড়োকে যত কু-পরামর্শ নাকি ইনিই দিতেন। ছোটমামাদের দরজাটা খোলাই ছিল। সরু কাঠের সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠতে উঠতে পানুর কানে এল একটা শব্দ! সঙ্গে সঙ্গে আর্ত চিৎকার। 'কে কোথায় আছ, বাঁচাও! বাঁচাও!'

ঐ তো ছোটমামার গলা না? স্যারও হয়তো আছেন। গুপি তো বলে ছোটমামার এত সাহস, কিন্তু বিপদে পড়লেই গলা থেকে চিঁ চিঁ আওয়াজ বেরোয়। ছোটমামা নিজেই জানেন না কেন। শরীরে ভিটামিন ডি'র অভাবেই হবে বা।

সিঁড়ির শেষ ধাপগুলো এক রকম উড়ে পার হয়ে, পানু দরজার উপরকার ছিটকিনি নামিয়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে ছোটমামা আর অঙ্ক স্যার হুড়মুড় করে বেরিয়ে এলেন।

'চল, চল, এক মুহূর্ত সময় নেই। কাকা সর্বনাশ ঘটাবেন।' 'পানু পুঁটলি বগলেই তাঁদের সঙ্গে নিয়ে ছুটল। দেখল ওঁদের দুজনেরই উস্কোখুস্কো চুল, উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টি।

চার

নিচে নামতেই শশধরের দরজা দিয়ে যে বেরিয়ে এল সে নিকুঞ্জ ছাড়া আর কেউ নয়। আর যাবে কোথায়, ছোটমামা আর অঙ্ক স্যার দুজনে বাঘের মতো

তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে কীল চড় লাথি ঘুঁষি চালিয়ে একাকার করে দিলো। বোঝা গেল ওই নিশ্চয় ওঁদের ঘরে বন্ধ করেছিল। আশ্চর্যের বিষয়, ওই তাগড়া চেহারা, অথচ নিকুঞ্জ প্রথমটা আরে— আরে— আঁ-আঁ করে, তার পরেই ওরে বাবারে মেরে ফেললে রে— বলে সে কি চেল্লালো। রাস্তার লোকরা দু-একজন যদি বা ফিরে তাকাল, তারাও বলল, 'রাজনীতি করবার আর জায়গা পেলি না, ব্যাটাচ্ছেলে!'

সুযোগ পেয়ে পানুও একবার নিকুঞ্জের ঘাড়ে কষে রামচিমটি বসিয়ে দিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, বগলে পুঁটলিটা থাকাতে চিমটিটা ঠিক জায়গায় না পড়ে পড়ল স্যারের পিঠে। স্যার ভাবলেন এমন বেগতিকে পড়েও নিকুঞ্জর তেজ কমে নি। তাই, 'আবার চিমটি কাটা হচ্ছে! তবে রে ব্যাটা!' বলে দুবার তার কান মুলে দিলেন।

কারো কোনো দিকে হুঁস ছিল না। কখন যে শশধর মল্লিকের দরজা খুলে স্বয়ং শশধর মল্লিক বেরিয়ে এসেছেন, মোড়ের থানা থেকে পুলিস ডেকে এনেছেন, কারো খেয়াল নেই। এবার চারদিকে ভিড় দাঁড়াল। নিশ্চয় চোর। ঐ যে ছেলেটার বগলে পুঁটলি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে মজা দেখছে, ঐ ব্যাটাই নিশ্চয়ই চোর!'

পানু এতক্ষণে নিজের বিপদ বুঝে পালাবার পথ খুঁজছে, এমন সময় ভিড় ঠেলে সেই বাঘের শিকার হরিণ ছুটে এসে পুঁটলি ধরে টানাটানি! 'দে শীগগির, আমার জিনিস দে বলছি। শশধর বাবু, দেখুন।' গোলমালে সার্ট ছিঁড়ে লাল কালো থলি একেবারে প্রকট হয়েছে।

শশধর বাবু বললেন, 'আঃ, কি কর, টেঁপির মা, ও যে আমার মক্কেলের লোক।' 'আপনার মক্কেলের লোক মানে? আমি তো আপনার মক্কেল!' শশধরবাবু বললেন, 'আহা, তুমি ছাড়া কি আমার আর মক্কেল নেই? তা হলে তো আমাকে না খেয়ে মরতে হত, পয়সা-কড়ি তো দাও না।'

ততক্ষণে পুলিশের লোক দুজন এগিয়ে এসে পুঁটলি ধরে টানতেই টেঁপি চিৎকার করে উঠল, 'আহা, হা, মৎ ছোঁও! হামরা গুরুদেবকো আশীর্বাদের পুঁটলি। দিস্ নে বাবা ওকে, তোকে কিছু দেব।' পুলিশ দুজন ফ্যাল-ফ্যাল করে শশধরবাবুর দিকে তাকিয়ে রইল! তিনি বললেন, 'যেতে দাও, বাবা, কেউ কিছু চুরি করে-নি। এরাও মারামারি থামিয়েছে, সবাই আমার নিজের লোক, আর থানা পুলিশ করে কি হবে!'

খুব অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত তারা চলে গেল। তখন শশধরবাবু বজ্রগম্ভীর গলায় বললেন, 'আর ফুটপাথে খেল দেখিয়ে কি হবে? চল, আমার আপিসে।'

তাই গেল সবাই শেষ পর্যন্ত। চেয়ারে টুলে বেঞ্চিতে টেবিলে যে যেখানে পারে বসে পড়ল। শশধর মল্লিক নিজের জায়গায় বসে, হতাশভাবে নিকুঞ্জকে বললেন, 'সব চাইতে অবাক হচ্ছি নিকুঞ্জ, তুমি আমার স্টেনো হয়ে কি করে পথের মধ্যে দাঙ্গায় নামলে?' টেঁপি খন-খনে গলায় বলল, 'আপনার স্টেনো আবার কি? ওতো সমাজপতি টিকটিকির চর। বাঘামামার পেছনে ওকে লাগানো হয়েছে।' সবাই এ ওর দিকে তাকাতে লাগল। 'বাঘা মামা? বাঘা মামা কে?' দরজা ঠেলে বাঘের মতো মুখ করে পানুর দ্বিতীয় শিকার ঘরে ঢুকতেই, অঙ্ক স্যার তাড়াতাড়ি বললেন, 'আমার কাকাবাবু'। শশধর মল্লিক লজ্জিতভাবে হেসে ফেললেন, 'যা ঝগড়া কর তোমরা, কে কার কি হও, ভুলে যাই। তা ট্যাপা, নিকুঞ্জকে দুজনে মিলে পেটাচ্ছিলে কেন?'

শুনে ছোটমামা ফেটে পড়ে আর কি! 'পেটাব না? আপনি জানেন ও আমাদের ঘরে ছিটকিনি বন্ধ করে পালিয়েছিল। ভাগ্যিস আমার ভাগনের বন্ধু পানু দৈবাৎ এসে খুলে দিল। নইলে ঐখানে দুজনে না খেয়ে শুকিয়ে মরে যেতাম না?'

'কেন, তোমাদের বড় সায়েব, সেনগুপ্ত, সমাজপতি এঁরা সব কোথায় গেলেন? ওঁরা খুলে দেন নি কেন?' ছোটমামা বলল 'ওঁরা পুজোর ছুটিতে বাড়ি গেছেন। আমি একটা জরুরি তদন্ত নিয়ে একলা আছি।'

অঙ্ক-স্যার বললেন, 'স্যার, আপনি একটু আমাদের সঙ্গে আমাদের বাড়িতে না গেলেই নয়। আজ-ই একটা ফয়সালা হয়ে যাক। টেঁপি কাউকে ভাগ দিতে চায় না।'

টেঁপি আকাশ থেকে পড়ল। 'কিসের আবার ভাগ?'

'পোদ্দারের দোকানে যে পুঁটলি নিয়ে গেছিলে, তার ছাড়া আর কিসের ভাগ।'

টেঁপি রেগেমেগে পানুর বগল থেকে পুঁটলি টেনে নিয়ে উল্টো করে ধরল। ঝুপ ঝুপ করে একরাশি লাল শাক, রাঙ্গা আলু, মুখি কচু আর একটা ছোট টিনের বাক্স পড়ল। টেঁপি কিছু বলবার আগেই অঙ্ক স্যার ছোঁ মেরে সেটা তুলে নিয়ে, সকলের সামনে খুলে ফেললেন। ভিতরে কতকগুলো শুকনো পাতা! টেঁপি ফোঁস-ফোঁস করতে লাগল।

ঠিক সেই সময় অঙ্ক স্যারের কাকাও এসে ঘরে ঢুকলেন। বাঘা মহিলাকে দেখে থমকে দাঁড়িয়ে বললেন, 'সে কি, আপনি প্রকাশ্যে এখানে এসেছেন যে বড়? সেনগুপ্ত যাবার আগে বারণ করে যায় নি?'

বাঘা বলল, 'আপনি ভুল গন্ধ ধরেছিলেন। কৌটোতে উইল নেই, শুকনো গাঁজার পাতা আছে।'

টেঁপি তার গালে ঠাস ঠাস করে দুই চড় কষিয়ে বলল, 'আমাদের ছাদে টবের গাঁজার গাছে দাও নি তুমি জল? আবার ন্যাকা সাজছ! তুমি বাঘামামার শেয়াল জানলে কবে তোমাকে—'। শশধরবাবুর সঙ্গে চোখাচোখি হতেই টেঁপি থামল। কিন্তু চোখ দিয়ে আগুন বেরুতে লাগল। আর একেই না পানু হরিণ ঠাউরেছিল? বিনু তালুকদার ঠিকই বলেন 'বাইরের চেহারা দেখে কাউকে বিচার করবে না!' বাঘা মহিলাকে এখন পাঁঠা মনে হচ্ছে।

কাকা বললেন, 'তুই থাম দেখি টেঁপি, আমার শেয়াল আবার কি, ও সেনগুপ্তর চর। তবে আরেকজন চর-ও আছে, শেষ অবধি সেই হয়তো কার্যোদ্ধার করবে।' অনেকক্ষণ তর্কাতর্কি চলল। তারপর কোথা থেকে দুটো পুরনো গাড়ি জোগাড় হল। সবাই মিলে অঙ্কস্যারদের বাড়ি গেলেন। কাকা নিজের গাড়িতে গেলেন।

সেখানে পৌঁছে সবার চক্ষু চড়কগাছ! বাড়ির পিছনে অঙ্ক স্যারের গোয়াল ঘরের চাল নামিয়ে, ইঁট খুলে মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে! অবিনাশ বসে বসে ছোটমামার গাড়ির পার্ট্‌স্‌গুলো আলাদা করে রাখছে।

সে হেসে বলল, 'এমনি করেই সার্চ করতে হয়, দাদা।'

ছোটমামা আর থাকতে না পেরে তাকে হয়তো মেরেই ফেলত, এমন সময় দোতলায় স্যারের ঘরের জানলা থেকে মুখ বের করে গুপি চ্যাঁচাতে লাগল 'ইউরেকা! পেয়েছি, পেয়েছি!'

তখন যে যার কাজ ও ঝগড়া ফেলে দুদ্দাড় করে দোতলায় উঠে গেল। গ্রিল বন্ধ। 'ওরে গুপি খোল্, খোল্!' গুপি ওদিক থেকে চাবি দিয়ে খুলল, এদিক থেকে অবিনাশ চাবি দিয়ে খুলল। ইস্, অবিনাশ যে এমন বিশ্বাসঘাতক, ছোটমামার এত কষ্ট করে তৈরি গাড়ি খুলে তচনচ করবে কে ভেবেছিল। পরে অবিশ্যি ছোটমামা বলেছিল, 'থাক্, ও এত ভালো রাঁধে, ওকে ক্ষমা করা যাক। অন্ কণ্ডিশন যে ও আমার বাড়িতে রাঁধবে!'

যাক, ও সব পরের কথা। তখনকার মতো সবাই দোতলার প্যাসেজে ঠেলাঠেলি করে দাঁড়িয়ে, গুপির মুখের দিকে চেয়ে রইল। শশধরবাবুকে দস্তুরমতো নার্ভাস মনে হতে লাগল। টেঁপি আর অঙ্ক স্যারের ধৈর্য সব চেয়ে কম। 'কোথায় উইল?' বের কর উইল। গুপি আস্তে আস্তে হাত ঝেড়ে বলল, 'আসুন আমার সঙ্গে।' এই বলে নিজেদের শোবার ঘরে ঢুকল। পানু পর্যন্ত অবাক।

খালি শশধরবাবু বললেন, 'ভারি চালাক। উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ!' ঘরের মধ্যে ঢুকে গুপি দেয়ালের সেই রিভার অফ লাইফের ছবির কাছে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'এখানে কে কে দেবনাগরি পড়তে পারে?' দেখা গেল পানু ছাড়া কেউ পারে না। আর সবাই হয় শেখেই নি, নয় তো ভুলে গেছে। অবিশ্যি শশধরবাবুর কথা আলাদা। তিনি থেকে থেকে গুপির

পিঠ চাপড়াচ্ছিলেন। বোঝা যাচ্ছিল রহস্যটা তাঁর কাছে কিছু রহস্য নয়।

গুপি সমুদ্রতীরের দেহ-রাখা বুড়োর জোব্বায় একটা নক্সা দেখিয়ে বলল, 'এটা কি?' পানু বলল 'দেবনাগরিতে লেখা তালব্য শ।'

'তার উপরের মানুষটার হাতে কি?' আরেকটা 'তালব্য শ।'

'তার উপরে?'

'একটা ধ।'

এমনি করে সবটা পড়া হল। নিচে থেকে উপরে একেকটা মানুষের গায়ে একেকটা অক্ষর, তাও সব মানুষের গায়ে নয়। 'শশধর, তাকে ধর, পাবে বর, গুণধর বংশধর।' এ কি! এই নাকি উইল? সই কোথায়?

গুপি বলল, 'তাও আছে। টেবিলে চড়ে পড়েছি, সবচেয়ে উপরে, বরফের পাহাড়ের গায়ে, খাঁজকাটার মতো করে লেখা, কামিনীচরণ চৌধুরী।'

শশধরবাবু দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, 'এইটাই উইল। উইল যেখানে খুসি লেখা যায়। সাক্ষী চাই। পাহাড়ের অন্য খাঁজে সাক্ষীদের সই আছে। তবে সত্যিকার উইল একে বলে না। এক দি বল 'উইল' মানে 'ইচ্ছা'। কামিনীচরণ আমার বন্ধু ছিল, এই ছিল তার ইচ্ছা।'

ওয়ারিশরা ছাড়বে কেন। 'কোথায় আমাদের সম্পত্তি, দিন শীগ্‌গির।' শশধরবাবু পকেট থেকে সত্যি উইল বের করে দিলেন। তাতে লেখা 'চারটি কাঁচকলা কেনার জন্য শশধর মল্লিকের কাছে এক টাকা রাখিয়া গেলাম। বাকি সম্পত্তি জীবনকালেই গরীবদুঃখীকে দান করিয়াছি।'

টেঁপি হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগল। 'তাহলে আমাদের কি হবে? আমাদের যে কিছু নেই। পোদ্দারের গোপন গাঁজার ব্যবসা, তার কাছে গাঁজা বেচে আমাদের বড় কষ্টে চলে!'

তখন নিকুঞ্জ এগিয়ে এসে বলল, 'আমি তো আছি। শশধরবাবু তাড়িয়ে না দিলে, আমার চাকরিও আছে। আমাকে চিনতে পারছ না? আমি তোমার স্বামী। আমরা গরীব বলে তোমার মা তোমাকে আমাদের বাড়িতে পাঠান নি। তাঁর ভারও আমি নিতে প্রস্তুত। তা নইলে আর তোমাদের হয়ে টিকটিকিগিরি করব কেন?'

সবাই বলল 'সাধু, সাধু।'

শশধরবাবু বললেন, 'একেবারে যে কিছু নেই তাও নয়। তোমার দাদুর দেওয়া দিদিমার গয়নাগুলো আমার কাছে গচ্ছিত আছে। উইল পাওয়া গেলে তোমাদের দিয়ে দেবার কথা।'

এর মধ্যে বড়পিসি উপরে এসে কান্নাকাটি লাগালেন। 'আমাকে কেউ কিচ্ছু দেয় নি। আমি মিনি মাগনা খেটে মরেছি। টেঁপি বলেছিল সম্পত্তি পেলে একশো টাকা দেবে! আমি এদের নিজের মামাতো পিসি হই তবু আমাকে এত হেনস্তা!'

আরে সম্পত্তিই নেই তো একশো টাকা!

স্যারের কাকা বললেন, 'বেশ যার যা পাওনা আমাকে জানিও, আমি দেব। আমি সবার বড়। তাছাড়া আমার সম্পত্তি এরা দুজনেই পাবে। তবে আমি মলে। হিমঘরটা আসলে আমার। যারা যারা চাকরি চাও, দরখাস্ত পাঠাও। খালি অবিনাশটা কিচ্ছু পাবে না।'

অবিনাশ বলল, 'আমার চাকরি হয়ে গেছে, কর্তা।'

কারো কিছু বলবার রইল না। কাকা বললেন, 'এবার তা হলে দুগ্‌গো পুজোর আয়োজন করা যাক। এই বাড়িতেই হোক। প্রতিমার অর্ডার দিয়েছি। তোমাদের সকলের নেমন্তন্ন।'

শশধরবাবু বললেন, 'এবার কাঁচকলাগুলো নিয়ে গিয়ে আমাকে দায়মুক্ত কর।'

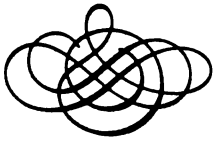

একশো তিয়াত্তর পয়েন্ট দুই!

দীপঙ্কর সরকার

'স্টক শেষ!'

'হ্যাঁ স্যার। পরশুদিন আসুন, নতুন স্টক আসার কথা আছে।'

দোকানির কথায় সুধাংশু দত্তর কপালে চিন্তার ভাঁজ দেখা দিল।

'তা'হলে কী আর করা যাবে! চলো পুপু, বাড়ি ফেরা যাক।'

পুপু একটু হতাশ।

'স্কুল থেকে বলে দিয়েছে সোমবার থেকে নতুন স্পোর্টস ইউনিফর্ম পরে আসতে হবে। ডি-সুজা স্যার কো হুজুহাত শুনবেন না।'

পুপুর কথায় সুধাংশুবাবু ছেলের মুখের দিকে একবার তাকালেন।

সুধাংশুবাবু কলকাতা হাইকোর্টের নামকরা ব্যারিস্টার। অত্যন্ত ব্যস্ত মানুষ।

'পরশু বরং সুজন তোমাকে নিয়ে চলে আসবে। আমি সুজনকে বলে দেব।'

সুজন সুধাংশুর জুনিয়ার।

'কিন্তু পরশু তো শুক্রবার। রবিবার সব বন্ধ। একদিনের মধ্যে ওরা ইউনিফর্ম করে দিতে পারবে?' পুপু আ প্রকাশ করে।

'দোকানে না থাকলে তো কিছু করার নেই। তোমাদের ইউনিফর্মের কাপড় তো আর অন্য কোথাও পাওয়া যাবে না। দাঁড়িয়ে থেকে লাভ কী! চলো।'

কিংকর্তব্যবিমূঢ় দোকানি এতক্ষণ ধরে বাপ-ছেলের কথা শুনছিল। এ বার মুখ খুলল, 'কাট্-পিস্ হলে চলবে?'

'কাট-পিস্!'

'হ্যাঁ স্যার। ওয়ান পয়েন্ট এইট-এর মতো একটা পিস্ আছে। ওদের তো হাফ-হাতা ইউনিফর্ম। আপনার ছেলের হয়ে যাবে। দেখবেন নাকি?'

'দেখি।'

দোকানি ভেতর থেকে একটা পিস্ নিয়ে এসে সুধাংশুবাবুর কাছে খুলে ধরল।

'হবে এতে?' সন্দেহ প্রকাশ করলেন সুধাংশুবাবু।

'হ্যাঁ-হ্যাঁ, হয়ে যাবে। আচ্ছা, তবু একবার মেপে দেখছি।'

'মাপার দরকার নেই। ওটার এগ্‌জ্যাক্ট লেংথ ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেন।' নিশ্চিতভাবে বলল পুপু।

দোকানি ততক্ষণে মিটার-স্কেল দিয়ে মাপতে শুরু করে দিয়েছে। মাপার পর বিস্মিত চোখে পুপুর দিকে তাকিয়ে রইল!

'আশ্চর্য আন্দাজ তোমার! ঠিক ওয়ান পয়েন্ট এইট সেভেনই!'

দোকানদারের প্রশংসাবাক্যে পুপুর মধ্যে কোনও রকম ভাবান্তর দেখা গেল না। এমনটা যে হবে, যেন তার আগে থাকতেই জানা ছিল।

পুপুর এই আশ্চর্য ক্ষমতা প্রথম ধরা পড়ে আজ থেকে দু' বছর আগে, যখন ও ক্লাস সেভেনে পড়ত। একদিন ক্লাসে অঙ্ক পরীক্ষার সময় ইন্‌স্ট্রুমেন্ট বক্স নিয়ে যেতে ভুলে গিয়েছিল পুপু। ওকে একটা ৫৭ ডিগ্রি কোণ, আর একটা বর্গক্ষেত্র আঁকতে হয়েছিল। বর্গক্ষেত্রর প্রতিটি বাহুর দৈর্ঘ ছিল ফাইভ পয়েন্ট থ্রি সেন্টিমিটার। স্কেল, চাঁদা, কম্পাস ছাড়াই নিখুঁতভাবে ছবিগুলো এঁকে দিয়েছিল। পরীক্ষকও কিছু ধরতে পারেননি।

ছোটবেলা থেকেই অবশ্য খাতার মার্জিন টানার জন্য ওকে কখনও রুলার ব্যবহার করতে হয়নি। সোজা লাইন এক টানেই এঁকে দিত। তবে নিজেও জানত না যে যন্ত্রের সাহায্য ছাড়াই যে কোনও জ্যামিতিক নক্সা নির্ভুল ভাবে এঁকে দিতে অথবা আঁকা নক্সার পরিমাপ ঠিক ঠিক মেপে দিতে, ওর কোনও অসুবিধে হয় না। ক্লাস এইটে পড়ার সময় থেকে ওকে আর কখনও জিওমেট্রি বক্স ব্যবহার করতে হয়নি!

গণ্ডগোলটা দেখা দিল এ-বছরে। ক্লাস-ওয়ার্কে ওদের একটা চতুর্ভুজের সমান ত্রিভুজ আঁকতে দিয়েছিল। বেশ জটিল অঙ্কন। আঁকার সাবেকী পদ্ধতিটা ওর ভালো ভাবে জানা ছিল না। খাতায় সরাসরি একটা ত্রিভুজ এঁকে দেয়, যার ক্ষেত্রফল চতুর্ভুজটার একেবারে সমান। মাস্টারমশাই তাতে কোনও নম্বর দেননি। খাতাটা নিয়ে পুপু সোজা চলে যায় মাস্টারমশায়ের কাছে। জানতে চায়, কেন তাকে নম্বর দেওয়া হবে না?

অঙ্কের শিক্ষক মিস্টার ব্র্যাডলি বেশ কড়া ধাতের মানুষ। তিনিও পাল্টা প্রশ্ন করেন, 'নম্বর কেন দেওয়া হবে, বুঝিয়ে দাও।'

পুপু বলে, 'আপনি যে ত্রিভুজটা আঁকতে দিয়েছিলেন, আমি সেটাই এঁকেছি। মেপে দেখতে পারেন।'

মাস্টারমশাই যন্ত্রপাতি নিয়ে মেপে অঙ্ক কষে বললেন, 'হ্যাঁ, মাপটা ঠিক থাকলেও মেথড ফলো না করলে, নম্বর দেওয়া সম্ভব নয়। এটা তো অ্যাক্সিডেন্টালি মিলে গেছে!'

'না স্যার, অ্যাক্সিডেন্টালি নয়। আপনি যতগুলো ইচ্ছে চতুর্ভুজ দিন, আমি প্রত্যেকটার ঠিক সমান মাপের ত্রিভুজ এঁকে দেব।'

'তাই নাকি!' বলে মিস্টার ব্র্যাডলি নানা মাপের তিনটে চতুর্ভুজ পুপুকে দিলেন। তিন মিনিটে পুপু তিনটে ত্রিভুজ এঁকে দিল। ত্রিভুজগুলো মাস্টারমশায়ের চক্ষুস্থির! যদিও এটা একটা অবিশ্বাস্য ব্যাপার, তবুও তিনি বললেন, 'প্রথামাফিক অঙ্কন না-করলে, নম্বর দেওয়া যাবে না।'

'যদি কেউ প্রথা না মেনে, আরও সহজ উপায়ে একই জিনিস এঁকে দিতে পারে, তাকে নম্বর দেওয়া হবে না কেন, স্যার?'

এর সদুত্তর মাস্টারমশায়ের জানা ছিল না। তাই তিনি সেটাকে এড়িয়ে গিয়ে বললেন, 'আমি তোমাকে একটা উপদেশ দিচ্ছি। নিয়ম না মেনে তুমি যদি এ ভাবে আঁকো, তা হলে শুধু আমি কেন—কেউই তোমাকে নম্বর দিতে পারবেন বলে মনে হয় না।'

এই বলে পুপুকে ক্লাসে ফেরত পাঠিয়ে দিলেন। কিন্তু ছাত্রের এই আশ্চর্য ক্ষমতায় তিনি খুব অবাক হয়ে গেলেন!

ইউনিফর্মের মাপ দিয়ে বাবার সঙ্গে বাড়িতে ফিরে পুপু দেখে—ইতিমধ্যেই চেম্বারে মক্কেলদের ভিড় লেগে গেছে। দরজার কাছেই অ্যাটাচি-কেস হাতে দাঁড়িয়ে ছিলেন মিস্টার রায়চৌধুরী। অত্যন্ত সুপুরুষ। ফর্সা রং, টাকমাথা, কামানো দাড়ি-গোঁফ, তীক্ষ্ণ নাক, উজ্জ্বল চোখ। বেশ লম্বা ও সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। বেশিরভাগ দিন একটা জার্মান মার্সেডিজ গাড়ি করে আসেন। এক্সপোর্টের বিজনেস আছে ভদ্রলোকের। বেশ গোপ্‌পে মানুষ। কোম্পানির মামলার কাজে প্রায়ই আসেন সুধাংশুবাবুর কাছে। সুধাংশুবাবুকে উনি 'ব্যারিস্টার সাহেব' বলে ডাকেন। মামলার কথাবার্তার পরে চেম্বারে বসে অনেকক্ষণ আড্ডা মেরে যান। ক্ল্যাসিক্যাল মিউজিকে খুব আগ্রহ। অনেক সময় বেশি রাতের দিকে চেম্বারে এসে পুপু দেখেছে—একা একা বসে বাবার সঙ্গে জমিয়ে আড্ডা দিচ্ছেন। কতবার পুপু ওদের আড্ডায় এসে বসে গেছে। ভদ্রলোকের প্রায় সারা পৃথিবী ঘোরা! কত দেশের কত আশ্চর্য রকমের গল্প যে ওঁর জানা, সে আর বলার নয়! এ রকম বহু গল্প পুপু ওঁর কাছ থেকে শুনেছে। পৃথিবীর যেখানেই গেছেন, মিউজিকের কোনও অনুষ্ঠান থাকলে, অবশ্যই হাজির হতেন। পুপুকে দেখলে প্রথম সম্ভাষণই ছিল : 'হ্যালো'!

আজ ওকে বেশ ম্রিয়মাণ দেখাচ্ছে! পুপুকে দেখে হাসলেন না, এমনকি ওঁর চিরাচরিত 'হ্যালো' পর্যন্ত বললেন না! কোনো ব্যাপারে ভদ্রলোক বোধহয় কিছুটা উদ্বিগ্ন ছিলেন। কিছুদিন ধরে ভায়ের সঙ্গে কী একটা ব্যাপারে ওঁর মনোমালিন্য চলছিল। ওঁর ভাই অবশ্য এ দেশে থাকতেন না, থাকতেন জার্মানিতে। জার্মানির অফিসটা ভাই-ই দেখাশোনা করত। ভাইয়ের ইদানিংকার হালচালে কিছু একটা আঁচ করতে পেরেছিলেন। সে সম্পর্কে ভাসা-ভাসা কিছু কথা পুপু আড়াল থেকে শুনেছিল। আজকে ওঁর বিষণ্ণ চেহারা দেখে, পুপুর তাই খারাপ লাগছিল। দরজার কাছে দাঁড়িয়েই ভদ্রতাসূচক দু-চারটে কথা বললেন বাবার সঙ্গে। বাবা-ই বরং বেশ উষ্ণ ভাবে হাতে হাত মিলিয়ে ওঁকে চেম্বারের ভেতরে নিয়ে গেল। পুপুর যেন কিসে একটা খট্‌কা লাগছে! দরজার কাচের

বাইরে থেকে ভদ্রলোককে আরেকবার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে সটান ওপরে চলে গেল।

চেম্বারে বসে উসখুস করছিলেন মিস্টার রায়চৌধুরী। চায়ের অর্ডার দিয়ে সুধাংশুবাবু ওঁকে একটু অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করলেন। অন্যান্য মক্কেলের সঙ্গে কথাবার্তা সারতে সারতে বেশ রাত হয়ে গেল। চেম্বার ফাঁকা হলে সুধাংশুবাবু হাত-পা ছড়িয়ে দু জনের জন্য আরেক দফা চায়ের অর্ডার দিলেন। ভদ্রলোক বললেন, 'আজ আমার একটু তাড়া আছে। কাল মর্নিং ফ্লাইট ধরতে হবে।'

'এ বার কোথায়?'

'ফ্র্যাঙ্কফুর্ট।'

'এ কথাটা তো আগে বলতে হয়! তা হলে না হয় আজ আপনাকে স্পেয়ার করতাম। যাইহোক, কী ব্যাপার বলুন।'

'আপনার কাছে আমাদের আর. সি. এক্সপোর্ট-এর যে ফাইলটা আছে, সেটা খুব দরকার। সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

'বেশ তো। একটু বসুন।' সুধাংশুবাবু রিভলভিং চেয়ারটাকে প্রায় ৯০ ডিগ্রি ঘুরিয়ে, পাশের ঘরের দিকে মুখ করে চেঁচিয়ে বললেন, 'সুজন, আর. সি. এক্সপোর্ট-এর ফাইলটা লাগবে।'

ফাইল নিয়ে সুজন ঘরে ঢোকার আগেই, সামনের দরজা ঠেলে ঘরের মধ্যে মুখ বাড়ালেন দত্তসাহেবের কলেজের বন্ধু বীরেশ সেনগুপ্ত। দরজা খোলার শব্দে ঘুরে তাকিয়ে সুধাংশু দেখতে পেলেন বীরেশকে।

'আরে, কী ব্যাপার! ভেতরে আয়।'

ঘরে ঢুকে মিস্টার রায়চৌধুরীর পাশে ফাঁকা একটা চেয়ারে বীরেশ বসে পড়েন।

'তারপর? গত সপ্তাহে এলি না কেন?'

'তোমাদের মতো স্বাধীন ব্যবসা তো আর আমাদের নয়। এ পরের গোলামী। আমি অবশ্য বেশ কিছুক্ষণ আগেই এসেছি। ওপরে ছিলাম।'

'ও হ্যাঁ, আলাপ করিয়ে দিই। ইনি মিস্টার আর. সি. রায়চৌধুরী—আর. সি. এক্সপোর্ট-এর মালিক। আর ইনি বীরেশ সেনগুপ্ত। আমার কলেজের বন্ধু। ওঁকে তো নিশ্চয়ই চেনেন, কলকাতার পুলিশ কমিশনার।'

বিস্ফারিত চোখে বীরেশের দিকে তাকিয়ে রইলেন মিস্টার রায়চৌধুরী!

সুজন এসে টেবিলে ফাইলটা নামিয়ে রাখল। সুধাংশু ফাইলটা হাতে নিয়ে, সুজনকে আরেক কাপ চা দেবার জন্য বলে দিতে বললেন।

'আর চায়ের কী দরকার? আমারটা বাদ দিয়ে দিন। আমি এ বার উঠব।'

রায়চৌধুরীর কথায় ফাইলটা ভাঁজ করে সুধাংশু তাঁর দিকে এগিয়ে ধরেন।

'দেখি, কীসের ফাইল!' ছোঁ মেরে সুধাংশুর হাত থেকে ফাইলটা কেড়ে নিলেন বীরেশ।

মুহূর্তের মধ্যে হিংস্র হয়ে ওঠে রায়চৌধুরীর মুখ। কর্কশ গলায় বললেন, 'ফাইলটা দিন।'

'স্যরি।'

উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করেন রায়চৌধুরী। খপ্ করে হাত ধরে বসিয়ে দেন বীরেশ। বন্ধুর আচরণে হতবাক ব্যারিস্টার সাহেব!

'আপনার অ্যাটাচি-কেসটা খুলুন।' প্রায় ধমকের সুরে হুকুম দেন পুলিশ কমিশনার।

বিবর্ণ হয়ে গেছে রায়চৌধুরীর মুখ! ওয়ালেট থেকে চাবির রিংটা বের করে তুলে দেন তাঁর হাতে। টেবিলের ওপর ঝুঁকে, মাথায় হাত দিয়ে বসে থাকেন।

অ্যাটাচি-কেস খুলে, তার ভেতর থেকে একটা পাশপোর্ট বের করে আনেন বীরেশ সেনগুপ্ত।

'আপনার নাম তা-হলে আর. সি. নয়, কে. সি.?'

তার মানে!' এতক্ষণে মুখ খোলেন সুধাংশু। 'আপনি তা-হলে রমেশচন্দ্রের ভাই কিরণচন্দ্র?'

ধীরে ধীরে মাথা নাড়েন কে. সি.।

কিরণচন্দ্রকে ভবানীপুর থানার ও. সি-র হাতে তুলে দিয়ে ফিরে এসে, সুধাংশু দত্তের চেম্বারে বসে চায়ের কাপে চুমুক দিলেন বীরেশ।

'কোত্থেকে খবর পেলি?'

বন্ধুর প্রশ্নে সপ্রতিভ জবাব বীরেশের, 'তোমার বাড়ি থেকেই। ছেলেকে ডাকো। ও-ই ফোন করেছিল আমাকে।'

পুপু ঘরে ঢুকল।

চোখ তুলে সুধাংশু জিগ্যেস করলেন ছেলেকে, 'কী করে বুঝলি যে ও রায়চৌধুরী সাহেব নয়? দুই যমজ ভাই তো হুবহু এক, এমনকি গলার স্বর পর্যন্ত—'

বাবাকে থামিয়ে পুপু বলল, 'একটা সামান্য তফাত ছিল। রায়চৌধুরীকাকুর হাইট জুতোর সোল বাদ দিয়ে একশো তিয়াত্তর পয়েন্ট আট সেন্টিমিটার, আর ওঁর ভাইয়ের একশো তিয়াত্তর পয়েন্ট দুই!'

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সমস্যা সচেতন বলেই আমরা উদ্যোগী

ভারতের পূর্বাঞ্চলের প্রধান প্রাণকেন্দ্র কলকাতা। জন্মলগ্ন থেকেই কলকাতা ভারসাম্যহীনতা, দারিদ্র্য আর পরিকল্পনাবিহীন নগরায়নের প্রতীক। ছিন্নমূল মানুষের ঢেউ নিরন্তর আছড়ে পড়ছে এই মহানগরীতেই। ভয়ঙ্কর চাপের মুখে পৌরসভা তার সীমিত কাঠামোর মধ্যে দিয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্যাসঙ্কুল পরিবেশের বিরুদ্ধে প্রতিদিন আমরা যুদ্ধ করছি।

- এই শহরে, হ্যাঁ, সমস্ত মানুষের জন্যই মাথা-পিছু পানীয় জলের সরবরাহ সারা দেশের তুলনায় সবচেয়ে বেশি।
- যে-কোনও মহানগরীর তুলনায় আমরা চালু রেখেছি সবচেয়ে সুলভ যাত্রী-পরিবহনের ভাড়া।
- প্রতিদিন শহর থেকে বিপুল পরিমাণ জঞ্জাল আর নোংরা জল আমরা নিয়ে ফেলছি শহরের বাইরে। এই জঞ্জাল থেকেই অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে তৈরি হচ্ছে সার।
- সাধ্যমতো চেষ্টা করছি নতুন রাস্তা তৈরি করার। পাশাপাশি চলছে শহরের মূল রাস্তাগুলিকে আরও একটু চওড়া, আরও একটু উন্নত করার কাজ।
- দ্বিতীয় হুগলী সেতু আজ আমাদের গর্ব। বেলঘরিয়া, সুকান্ত-সেতু, শিয়ালদহ ফ্লাইওভার সহ বিভিন্ন উড়ালপুল তৈরি—সাফল্যের একটি নিদর্শন।
- নিম্নবিত্ত আর মধ্যবিত্তের জন্য আরও বাসস্থান করে চলেছি। শিল্পায়নের জোয়ারে বাসস্থান তৈরির পরিকল্পনা আরও বিস্তৃত হয়েছে।
- বে-আইনী বাড়ির ব্যবসাদারদের বিরুদ্ধেও আইনী ব্যবস্থা নিতে আমরা বদ্ধ-পরিকর।
- আমরা বস্তি উচ্ছেদের বিরোধী। দারিদ্র্যে আক্রান্ত বস্তিগুলিকে বাসযোগ্য করে তোলার আন্তরিক প্রয়াস সফল হয়েছে। প্রচেষ্টা আরও ব্যাপ্তিলাভ করতে চলেছে।
- শহরের পূর্বাঞ্চলের সবুজ ও জলাভূমি সংরক্ষণ করার গুরুত্ব সম্বন্ধে আমরা সচেতন।
- শহরের সংস্কৃতিকেন্দ্র, যেমন নন্দন, গিরীশ মঞ্চ, মধুসূদন মঞ্চ, প্রস্তাবিত রঙন স্কোয়ার, সেইসঙ্গে বিভিন্ন খেলার মাঠ, সবুজ পার্ক রক্ষা করতে, প্রসার ঘটাতে আমরা উদ্যোগী।

পশ্চিমবঙ্গ সরকার

খেরোর খাতা

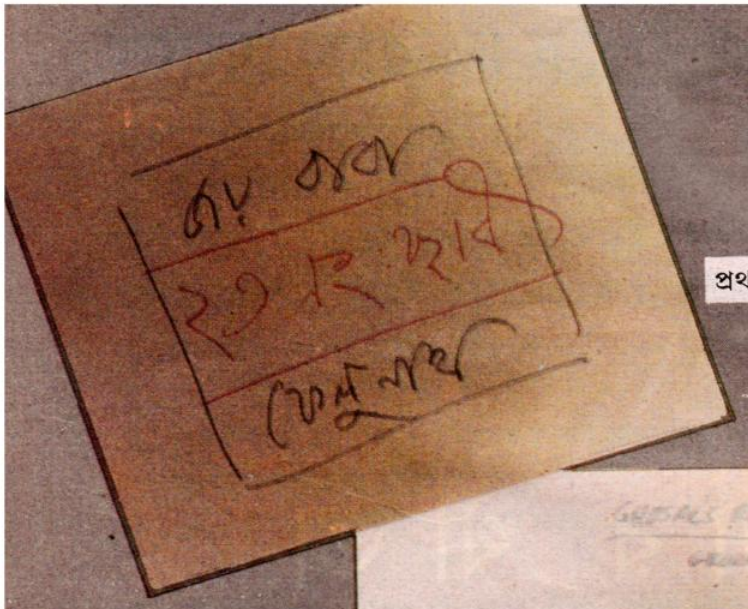

প্রথম পাতা (২২.১১.৭৭)

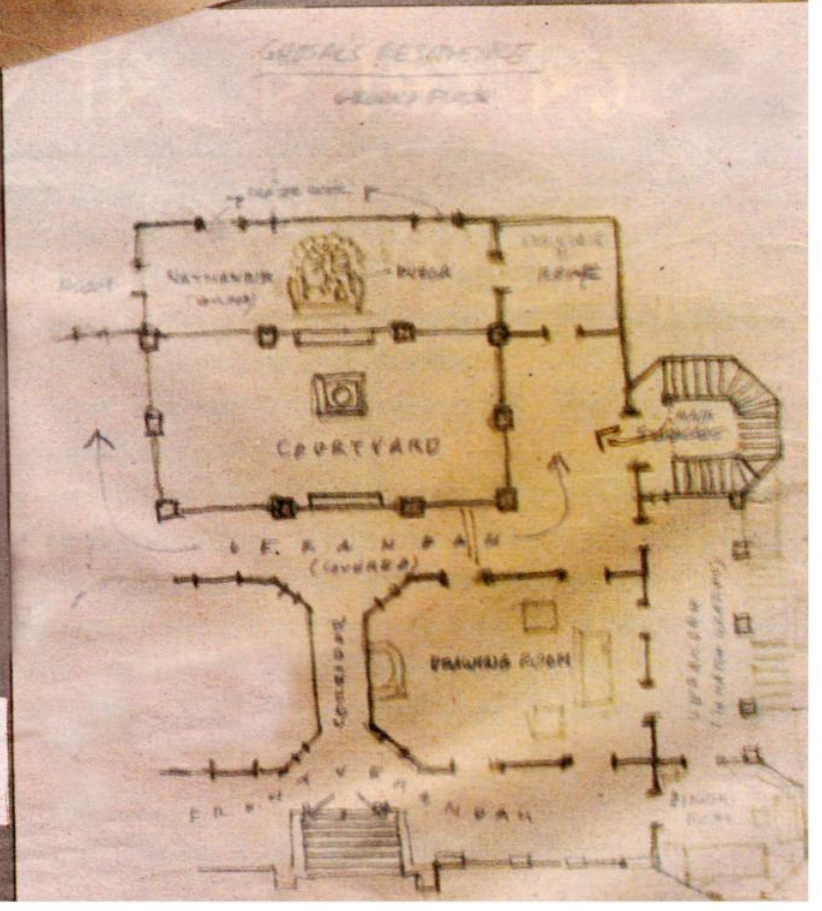

ক্যালকাটা মুভিটোন স্টুডিওতে তৈরি বেনারসের ঘোষাল-বাড়ির ফ্লোর-প্ল্যান (একতলা)।

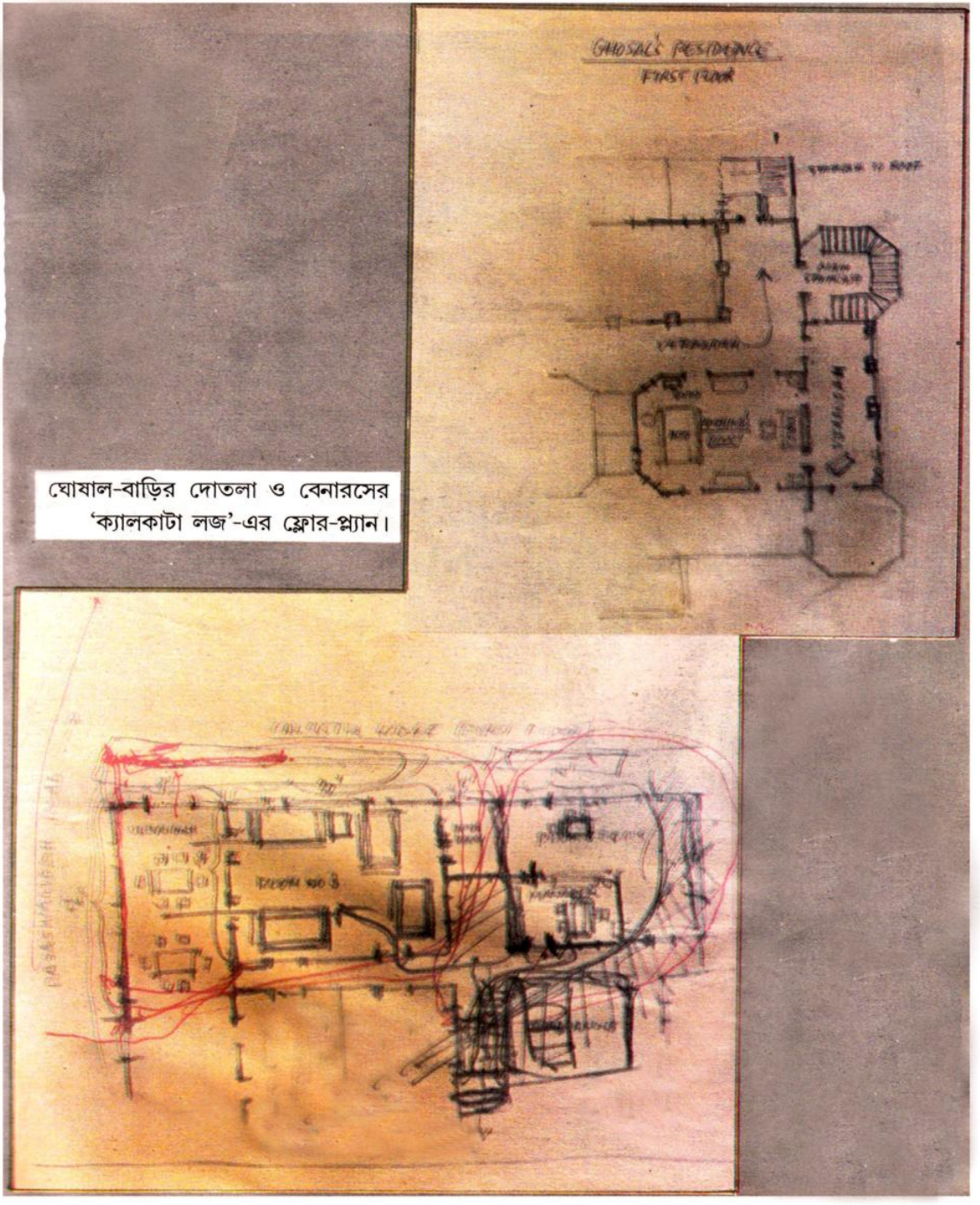

ঘোষাল-বাড়ির দোতলা ও বেনারসের 'ক্যালকাটা লজ'-এর ফ্লোর-প্ল্যান।

থ্রি মাস্কেটিয়ার্স-এর কস্টিউম। সঙ্গে আলপিন দিয়ে আটকানো আসল কাপড়ের টুকরো!

অন্যান্য চরিত্রের কস্টিউম।

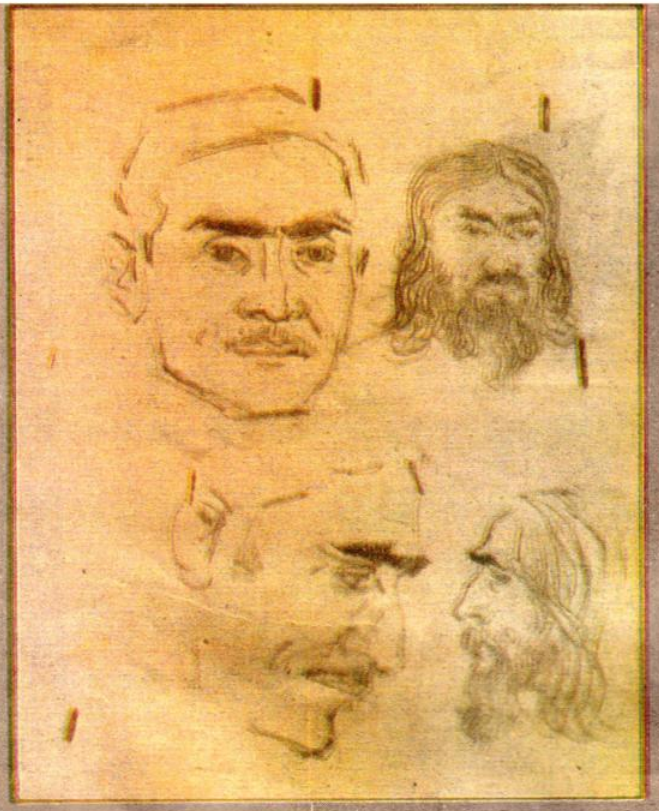

মছলিবাবার মেক-আপ।

বিশ্বশ্রী গুণময় বাগচী ও লালমোহনের
কথোপকথনের পাশেই
হিউম্যান অ্যানাটমির এক বিশদ স্কেচ।

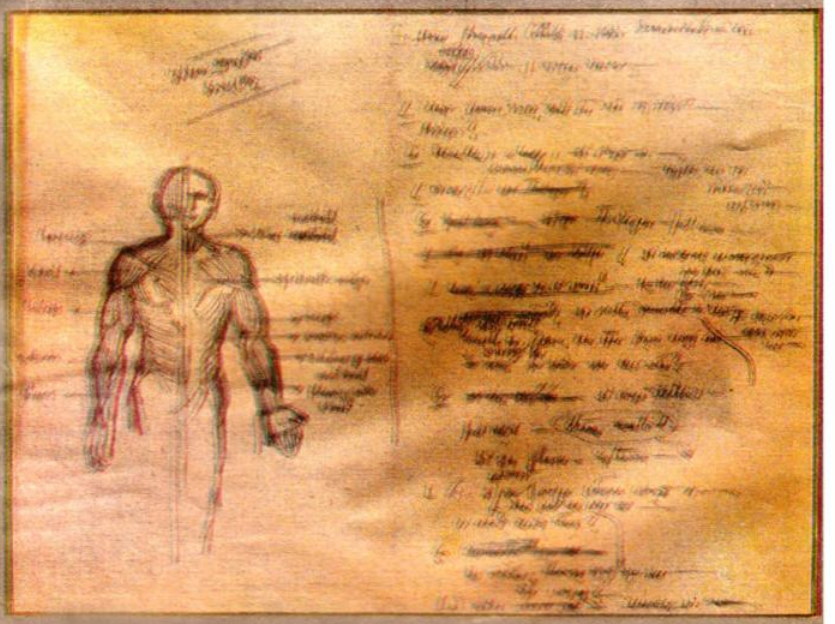

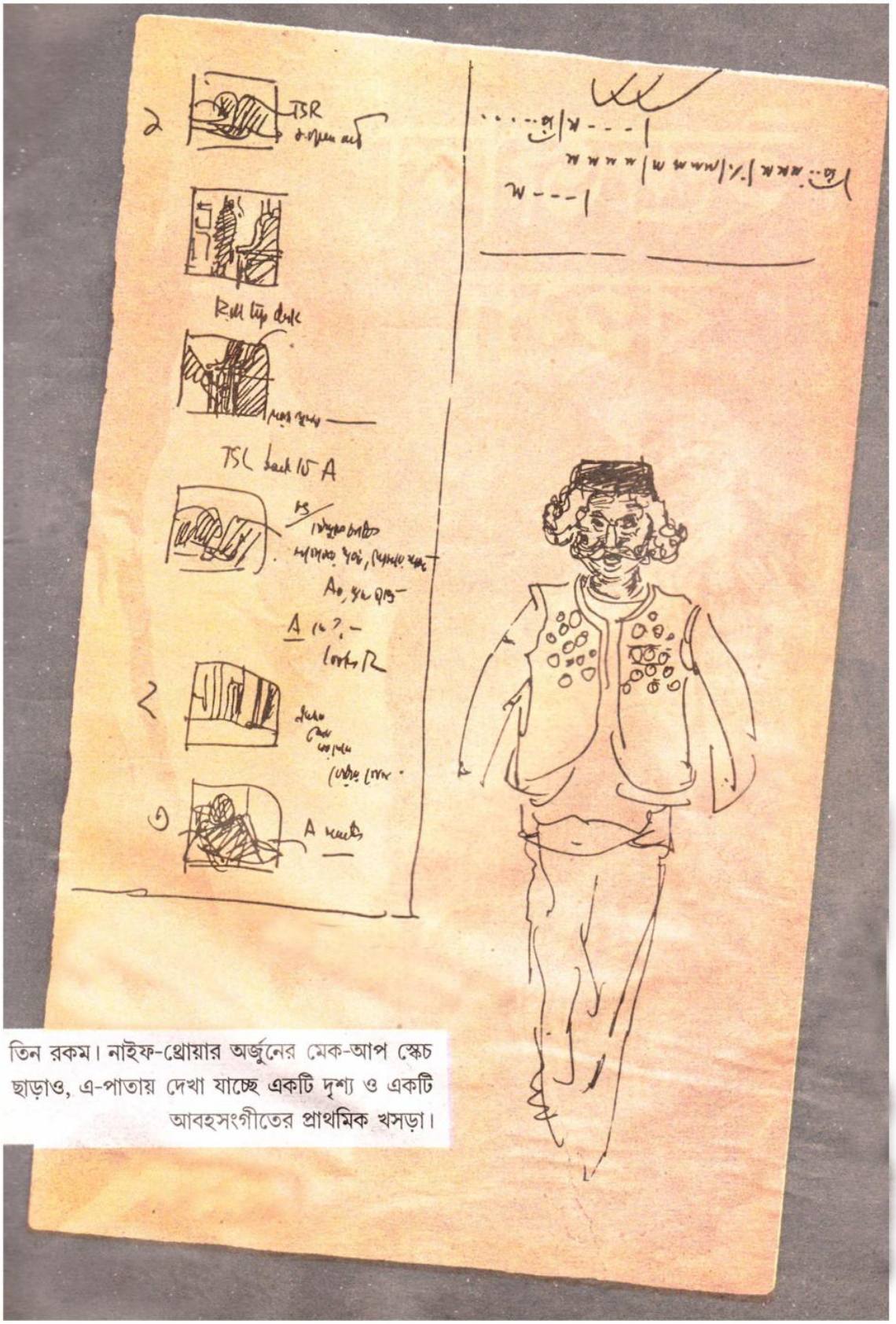

তিন রকম। নাইফ-থ্রোয়ার অর্জুনের মেক-আপ স্কেচ ছাড়াও, এ-পাতায় দেখা যাচ্ছে একটি দৃশ্য ও একটি আবহসংগীতের প্রাথমিক খসড়া।

সত্যজিৎ রায়

ইন্দ্রজাল রহস্য

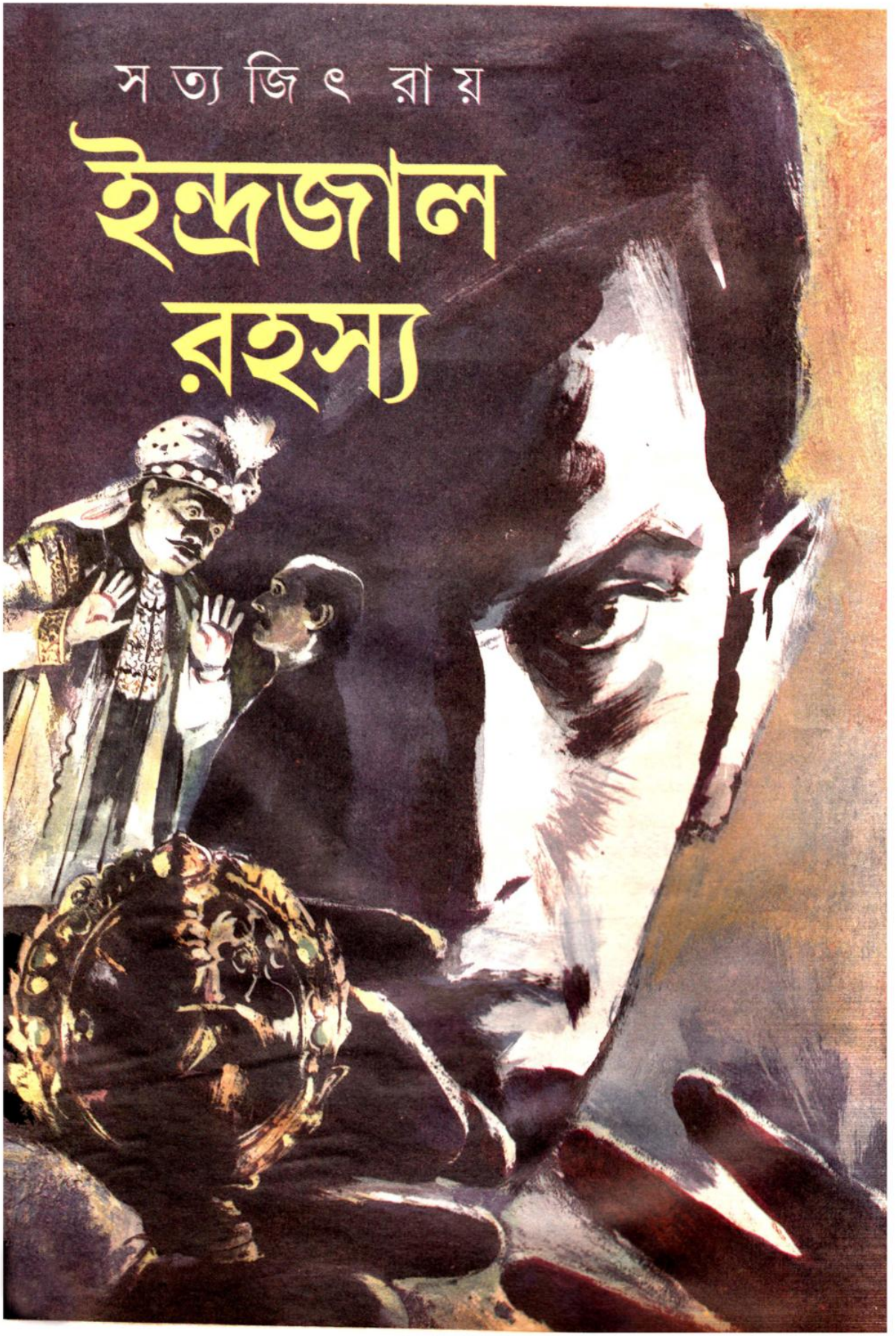

৫

সোমেশ্বরবাবুর সেক্রেটারি প্রণবেশবাবু বললেন, উনি পাঁচ বছর থেকে সেক্রেটারির কাজ করছেন। ওঁর নিজের বাড়ি একটা ছিল ভবানীপুরে, কিন্তু এ-বাড়িতে এত ঘর আছে দেখে, সোমেশ্বরবাবুই প্রস্তাব করেন এই বাড়িতে এসে থাকার জন্য। প্রণবেশবাবুও আপত্তি করেননি।

'মনিব হিসেবে সোমেশ্বরবাবু কেমন লোক?'

'চমৎকার। সেদিক দিয়ে আমার কিছু বলার নেই।'

'কাজটা কেমন লাগে?'

'সোমেশ্বরবাবু যে-সব তথ্য সংগ্রহ করেছেন, সেগুলো আশ্চর্য। টাইপ করতে করতে আমি যে কত কী নতুন জিনিস জানতে পারছি, তা বলতে পারি না।'

'আপনি ক'টা পর্যন্ত কাজ করেন?'

'রাত আটটা, ন'টা...'

'আপনি ত একতলায় শোন্।'

'হ্যাঁ।'

'ঘুম কেমন হয়?'

'ভালোই।'

'কাল কোনো কারণে— কোনো শব্দে বা ওই জাতীয় কিছুতে আপনার ঘুম ভেঙে যায়নি?'

'না। আমি ঘটনাটা জেনেছি সকালে উঠে।'

'এ-বাড়ির কাউকে আপনার সন্দেহ হয়? কৃষ্ণটার বিষয় যখন শুধু এ-বাড়ির লোকেরাই জানত, তখন হয়তো অপরাধীও এ-বাড়িতেই রয়েছে।'

'সে হতে পারে। আমিও ত সাসপেক্টদের মধ্যে পড়ছি।'

'তা পড়ছেন বৈকি।'

'পুলিশ অবিশ্যি পুরো বাড়ি সার্চ করবে, কিন্তু অতটুকু জিনিস লুকোনোর জায়গার ত অভাব নেই। তারপর সুযোগ বুঝে বার করে নিলেই হল।'

সোমেশ্বরবাবুর যিনি অয়েল পেন্টিং করছিলেন, তিনিও এই বাড়িতেই থাকেন। অন্তত যতদিন না ছবি শেষ হচ্ছে, ততদিন থাকবেন। এই ভদ্রলোককে আমার কেন জানি একটু অদ্ভুত লাগে। প্রথমত চেহারাটা অদ্ভুত— চাপ-দাড়ি, চুল কাঁধ অবধি নেমে এসেছে। তারপর ভদ্রলোক কথা অত্যন্ত কম বলেন। কাজ অবিশ্যি ভালোই করেন, কারণ সোমেশ্বরবাবুর যেটুকু ছবি আঁকা হয়েছে সেটা আমি দেখেছি, আর সেটা ভালোই হয়েছে।

ইনিও একতলায় থাকেন। ফেলুদা তাঁর দরজায় গিয়ে টোকা মারল।

ভদ্রলোক দরজা খুলে ফেলুদার দিকে একটা জিজ্ঞাসু দৃষ্টি দিলেন।

'আপনাকে কয়েকটা প্রশ্ন করার ছিল।' বলল ফেলুদা।

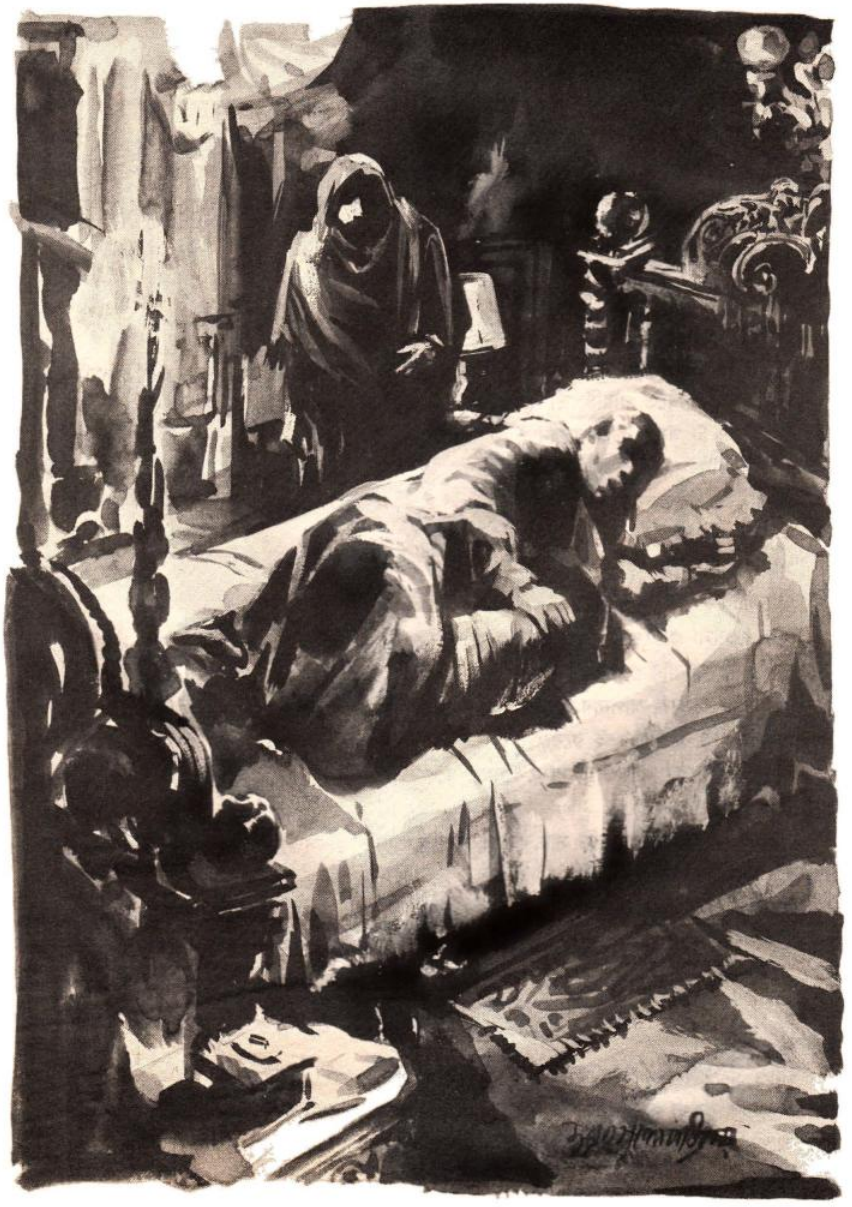

'বেশ ত, ভেতরে আসুন।'

অগোছালো ঘর, যেটা হবে বলে আমি আন্দাজ করেছিলাম। আমরা মোড়া চেয়ার বিছানা মিলিয়ে বসলাম।

'আপনার নাম ত রণেন তরফদার?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ।'

'আপনি ক'দিন হল এ-বাড়িতে আছেন?'

'যেদিন থেকে ছবিটা আঁকা শুরু করেছি। তার মানে দেড় মাস।'

'আপনার একটা পোর্ট্রেট করতে কত সময় লাগে?'

'ফুল ফিগার হলে, এবং দিনে অন্তত দু'ঘন্টা সিটিং পেলে, মাস দেড়েকে হয়ে যায়।'

'তাহলে এখানে এতদিন লাগছে কেন?'

'এখানে সোমেশ্বরবাবু দিনে এক ঘন্টার বেশি সিটিং দেন না। তারপর আমাকে ওঁর ভালো লেগেছে বলে, উনি চান আমি এখানেই থাকি। আসলে সোমেশ্বরবাবু বেশ সাঙ্গোপাঙ্গ নিয়ে থাকতে ভালোবাসেন। ওঁর এক ছেলে বিলেতে। মেয়ের বিয়ে এবং স্ত্রীর মৃত্যুর পরে, উনি ভয়ানক একা হয়ে গেসলেন। এ-বাড়িটাকে উনি খানিকটা ভরাট করতে চান, এটা আমার ধারণা।'

'আপনি পেন্টিং কোথায় শিখেছিলেন?'

'আমি ফ্রান্সে শিখি তিন বছর। তাছাড়া প্রথমে কলকাতার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ্ আর্টে শিখেছি।'

'পোর্ট্রেট করে রোজগার ভালো হয়?'

'এখন আর হয় না। ফোটোগ্রাফির যুগে আসল-পোর্ট্রেটের কদর অনেক কমে গেছে। আমিও তাই অ্যাবস্ট্রাক্ট পেন্টিং-এ চলে যাচ্ছি। সোমেশ্বরবাবুর পৃষ্ঠপোষকতা না-পেলে, আমার অবস্থা খুবই কাহিল হত।'

'আপনি পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ সম্বন্ধে জানতেন?'

'হ্যাঁ। ওটা আমাকে সোমেশ্বরবাবু দেখিয়েছিলেন।' বলেছিলেন, 'তুমি আর্টিস্ট, তুমি এর কদর করতে পারবে'।

'কালকের খুন এবং ডাকাতি সম্বন্ধে আপনার নিজের কোনো থিওরি আছে?'

'বাড়ির লোক এ-কাজ করতে পারে না। আমার মনে হয়, চোর সিন্দুক থেকে টাকা নিতে গিয়ে কৃষ্ণটা দেখে সেটা নিয়ে নেয়। তারপর নিচে নেমে বেয়ারার সামনাসামনি পড়ে, ওকে খুন করে। আত্মরক্ষা ছাড়া খুনের আর কোনো মোটিভ আছে বলে আমার মনে হয় না।'

'অনেক ধন্যবাদ।'

ফেলুদা উঠে পড়ল।

আর দুজন বাকি রইল— সূর্যকুমার আর সোমেশ্বরবাবু। আমরা সূর্যকুমারের কাছেই আগে গেলাম। ভদ্রলোক কেমন যেন গুম্ মেরে গেছেন। তিনি এ-বাড়িতে আসার দিনই ঘটনাটা ঘটল, এই জন্যই বোধহয়।

ফেলুদা বলল, 'আপনার ভাগ্যটা খুব খারাপ দেখছি।'

'আর বলবেন না!' বললেন ভদ্রলোক, 'সোমেশ্বরবাবু এত আপ্যায়ন করে আমায় থাকতে বললেন, আর প্রথম রাত্রেই কী কাণ্ড! আমি একবারে থ মেরে গেছি!'

'রাত্রে কোনোরকম শব্দ-টব্দ পাননি?'

'একেবারেই না। আমি এমনিতে খুব ভালো ঘুমোই। এক ঘুমে রাত কাবার হয় আমার। কাজেই আমি কিছুই শুনিনি।'

'এ-বাড়ির সকলের সঙ্গে আলাপ হয়েছে?'

'যা হয়েছে, তাকে আলাপ বলা যায় না। একমাত্র সোমেশ্বরবাবু ছাড়া।'

'যে জিনিসটা চুরি হয়েছে, সেটা আপনি দেখেননি?'

'কী করে দেখব? প্রথমত ঠিক করে জানি না জিনিসটা কী। শুধু কৃষ্ণ শুনেছি, এই পর্যন্ত।'

'কৃষ্ণই বটে, তবে পঞ্চরত্নের তৈরি। যেমন সুন্দর, তেমন ভ্যালুয়েব্‌ল। লাখখানেকের উপর দাম হবে। ...আপনি কি এখনো এখানেই থাকবেন?'

'সোমেশ্বরবাবু ত তাই বলছেন। বলছেন, "আপনাকে ডেকে এনে, চলে যেতে বলার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। তবে আপনার থাকাটা আপনার পক্ষে তেমন সুখকর হতে পারল না, এই যা দুঃখ!" '

'আপনি যখন আছেন, তখন প্রয়োজনে আপনাকে আবার প্রশ্ন করা চলবে ত?'

'নিশ্চয়ই। এ নিয়ে ত কোনো কথাই উঠতে পারে না।'

এরপর আমরা সোমেশ্বরবাবুর কাছে গেলাম। ভদ্রলোক এখনো মুহ্যমান অবস্থায় রয়েছেন।

ফেলুদা বলল, 'আপনি কতটা ঘা খেয়েছেন, সেটা বুঝতে পারছি। কিন্তু আমি যখন এখানে উপস্থিত রয়েছি, তখন কৌতূহলবশত আপনাকে দু'-একটা প্রশ্ন না-করে পারছি না।'

'তা ত করবেনই। আপনার ত পেশাই এটা।'

'আপনি কোনোরকম টের পাননি, না?'

'টের পাইনি, তবে আঘাত পেয়েছি প্রচণ্ড। প্রথমত আমার অবিনাশ বেয়ারার এই দশা। লোকটা যে কী কাজের ছিল, তা বলতে পারি না। আর আমাকে কতটা মান্য করত, সেও বলে বোঝাতে পারব না। দ্বিতীয়ত, আমার পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ। দয়াল সিং নিজে হাতে তুলে দিয়েছিলেন জিনিসটা আমায়। বললেন, "তুমি শিল্পীর সেরা শিল্পী— তোমাকে এর চেয়ে কম পারিশ্রমিক দেওয়া যায় না।" আর সেই পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ চলে গেল! আর তাছাড়া—' সোমেশ্বরবাবু কী যেন বলতে গিয়ে, অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন।

তারপর কয়েক মুহূর্ত পরে প্রায় আপন মনেই বললেন, 'আমি কি ভুল করলাম? আশা করি ভুল করেছি। কারণ জিনিসটা সত্যি হলে, আমার পক্ষে আরো দ্বিগুণ বেদনাদায়ক হবে।'

'আপনি কিসের কথা বলছেন?' ফেলুদা জিগ্যেস করল।

'সে আপনি জানতে চাইবেন না, কারণ আপনাকে বলতে পারব না।'

'আপনি কিছু টের পাননি?'

'টের পেয়েছি, কিন্তু পেয়েও কিছু করতে পারিনি।'

'আপনার কথায় একটা রহস্যের সুর রয়েছে, সেটা আপনি উদ্‌ঘাটন করবেন কি? করলে, আমাদের অনেক সুবিধে হত।'

'সে অনুরোধ আমায় করবেন না, মিঃ মিত্তির। আপনি যদি এবার আমাকে রেহাই দেন, আমি বাধিত হব।'

'নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই—।'

আমরা তিনজন উঠে পড়লাম।

'তবে আমি নিজের স্বার্থে তদন্ত করতে চাই আপনার বাড়ির এই দুর্ঘটনার ব্যাপারে। তাতে আশা করি আপনার আপত্তি হবে না।'

'মোটেই না, অপরাধী যেই হোক্ না কেন, তাকে ধরা কর্তব্য।'

৬

বাড়ি এসে লালমোহনবাবু বললেন, 'সোমেশ্বরবাবুর কথাগুলো ভারি রহস্যজনক মনে হচ্ছিল, তাই না?'

'ঠিকই বলেছেন।' বলল ফেলুদা।

'আমার মনে হয়, ভদ্রলোক বেশ-কিছু কথা লুকিয়ে গেলেন।'

'আমারও সেই রকমই মনে হয়েছে।'

'আপনি নিজে কী বুঝেছেন?'

'একেবারে অন্ধকারে আছি, তা নয়। তবে ম্যাজিকের জগৎ নিয়ে একটু অনুসন্ধান চালাতে হবে। তাছাড়া অকশন-হাউসও একটা ব্যাপার আছে। আমি বরং একটু ঘুরে আসি। আপনারা দুজনে আড্ডা মারুন।'

আমি একটা কথা এই বেলা ফেলুদাকে না বলে পারলাম না। 'আচ্ছা ফেলুদা, নিখিলবাবুর কথা শুনে কি তোমার কিছু মনে হয়েছিল?'

'সেটা মনে হওয়া অস্বাভাবিক নয়। কেন নয়, সেটা অবিশ্যি তোকে ভেবে বার করতে হবে।'

ফেলুদা বেরিয়ে গেল।

লালমোহনবাবু বললেন, 'আমার কিন্তু এই আর্টিস্ট ভদ্রলোককে মোটেই ভালো লাগছে না। অবিশ্যি চাপ-দাড়ির বিরুদ্ধে আমার একটু প্রেজুডিস আছে এমনিতেই।'

'সূর্যকুমার ভদ্রলোকটিকে আপনার ভালো লাগছে?'

'ও-ও কেমন যেন পিকিউলিয়ার। তবে প্রথম দিন এসেই ও সিন্দুক খুলবে বলে মনে হয় না। ওই বাড়ির সঙ্গে ত ওর বিশেষ পরিচয় নেই। কোন্‌টা কার ঘর, কোথায় সিন্দুক আছে, কোথায় সিন্দুকের চাবি আছে—এসব জানা ওর পক্ষে সম্ভব নয়। তবে এটা ঠিক যে এ চোর খুনী-চোর। ওকে যখন বেয়ারা দেখে ফেলল, তখন ত ও ওকে ঘুঁষি মেরে অজ্ঞান করে দিতে পারত। পালানো নিয়ে ত কথা, আর বেয়ারার বয়সও ষাটের কাছাকাছি। বোঝা যাচ্ছে যে চোর ছুরি হাতে নিয়েই কুকীর্তিটা করতে বেরিয়েছিল।'

'এটা আপনি ঠিকই বলেছেন।'

'সোমেশ্বরবাবুও কী বলতে গিয়ে বললেন না, সেটা জানতে ইচ্ছা করে। আমার মনে হয় ওখানে একটা ইম্পর্ট্যান্ট ক্লু লুকিয়ে আছে।'

ঠিক এই সময় একটা ফোন এল। তুলে 'হ্যালো' বলতে ওদিক থেকে প্রশ্ন এল, 'মিঃ মিত্তির আছেন?'

ইন্‌স্পেক্টর ঘোষ। বললাম, 'ফেলুদা একটু বেরিয়েছে।'

ভদ্রলোক বললেন, 'ওঁকে বলে দেবেন যে কালপ্রিট ধরা পড়েছে। গোপচাঁদ বলে এক চোর— রিসেন্টলি

জেল থেকে বেরিয়েছে। অবিশ্যি লোকটা স্বীকার করেনি এখনো, কিন্তু সেদিন রাত্রে ও বেরিয়েছিল, সে খবর আমরা পেয়েছি। এটা আপনি জানিয়ে দেবেন। আর স্বীকারোক্তি পেলে, আবার আপনাকে টেলিফোন করব। আপনার দাদাকে নিশ্চিন্ত হতে বলে দেবেন।'

আমি ফোন রেখে দিলাম। মনটা কেমন জানি দমে গেল। এ ত ঠিক জমল না!

ঘন্টা দেড়েক পরে ফেলুদা আসাতে, আমি প্রথমেই ওকে ইন্‌স্পেক্টরের কথাটা বললাম। ফেলুদা যেন গা-ই করল না। বলল, 'সূর্যকুমারের ম্যাজিক খুব ভালো চলছে না, নিখিলবাবুর দোকানের অবস্থাও ভালো নয়। আর আমাদের আর্টিস্ট রণেন তরফদার গভর্নমেন্ট কলেজ অফ্ আর্টের ছাত্র ছিলেন না। প্যারিসে আঁকা শিখেছিলেন কিনা, সেটা অবিশ্যি জানতে পারিনি।'

'তাহলে এখন কী করণীয়?' লালমোহনবাবু প্রশ্ন করলেন।

'আমার দিক থেকে মোটামুটি কাজ শেষ। এখন রইল শুধু রহস্য উদ্‌ঘাটন। দাঁড়ান, আগে ইন্‌স্পেক্টর ঘোষকে একটা ফোন করি।'

ফেলুদা ফোনে প্রথমেই বলল, 'আপনার সমাধান যে মানতে পারছি না, মিঃ ঘোষ।'

ঘোষের উত্তরের পর ফেলুদা বলল, 'আমার ধারণা খুনী ওই বাড়িরই লোক। আপনি এক কাজ করুন। আমার সমাধান রেডি। আমি আজ বিকেলে সেটা ঘোষণা করতে চাই সোমেশ্বরবাবুর ওখানে। আপনিও আসুন। আমার কথা শুনে আপনার যদি কিছু বলার থাকে বলবেন। আমার এ অনুরোধটা আপনাকে রাখতেই হবে। তাছাড়া আপনাকে খুনীকে গ্রেপ্তার করার জন্য তৈরি হয়ে আসতে হবে। ... থ্যাঙ্ক ইউ।'

ফেলুদা ফোন রেখে বলল, 'ভদ্রলোক রাজি। গোপচাঁদ— হুঁ! এইজন্যই মাঝে মাঝে পুলিশের উপর থেকে ভক্তি চলে যায়।'

এরপর ফেলুদা সোমেশ্বরবাবুকে একটা ফোন করে, বিকেলে ওঁর ওখানে যাবার কথাটা বলে দিল। সেই সঙ্গে এ-ও বলে দিল যে সবাই যেন উপস্থিত থাকে।

বিকেল পাঁচটায় আমরা সোমেশ্বরবাবুর নিচের বৈঠকখানায় জমায়েত হলাম। ইন্‌স্পেক্টর ঘোষ আর দুজন কন্‌স্টেবল এসে গিয়েছিল আগেই।

সকলে যে-যার জায়গায় বসলে পর, ফেলুদা শুরু করল।

'প্রথমেই আমাদের যে প্রশ্নটার সামনে পড়তে হচ্ছে, সেটা হল চোর বাইরের লোক না ভেতরের লোক। এখানে প্রথম যেদিন চোর আসে, তার পরদিন আমি এসেছিলাম। বাড়ির চারদিকে ঘুরে মনে হয়েছিল— এখানে বাইরে থেকে চোর ঢোকা খুব মুশকিল। বারান্দার থাম বেয়ে উঠলেও, জিনিসপত্তর চুরি করে থাম বেয়ে নামার সুবিধে নেই। কাজেই আমার বাড়ির লোকের কথাই বেশি করে মনে হয়েছিল, এবং চোরের দৃষ্টি যে কিসের দিকে, সে সম্বন্ধেও আমার মনে কোনো সন্দেহ ছিল না।

'এবার চুরি এবং খুনের পর আমি সকলকে জেরা করি। সোমেশ্বরবাবুকে জেরা করতে জানতে পারলাম তিনি টের পেয়েছিলেন, কিন্তু বাধা দেবার কোনোরকম চেষ্টা করেননি। এতে মনে হয় তিনি চোরকে দেখে একেবারে হতচকিত হয়ে গিয়েছিলেন। কিন্তু চুরির পর যে খুন হবে, সেটা তাঁর পক্ষে জানা সম্ভব ছিল না। চুরির মোটিভ অবশ্য একটাই হতে পারে; চোরের হঠাৎ বেশ কিছু টাকার দরকার পড়ে গেসল।

'এ-বাড়িতে যাঁরা থাকেন, তাঁদের মধ্যে রণেন তরফদার ছবি এঁকে রোজগার করছিলেন, সাময়িকভাবে তাঁর অবস্থা স্বচ্ছন্দই বলা যেতে পারে। এ অবস্থায় তাঁর পক্ষে চুরি করাটা অস্বাভাবিক। অনিমেষবাবু ভালোই আছেন বন্ধুর আতিথেয়তায়, কাজেই তাঁকে বাদ দেওয়া যেতে পারে।

'এবার নিখিলবাবুতে আসা যাক্। নিখিলবাবুর একটা অকশন হাউস আছে। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, সে অকশন-হাউসের অবস্থা খুব ভালো না। সুতরাং নিখিলবাবুর পক্ষে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণটা পাওয়া খুবই লাভজনক হবে। কারণ তিনি নিজের অবস্থা সামলে নিতে পারবেন। আমার ধারণা, প্রথম দিন নিখিলবাবুই চুরির চেষ্টা করতে গিয়ে ব্যর্থ হন।'

নিখিলবাবু বলে উঠলেন, 'আপনি বিনা প্রমাণে লোককে দোষী সাব্যস্ত করছেন?'

ফেলুদা বলল, 'এখানে শেষ ত হয়নি— আপনি ত চুরি করতে পারেননি। কাজেই আপনি উত্তেজিত হচ্ছেন কেন? আমি ও বলছি না যে আমার যুক্তি অকাট্য। আমি শুধু অনুমান করছি। আপনি আপত্তি করতে চান ত করতে পারেন, কারণ আসল ঘটনা হল দ্বিতীয় দিনের।'

'প্রথম আর দ্বিতীয় দিনের ঘটনার মধ্যে একটি নতুন লোক এসে এ-বাড়িতে উঠেছেন, তিনি হলেন জাদুকর সূর্যকুমার। এটাও আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে সূর্যকুমার তাঁর প্রদর্শনীতে লোকসান দিচ্ছে। আমরা যেদিন তাঁর ম্যাজিক দেখতে যাই, সেদিনও হলে অনেক সীট খালি ছিল। এই সূর্যকুমার কি চুরি করে থাকতে পারেন? কারণ তাঁর টাকার দরকার ছিল অবশ্যই।'

সূর্যকুমার বলে উঠলেন, 'ভুলে যাচ্ছেন মিঃ মিত্তির, আমি সোমেশ্বর বর্মনের সিন্দুক ও তার মধ্যে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণ সম্বন্ধে কিছুই জানতাম না।'

'সূর্যকুমারবাবু,' ফেলুদা বলল, 'এবারে আমি আপনাকে একটা প্রশ্ন করতে চাই। সোমেশ্বরবাবুর আপনাকে খুব ভালো লেগে গিয়েছিল, তাই না?'

'তা লেগেছিল নিশ্চয়ই, তা না হলে আর আমাকে এখানে থাকতে বলবেন কেন?'

'কেন ভালো লেগেছিল, সে-বিষয় আপনার কিছু বলার আছে?'

'না।'

'আমি যদি বলি যে আপনি তাঁকে তাঁর প্রথম সন্তানের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিলেন। ইন ফ্যাক্ট তিনি বিশ্বাস করেছিলেন আপনিই তাঁর বড় ছেলে? সোমেশ্বরবাবু, আমি কি খুব ভুল বলেছি?'

'কিন্তু আমার ছেলেই আমার শত্রু হল শেষ পর্যন্ত?'

'সূর্যকুমারবাবুর গলার আওয়াজ একটু পাতলা, যার ফলে তাঁর ব্যক্তিত্বের কিছুটা হানি হয়। আমি নিখিলবাবুর কণ্ঠস্বরেও ঠিক একই পাতলা ভাব পেয়েছি। চেহারা দাড়ি-গোঁফ লাগিয়ে যতই পরিবর্তন করা যাক না কেন, কণ্ঠস্বর তো আর বদলানো যায় না। আমার মনে হয় এই কণ্ঠস্বরেই সোমেশ্বরবাবু চিনেছিলেন।'

'ঠিকই বলেছেন মিঃ মিত্তির, অখিলের গলার আওয়াজ আমি চিনেছিলাম।'

'তাহলে সূর্যকুমারও পঞ্চরত্নের কৃষ্ণের কথাটা জানতেন?'

'আমি জানতে পারি', বললেন সূর্যকুমার ওরফে অখিল বর্মন, 'কিন্তু সে কৃষ্ণ সিন্দুকে ছিল না। আমি কিছুই চুরি করিনি।'

ঘরের মধ্যে একটা সোরগোল পড়ে গেল। আমি ও অবাক! কৃষ্ণ ছিল না সিন্দুকের মধ্যে, তবে সেটা কোথায় গেল?

'না, কৃষ্ণ ছিল না ঠিকই।' বলল ফেলুদা, 'আপনি চোর নন, কিন্তু আপনি খুনী।'

'কিন্তু আমার কৃষ্ণ কোথায় গেল?' চেঁচিয়ে উঠলেন সোমেশ্বরবাবু।

'এই যে আপনার কৃষ্ণ।'

ফেলুদা তার কোটের পকেট থেকে জিনিসটা বার ক'রে তার সামনে টেবিলের উপর রেখে দিল।

'আপনাদের বাড়িতে দুবার চোর আসেনি। তিনবার এসেছিল। আমি যখন খবর পাই সূর্যকুমার এ বাড়িতে এসে থাকছেন, তখনই আমার সাবধানতা অবলম্বন করার ইচ্ছেটা জাগে। নিখিলবাবুর সঙ্গে গলার আওয়াজ আর কথা বলার ঢং-এ মিল পেয়ে, আমার প্রথমেই সন্দেহ হয়েছিল যে সূর্যকুমার আসলে অখিল বর্মন। উনি যখন নিজের পরিচয় গোপন করে রাখলেন, তখনই আমার মনে হল যে ওঁর কোনো এব দুরাভিসন্ধি আছে। তারপর জানতে পারলাম ওঁর রোজগার ভালো যাচ্ছে না— উনি দেনা করে বসে আছেন প্রতিবারই লোকশান দিচ্ছেন। তখনই আমি স্থির করি যে পঞ্চরত্নের কৃষ্ণটা আর সিন্দুকে থাকতে দেওয়া উচিত নয়। দারোয়ানকে মোটা ঘুস দিয়ে আমি বাড়িতে ঢুকি। তারপর বারান্দার থাম বেয়ে ওপরে উঠে আমার হাত-সাফাইয়ের জোরে সোমেশ্বরবাবুর বালিশের তলা থেকে চাবিটা নিয়ে সিন্দুক খুলে, তার থেকে কৃষ্ণটা বার করে নিই। তারপর আবার একই পথে ফিরে আসি। দুঃখের বিষয়, আমি অবিনাশের হত্যাটাকে রুখতে পারলাম না।'

ইন্‌স্পেক্টর ঘোষ ততক্ষণে এগিয়ে গেছেন সূর্যকুমারের দিকে। ফেলুদা বলল, 'এই একটা ব্যাপার যেখানে আপনার ম্যাজিক খাটবে না, অখিলবাবু।'

সোমেশ্বরবাবু উঠে এসে ফেলুদার হাতটা আঁকড়ে ধরলেন। 'আপনার জন্য আমার কৃষ্ণ বেঁচে গেল আপনাকে ধন্যবাদ দেবার ভাষা আমার নেই।'

বাড়ি ফিরে এসে লালমোহনবাবু ফেলুদাকে বললেন, 'মশাই, এতদিন আপনার ওপর ভক্তির ভাবই ছিল এবার ভয় ঢুকল। আপনি যে তস্করের শিরোমণি, সেটা ত জানা ছিল না!'

রচনাকাল : ২২/৪/৮৭ — ২৬/৪/৮৭

নামাঙ্কন : সন্দীপ রায়। ছবি : সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়

সোনার খনির অভিশাপ

নলিনী দাশ

চলতে চলতে হঠাৎ থমকে গিয়ে মালু বলে উঠল, 'বা—ঘ!' তার মুখ কাগজের মতো সাদা!

'কী হবে রে!' বলে বুলু বরফের মতো ঠাণ্ডা হাতে আমার হাত চেপে ধরে, ঠক্‌ঠক্ করে কাঁপতে লাগল। আমারও শিরদাঁড়া বেয়ে যেন শিরশিরিয়ে একটা ঠাণ্ডা স্রোত নেমে গেল!

কালু কিন্তু এত সহজে ঘাবড়াবার পাত্রী নয়। মাটিতে উবু হয়ে বসে, ভিজে বালিতে পায়ের ছাপগুলো লক্ষ করে দেখে ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'ঐ জাতীয় কোনও জানোয়ারের পায়ের ছাপ, তাতে সন্দেহ নেই। তবে কথা হচ্ছে যে—'

তার মুখের কথা শেষ হবার আগেই পাশের ঝোপ থেকে একটা খস্‌খস্ শব্দ শুনে, সে ধড়মড়িয়ে উঠে দাঁড়াল।

চিড়িয়াখানার মতো একটা বোটকা গন্ধ আমাদের নাকে এসে পৌঁছল। চাপা গলায় মালু বলল, 'বাঘের গায়ের গন্ধ পাচ্ছি!'

এরই মধ্যে মাথা ঠাণ্ডা রেখে কালু কিন্তু নির্দেশ

দিতে লাগল, 'একটুও শব্দ করবি না। খস্‌খস্‌ আওয়াজ। যে দিক থেকে আসছে, তার উল্টোদিকে পা টিপে-টিপে চল্‌। আমি লাঠি নিয়ে পিছনে আছি।'

কালুর সাহস দেখে মালু আর আমার কিছুটা সাহস ফিরে এল। তবু পা যেন আর চলতেই চায় না। বুলুকে আমরা দুজন শক্ত করে না ধরে রাখলে, হয়তো সে পড়েই যেত!

কালুরও মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তবু চুলের ঝুঁটি শক্ত করে বেঁধে, হাতের লাঠি বাগিয়ে ধরে, সে আমাদের সকলের পিছনে আসছিল। সত্যি সত্যি বাঘ এসে ঘাড়ের উপরে পড়লেও তাকে দু-এক ঘা না মেরে সে হার মানতে রাজি নয়! খস্‌খস্‌ শব্দটা হঠাৎ যেন বড্ড কাছে এসে পড়ল! আমরা যেন পরস্পরের নিঃশ্বাসের শব্দ আর বুকের টিপ্‌-টিপ্‌ শুনতে পাচ্ছিলাম। পরক্ষণেই যখন ঝোপের মধ্যে থেকে একজোড়া শেয়াল বেরিয়ে পালিয়ে গেল, তখন আমরা সবাই জোরে হেসে উঠলাম।

একটু পরেই সামলে নিয়ে আমি বললাম, 'ও দুটো শেয়াল হতে পারে, কিন্তু পায়ের ছাপগুলো সত্যিই বাঘের!'

কালু সে কথা অস্বীকার করল না!

বুলু আরও ভয় পেয়ে বলে উঠল, 'চল্‌ চল্‌, শিগ্‌গির এখান থেকে পালিয়ে চল্‌! নিশ্চয় আমরা বড়-বনের কাছাকাছি এসে গেছি। নিশ্চয়ই এখানে বাঘ বেরোয়, হায়নার ডাক তো শুনতেই পাই এইদিক থেকে!'

কালু গম্ভীরভাবে বলল, 'সন্ধেবেলা হায়না-চিতা এ-সব বেরনো কিছুই বিচিত্র নয়। তার আগেই আমরা ফিরে যাব। আগে মালুর সোনার খনিটা আবিষ্কার করে নিই!'

'না-না, সোনার খনি এখন মাথায় থাকুক! তাড়াতাড়ি ফিরে চল্‌ হয়তো এখনই সন্ধে হবে! ক'টা বাজল?'

এই কথার সঠিক জবাব আমরা কেউই দিতে পারলাম না। কালুর ঘড়ি ভাঙা, মালু অভ্যাসবশত ঘড়ি আনতে ভুলে গেছে, বুলুর ঘড়ি থেমে গেছে, আর আমার তো ঘড়িই নেই!

সময় অনুমান করবার জন্য আকাশের দিকে তাকিয়ে কিছুই বোঝা গেল না! এমন বিশ্রী ঘোলাটে আকাশ—বেলা দশটা বা বিকেলে চারটে, যাহোক হতে পারে!

কালু বলল, 'যটাই বাজুক—আমার এখন ভীষণ খিদে পেয়েছে! না খেয়ে আর এক পা-ও নড়ছি না!'

একটা অপেক্ষাকৃত সমতল ঢিপির উপর কাগজ বিছিয়ে, সে আমাদের সকলের বসবার জায়গা করল।

তার কথা শুনে, আমাদের সকলেরই পেটে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সেই ভোরে চা-রুটি-ডিম খেয়েছি। হাঁটতে হাঁটতে সে তো কোন যুগে হজম হয়ে গেছে!

সাময়িক ভাবে ভয় ভুলে গিয়ে, বুলু চারটে শালপাতার ঠোঙায় লুচি ও আলুর দম ভাগ করতে বসল! যতই গোমড়া-মুখো হোক্‌ ঘনশ্যামদা, খাবার তৈরি করতে তার জুড়ি নেই! মালু পাঁউরুটি ভালবাসে না আর কালু নিরামিষ খেতে চায় না বলে, কোন ভোরবেলা সে লুচি আর মাংসের কাটলেট ভেজেছে! বুলুর প্রিয় সন্দেশ আর আমার শখের আমের আচার দিতেও ভোলেনি। পরিতৃপ্তির সঙ্গে খাওয়া শেষ করে, বোতলের জল খেয়ে, আচার চুষতে চুষতে আমরা আলোচনা করতে বসলাম—এবার কী করা যেতে পারে।

মালু অন্যমনস্ক হয়ে হয়তো-বা সোনার খনিরই স্বপ্ন দেখতে শুরু করল!

আমাদের দু'ধারে প্রায় খাড়া মাটির দেয়াল দোতলার সমান উঠে গেছে। তার গায়ে গায়ে কোথাও ছোটখাটো ঝোপঝাড়, আর মাথার উপরে তাকিয়ে দেখছি— উপরের বুনো গাছের ডাল। পায়ের তলায় প্রথমে খোয়াইয়ের ঢালু মাটি পেয়েছিলাম, গড়গড়িয়ে কতদূর জানি হেঁটে এসেছি! এখন কিন্তু ভিজে ভিজে বালি আর সমতল জমি রয়েছে তলায়। যতক্ষণ খোয়াই-পথ নেমে চলেছিল, ততক্ষণ অন্তত কোনদিক

থেকে এসেছি কোনদিকে চলেছি, সে সম্বন্ধে কোনও সন্দেহের অবকাশ ছিল না। এখন কিন্তু মনে হচ্ছে যেন এলোমোলো ঘুরছি—সব পথই একরকম মনে হচ্ছে! কিম্বা হয়তো এক পথেই বারবার ঘুরছি!

অবশেষে কালুও মেনে নিতে বাধ্য হয়েছে যে আমরা পথ হারিয়ে ফেলেছি! কোনদিকে স্কুলবাড়ি, কোনদিকেই বা বড়-বন—কিছুই ঠাওর করতে পারছি না!

মালু আকাশের দিকে তাকিয়ে আচার চাটতে চাটতে দিবাস্বপ্ন দেখছিল। এখন বলল, 'আমার কিন্তু হারিয়ে যেতে বেশ ভাল লাগছে। যদি কেউ আমাদের খুঁজে না পায়, তা হলে বেশ হয়! সত্যিই যদি আমরা সোনার কিম্বা হিরের খনি আবিষ্কার করে ফেলি, তা হলে কী মজাই না হয়!'

আমি বললাম, 'এখন তো বেশ লাগছে! কিন্তু খাবার যখন ফুরিয়ে যাবে, রাত্রে যখন বাঘ বেরোবে, তখন কী হবে?'

বুলু তাড়াতাড়ি বলল 'অমন কু-ডাক ডাকিস না। এখনই কী করে ফেরা যায়, তার উপায় বার কর!'

আমাদের এই পরিস্থিতিটা ভাল করে বুঝতে হলে, আমাদের স্কুল আর তার পারিপার্শ্বিক পরিবেশকে একটু জানা দরকার। কলকাতা থেকে অনেক দূরে, নির্জন পাহাড়ে জায়গায় একটা চমৎকার বোর্ডিং-স্কুলে থেকে কালু, মালু, আর আমি (টুলু) পড়াশোনা করি। আরও শ'খানেক মেয়ে থাকে, পাঁচ-ছ'জন টিচারও বোর্ডিংএ থাকেন। পশ্চিমে কাঞ্চনপুর, উত্তরে দেওদারগঞ্জ আর পূর্বদিকে ঝাউতলা থেকে বাসগুলো স্কুলের সামনের পাকা রাস্তা দিয়ে চলে। বাকি মেয়েরা আর টিচারেরা তাতেই আসা-যাওয়া করেন।

স্কুলের পশ্চিমে জমিদার বাড়িতে যে দাদু থাকেন, তিনিই আসলে এই স্কুল স্থাপন করেছিলেন। তিনি অবশ্য আমাদের আপন দাদু নন। কিন্তু তাঁর কয়েকটা রহস্যের সমাধান করে দেবার পর থেকে, তিনি আমাদের নিজের দাদুর মতোই হয়ে গেছেন। ছোটখাটো ছুটিতে অনেক সময়ে তাঁর বাড়িতেই আমরা থাকি। লাইব্রেরিতে আর আমবাগানে কত মজা করি, খাবার-দাবার সঙ্গে নিয়ে (আজকের মতো) নদীর ধারে বা কাঞ্চনপুরের পথে চড়ুইভাতি করি। কত কিছু আমরা অনুসন্ধান করে বেড়াই, সাধে বন্ধুরা আমাদের নাম দিয়েছে গোয়েন্দা-গণ্ডালু!

আজকের অভিযানের সূত্রপাত হয়েছিল শুক্রবার ভূগোল ক্লাসে। পাহাড় আর উপত্যকা কাকে বলে বোঝাবার জন্য মণিকাদি স্কুলের পারিপার্শ্বিককে উদাহরণ দিয়েছিলেন। কাঞ্চনপুরের পশ্চিমে ছোট বড় কত পাহাড়—সেখান থেকে বাসের রাস্তাটা নামতে নামতে, আমাদের স্কুল পার হয়ে, রঙ্গনা নদী পর্যন্ত চলে গেছে। তারপরে পোল পার হয়ে রাস্তাটা আবার ক্রমাগত উঠতে উঠতে ঝাউতলার উঁচু জমিতে পৌঁছেছে। ঝাউতলার পরে আবার পাহাড়ের সারি।

সাধারণত নদীতে সামান্যই জল থাকে, আমরা জুতো খুলে হেঁটে নদী পার হই। কিন্তু যখন ঝমঝমিয়ে বৃষ্টি পড়ে, তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই নদীতে এমন ঘোলা জলের স্রোত আসে যে মনে হয় হাতি-গণ্ডারকেও ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে! পরদিন আবার আমাদের ছোট-নদী ঝির্‌ঝিরিয়ে বইতে থাকে!

মণিকাদি বলেছিলেন যে পূর্ব-পশ্চিমের সমস্ত পাহাড় আর উঁচু জমিতে পড়া বৃষ্টির জল এসে উপত্যকার এই রঙ্গনা নদীতে পড়ে, তাই নদীতে অমন ঢল নামে।

সন্ধেবেলা মালু হঠাৎ কালুকে জিজ্ঞেস করল, 'আচ্ছা, বৃষ্টির জলে মাটি ক্ষয় হয়ে হয়েই তো খোয়াই সৃষ্টি হয়েছে, তা হলে স্কুলবাড়ির পিছনের খোয়াইগুলো পূর্ব দিকে না গিয়ে, দক্ষিণে বড়-বনের দিকে গেছে কেন? নদী তো আমাদের পূর্বদিকে।'

কালু বলল, 'নিশ্চয় দক্ষিণে কিছু দূর গিয়ে, তারপর খোয়াইগুলো ঘুরে পূর্ব দিকে গিয়ে নদীতে পড়েছে। নইলে অত জল যাবে কোথায়?'

সন্দেহের সঙ্গে আমি বললাম, 'অত নিশ্চিত করে, কী করে বলছিস? খোয়াইগুলোর দিকে তাকিয়ে তো সে রকম কিছু বলা যায় না!'

মালু উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল, 'চল্ না, আমরা অনুসন্ধান করে দেখি—তোর কথা সত্যি কি না!'

রবিবার দাদুর বাড়ি থেকে চড়ুইভাতির নাম করে বেরোতে, কোনও অসুবিধাই ছিল না.

বুলু কিন্তু খোয়াই ধরে যাবার প্রস্তাবে ভয় পেয়ে গেল।

'ও বাবা—শেষকালে বড়-বনের কাছে গিয়ে পড়ব! যদি বাঘ বেরোয়?'

আমি বললাম, 'তা ছাড়া কোথায় যাচ্ছি ঠিক করে না বলে কি আমাদের বেরনো উচিত?'

কালু কিন্তু কিছুতেই দাদুকে সব কথা খুলে বলতে রাজি হল না।

'শেষে যদি তিনি বাধা দেন? তার চেয়ে একেবারে নতুন জায়গা ঘুরে, মানচিত্র তৈরি করে—মণিকাদি, অণিমাদি, দাদু—সবাইকে তাক লাগিয়ে দেওয়া যাবে!'

আমারও বেশ একটা ভয় মেশানো রোমাঞ্চকর অনুভূতি হচ্ছিল। বুলুও শেষপর্যন্ত পিছনে পড়ে থাকতে রাজি হল না। আমাদের চার বন্ধুর সমস্ত আমোদ ও অ্যাডভেঞ্চার একসঙ্গে—বিপদই যদি হয়, না হয় এক সঙ্গেই বিপদ হবে!

দাদুকে কালু বলে এসেছিল যে আমরা নদীর ধারে চড়ুইভাতি করব! সত্যিই আমরা ভেবেছিলাম যে খোয়াই ধরে নদীর ধারে পৌঁছে, তারপর খাওয়া-দাওয়া করব। কিন্তু কোথায় নদী আর কোথায় কী? কিছুই বুঝতে পারছি না! আমার এমন প্রিয় আম-তেলও যেন সম্পূর্ণ উপভোগ করতে পারছি না। বুলুর মুখে আবার ভয়ের ছাপ পড়েছে। কেবল কালু নির্বিকার—একটা পকেট-বুক থেকে পাতা ছিঁড়ে, খোয়াইয়ের মানচিত্র আঁকবার চেষ্টা করছে। আর মালু আকাশের দিকে তাকিয়ে কি যেন ভাবতে শুরু করে দিয়েছে!

হঠাৎ মালু বলল, 'এখানে কি কেবল রাত্রেই বাঘ বেরোয়? আমার এই জায়গাটা ভয়ানক রোমাঞ্চকর মনে হচ্ছে! দিনেও এখানে কত কিছু ঘটতে পারে! হয়তো কোনও গুপ্তধন থাকতে পারে! হয়তো কোনও গুণ্ডা বা ডাকাত লুকিয়ে থাকতে পারে!'

গুণ্ডা আর ডাকাতের নামে বুলুর মুখ সাদা হয়ে যেতে দেখে, আমি ঠাট্টা করে বললাম, 'কিম্বা হয়তো কোনও রাজপুত্র পক্ষিরাজ ঘোড়ায় চড়ে আসতে পারে! কিম্বা হয়তো ব্যঙ্গমা-ব্যঙ্গমীর একটা ছানা থাকতে পারে!'

মালু বলল, 'এখনও বুঝি আমি বাচ্চাদের রূপকথা পড়ি? লিপিকা বসুর লেখা 'সোনার খনির সন্ধানে' তো সকলেই পড়েছিস। স্কুলের ছেলে হেন্‌রি আর জন কত রকম অ্যাডভেঞ্চারের পর সত্যি সত্যিই সোনার খনি আবিষ্কার করে ফেলল, মনে নেই? আমরাও যদি সেই রকম কিছু একটা করে ফেলি, তা হলে কেমন হয়?'

রোমাঞ্চকর গল্প সম্বন্ধে মালুর উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশি। সে ঠিক করেছে যে বড় হয়ে লেখিকা হবে। নানা রকম অ্যাডভেঞ্চারের গল্প লিখবে।

কালু বলে, 'দূর, শুধু ঘরে বসে গল্প লিখে কী লাভ! তার চেয়ে যদি নিজেরাই অ্যাডভেঞ্চার করতে পারি—'বুলু আর আমি বলি, 'আমরাও দলে আছি। তোর সঙ্গে সত্যি অ্যাডভেঞ্চারেও যোগ দেব, আবার মালুর লেখা রোমাঞ্চকর কাহিনীও পড়ব!'

লিপিকা বসুর লেখা অবশ্য আমরা সকলেই ভালবাসি। যদিও তাঁর নায়ক-নায়িকারা নানা বিপদের মধ্যে থেকে সব সময়েই অক্ষত ভাবে বেরিয়ে আসবে জানি, তবু বেশ একটা ভয় আর উত্তেজনা লাগে বইগুলো পড়তে। তা ছাড়া তাঁর গল্পের বর্ণনা ভারী চমৎকার! পাহাড়-নদী-বন-খোয়াই সব যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে—সবই যেন কেমন চেনা চেনা লাগে!

কালু বলে 'দ্যাখ, লেখিকা নিশ্চয় কোনওদিন

আমাদের এই অঞ্চলে এসেছেন না হলে তাঁর বর্ণনা কেন এ রকম হবে?

আজ কিন্তু কালু আলোচনায় যোগ দিল না। পথ হারিয়ে ফেলে সে অভিযানের নেতা হিসাবে একটু বিব্রত বোধ করছিল। উপর দিকে তাকিয়ে সে বলল, 'দ্যাখ্, ঐ গাছটার গোড়ায় যদি পৌঁছতে পারি, তা হলে নিশ্চয় গাছের ফাঁক দিয়ে দেখে বুঝতে পারব' এখন কোন দিকে যেতে হবে।'

বলে কী মেয়েটা! এখানে খোয়াইয়ের ধারগুলো এমন খাড়া, তাই বেয়ে টিকটিকি ছাড়া আর কোনও প্রাণীই হয়তো উঠতে পারবে না!

কিন্তু দেখা গেল যে কালুর মাথা খারাপ হয়নি। ঝোলার মধ্য থেকে তার দড়ির মইটা বার করে, এক প্রান্তে একটা দড়ির সঙ্গে ঢিল বেঁধে নিল। তারপরে বার দুই বৃথা চেষ্টার পরে, ঢিলটা ছুড়ে গাছের গোড়ায় আটকে ফেলল।

কালু কিছু বলবার করবার আগেই মালু বলে উঠল, 'আমি আগে যাই আমি সবচেয়ে হালকা!'

বলেই তড়বড়িয়ে মই বেয়ে উঠতে গেল আর দড়ি খুলে হুড়মুড়িয়ে পড়ে গেল!

'ও মাগো!' বলে চেঁচিয়ে উঠল বুলু।

কালু আর আমি ধরে না ফেললে, সে দিন একটা সাঙ্ঘাতিক বিপদ ঘটে যেতে পারত।

এর পরে আর মালু মই বেয়ে ওঠার নাম করল না।

ঠিক তখনই সেই শব্দটা আমার কানে গেল! শব্দটা এত আস্তে, সেটা যে একটা গোঙানি, না চাপা কান্না, না আর কিছু ঠিক বুঝতে পারলাম না। তবু বুলু একটা চাপা আর্তনাদ করে উঠল আর কালু তাকে ধমক দিল।

সবাই কান পেতে উদ্‌গ্রীব হয়ে রইলাম। কিন্তু অনেকক্ষণ আর কিছু শুনতে পেলাম না।

কালু বলল, 'সত্যি কোনও শব্দ শুনেছিলি তো? কল্পনা করে নিসনি?'

আমি বললাম, 'আমি কি মালু?'

সঙ্গে সঙ্গে আবার একটা মৃদু শব্দ পেলাম—এ বার যেন আরও আস্তে!

মালু সন্দেহের সঙ্গে বলল, 'এ কি মানুষের গলার স্বর-না আর কিছু—'

'আবার কী হবে?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

মালু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'আমাদের মতো কত লোক হয়তো এই রহস্যময় খোয়াইয়ের মধ্যে পথ হারিয়ে ঘুরেছে! কেউ কেউ হয়তো শেষপর্যন্ত পথ খুঁজে পায়নি—তাদের প্রেতাত্মা—'

বুলু বলল, 'বলিস না, বলিস না, তা হলে আমি ভয়েই অজ্ঞান হয়ে যাব।'

'থাম্ না তোরা শব্দটা শুনতে দে।'

কিন্তু এরপরে আর আমরা কোনও শব্দ শুনতে পেলাম না।

কালু বলল, 'তোরা তৈরি থাক্, আমি সাবধানে একটু এগিয়ে দেখি! যদি দু'বার জোরে হুইস্‌ল্ দিই, তা হলে আমার দিকে আসবি। আর যদি আস্তে একবার দিই, তা হলে নিঃশব্দে উল্টোদিকে পালিয়ে যাবি।'

কালুর হাত ধরে বুলু বলল, 'যাস্ না, যাস্ না কালু, তার চেয়ে আমরা সকলে পালিয়ে যাই!'

কালু বিরক্ত হয়ে বলল, 'তোদের এত ভয়?'

হঠাৎ মালু বলে উঠল, দ্যাখ্ দ্যাখ্, বালিতে পায়ের ছাপ!'

কী আশ্চর্য! আমরা কেউ লক্ষ করিনি—ভিজে বালিতে মানুষের পায়ের ছাপই তো বটে!

নতুন উত্তেজনায় আমাদের ভয়টা চাপা পড়ে গেল।

'এ তো একেবারে টাটকা পায়ের ছাপ বলে মনে হচ্ছে!'

'অল্পক্ষণ আগেই কে এখান দিয়ে হেঁটে গেছে!'

কালু এতক্ষণ ছাপগুলো লক্ষ করছিল এবার বলল, 'মনে হচ্ছে যেন নতুন জুতোর ছাপ। আরও লক্ষ করে দ্যাখ্ ছাপগুলো একই রকম ছাপ, এক সারি চলে গেছে, কোথাও একটার উপর আর একটার ছাপ পড়েনি!'

মালু বলল, 'তার মানে কেবল একজনই ছিল? এত

ছোট তার পা? দুটো ছাপের মধ্যে দুরত্ব কত কম—ছোট ছেলে নয় তো?'

আমি বললাম, 'সাইজে ছোট নিশ্চয়, তবে বয়সে ছোট কি না কে জানে! গুণ্ডা, না ভাল লোক?'

মালু বলল, 'তা হলে গোঙাচ্ছিল কে? হয়তো ছেলেটিকে ঐ দিকে কোনও দুষ্টু লোক ডেকে নিয়ে গেছে! কিম্বা হয়তো বাঘে ধরেছে! কিম্বা হয়তো—'

কালু এতক্ষণ কিছু না বলে, কান পেতে শুনছিল। আবার একটা চাপা গোঙানির মতো শোনা যেতেই কালু বলে উঠল, 'যেই হয়ে থাকুক, নিশ্চয় কোনও বিপদে পড়েছে!'

বিনা বাক্যব্যয়ে আমরা সবাই কালুর পিছনে গেলাম। বাঁক ঘুরতেই দেখতে পেলাম যে খোয়াইটা সেখানে হঠাৎ অনেকটা নিচু হয়ে গেছে, আর তার ঠিক নীচে হুমড়ি খেয়ে একজন মহিলা পড়ে আছেন, তাঁরই পায়ে সেই নতুন জুতো। একটু দূরে একটা লাঠি আর মস্ত বড় হাত-ব্যাগ ছিটকে পড়েছে। আমরা তাঁর সাহায্যের জন্য চারজনে এগিয়ে গেলাম।

এর পরে যা ঘটল, সেটা যেন লিপিকা বসুর লেখা কোনও রোমাঞ্চকর গল্পের পরিসমাপ্তির মতো। মালু তার বোতল থেকে মুখে-চোখে জল ছিটিয়ে দিল, আর কালু একটা ভাঁজ করা খবরের কাগজ দিয়ে হাওয়া করতে লাগল। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভদ্রমহিলার

জ্ঞান ফিরে এল। তাঁর কপালের পাশে যেখানে চোট লেগেছিল, সেখানে আমার প্রাথমিক চিকিৎসার সরঞ্জামগুলিও কিছুটা কাজে লাগানো গেল। বুলু যখন তাঁর লাঠি আর হাত-ব্যাগ কুড়িয়ে এনে দিল, ততক্ষণে তাঁর মুখে কথাও ফুটেছে। মহিলার নির্দেশ মতো ডানপিটে কালু হাম্‌চে-খাম্‌চে খোয়াইয়ের একটা অপেক্ষাকৃত ঢালু অংশ দিয়ে উপরে উঠেই, আনন্দে চিৎকার করে উঠল, 'আরে! ঐ তো নদী! ঐ তো আমাদের চেনা রঙ্গনা নদী! সত্যিই আমরা খোয়াই ধরে ধরে নদীর ধারে এসে পৌঁছে গেছি!'

কালুর ঝুলিয়ে দেওয়া দড়ির সাহায্যে, আমরা সবাই একে একে উপরে উঠলাম। এমনকি সেই মহিলাকেও সাহায্য করে উপরে তুললাম।

দূরে একটা ছাই রঙের ফিয়াট গাড়ি দাঁড়িয়ে ছিল। আমাদের দেখতে পেয়ে ড্রাইভার এগিয়ে এল, আর ভদ্রমহিলাকে নমস্কার জানাল।

অবাক হয়ে দেখছিলাম খোয়াইগুলো কী করে পূর্বদিকে ঘুরে নদীতে পড়েছে, আর নদীটা এঁকেবেঁকে দক্ষিণে চলে গেছে।

আরও একটা পোল দেখা গেল। দূরে পাকা রাস্তা আর বাড়িঘর দেখতে পেলাম।

ভদ্রমহিলা হেসে বললেন, 'এটা তোমাদের ঝাউতলারই একটা অংশ বলতে পারো। এখান থেকে আমার মোটরেই তোমাদের স্কুলে ফিরে যেতে পারবে।'

কী আশ্চর্য! আমরা কে তা না জেনেই ভদ্রমহিলা আমাদের স্কুলের কথা জানলেন কী করে?

পরমুহূর্তেই মনে হল যে এ দিকে তো আর কোনও মেয়েদের স্কুল নেই, সুতরাং এটা ঝেঝা খুব সোজা।

ঝাউতলার এই দিকটায় আমরা কেউ এর আগে আসিনি। ভদ্রমহিলা তাঁর গাড়িতে করে নদীর ধারে তাঁর সুন্দর ছোট্ট বাংলো বাড়িতে নিয়ে গেলেন। বারান্দায় বসে গরম গরম চা, কেক আর চিঁড়েভাজা খেতে খেতে, দূরে আমাদের চেনা পাহাড়গুলোকে অচেনা দিক থেকে দেখতে লাগলাম। কালুর দূরবীণটা নিয়ে আমাদের স্কুল আর দাদুর বাড়ি পর্যন্ত স্পষ্ট দেখা গেল।

আমাদের ঝোলা, লাঠি, দড়ি, দূরবীণ সব কিছুই ভদ্রমহিলা লক্ষ করে দেখছিলেন।

এ বারে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমরা বুঝি খুব অ্যাডভেঞ্চার করতে ভালবাস? বড় হয়ে কী করবে? ভূ-পর্যটক হবে?'

কালু বলল, 'এখনও মনস্থির করতে পারিনি। তবে কিছু-একটা নতুন জিনিস নিশ্চয়ই আবিষ্কার করব!'

মালু বলল, আমি কিন্তু ঠিক করেছি লেখিকা হব। লিপিকা বসুর মতো রোমাঞ্চকর গল্প-উপন্যাস লিখব।'

'তার লেখা তোমাদের ভাল লাগে?' আস্তে আস্তে জিজ্ঞেস করলেন ভদ্রমহিলা।

উৎসাহিত হয়ে কালু-মালু-বুলু সায় দিল।

আমি ওদের কথায় যোগ দিইনি। তাই আমি সব কিছু লক্ষ্য করবার সুযোগ পেয়েছিলাম। অনেকক্ষণ থেকেই একটা সন্দেহ মনে দানা বেঁধে উঠছিল! এতবড় হাত-ব্যাগে দিস্তা-কাগজের তাড়া, নির্জন জায়গায় বাড়ি, খোয়াইয়ের মধ্যে একা বেড়াবার শখ, আলমারিতে নানা রকম অ্যাডভেঞ্চারের বই—তবে কী...

হাসি মুখে ভদ্রমহিলা কালু-মালুর কথা শুনছিলেন। আমি তাঁর ঘরের মধ্যে ওটা-সেটা দেখতে দেখতে হঠাৎ টেবিলের উপরে একটা চিঠি দেখতে পেয়ে উত্তেজিত হয়ে চেঁচিয়ে উঠলাম, 'কে—কে—আপনি?'

মৃদু হেসে মহিলা বললেন, 'তোমরা তো এত গোয়েন্দাগিরি করো, তোমরাই বলো, আমি কে!'

এর পরের উত্তেজনা কি আর ভাষায় বর্ণনা করে বলা যায়?

মোট কথা, আমরা যখন লিপিকাদির গাড়িতে করে দাদুর বাড়ি ফিরে এলাম, ততক্ষণে তাঁর সঙ্গে আমাদের খু—উব ভাব হয়ে গেছে। তিনি কথা দিয়েছেন যে আমাদের বিষয়ে একটা রহস্যের গল্প লিখবেন।

আনন্দের চোটে আমাদের মনে হচ্ছে যেন সত্যি সত্যিই অপ্রত্যাশিত ভাবে সোনার খনির সন্ধান পেয়ে গেছি!

ছবি : সত্যজিৎ রায়

পুরনো 'সন্দেশ' থেকে

শার্লক হোমস্-এর রহস্য
রুদ্ধ ঘরের রোমাঞ্চ
অ্যাড্রিয়ান কন্যান ডয়েল

শার্লক হোমস্-এর সম্পূর্ণ উপন্যাস

আড্রিয়ান কন্যান ডয়েল

অনুবাদ : রত্না সান্যাল ভট্টাচার্য

সেটা ছিল ১৮৮৮ সালের ১২ এপ্রিল। ভারী নাটকীয় ভাবে শার্লক হোমস্-এর একটা অভিনব অ্যাডভেঞ্চারের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সেই সময় ডাক্তারি করে প্যাডিংটন ডিস্ট্রিক্ট-এ আমার বেশ নামডাক হয়েছিল। বয়সটাও কম ছিল। খুব কাজেরও ছিলাম। তাই সকালে সবার আগেই উঠে পড়তাম। আটটা বাজলেই আমাকে নীচের হলঘরে পাওয়া যেত। সকাল সকাল ফায়ারপ্লেসে আগুন ধরালে, পরিচারিকা অবশ্য খুব বিরক্ত হতো। এমনই এক সকালে সদর দরজায় বেল শুনে চমকে উঠলাম!

এই সাত সকালে কোনও রোগী এসে থাকলে, ব্যাপারটা গুরুতর! এপ্রিল মাসের সেই ঝকঝকে সকালে দরজা খুলতেই, আগন্তুকের ফ্যাকাসে রং আর হাবভাব দেখে থমকে গেলাম! একজন কমবয়সি মহিলা দরজায় দাঁড়িয়ে প্রায় টলছিলেন।

'ডাঃ ওয়াটসন?' মুখের ভেল-টা তুলে ধরে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

'আমিই, ম্যাডাম!'

'ক্ষমা করবেন, আপনাকে এই সকালবেলা বিরক্ত করলাম।

আমি... আমি এসেছি...'

'শান্ত হোন। আমার কনসাল্টিং রুমে আসুন।' মেয়েটিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যেতে যেতে বললাম।

আরও কাছ থেকে ভালভাবে দেখার সুযোগও পেয়ে গেলাম। রোগী কিছু কথা বলার আগেই, ডাক্তাররা যদি সিমটম দেখে তার রোগ ধরে ফেলেন, তা হলে রোগীর বিশ্বাস অর্জন করতেও সময় লাগে না।

কনসাল্টিং রুমে পৌঁছে বললাম,'সময় হিসাবে গরমটা একটু বেশি পড়েছে। কিন্তু তাও, ঘর যদি ভালভাবে বন্ধ না থাকে, ঠাণ্ডা লেগে যেতে পারে!'

কথাটা বলা মাত্রই একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল! আমার দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকতে থাকতে আগন্তুকের

করল, আপনার কি মনে হয় ভারতীয় কিউরিওগুলো সংগ্রহ করা ছাড়া, কর্নেলের অন্যান্য অভ্যেসগুলো স্বাভাবিক ছিল?'

'প্রধানত তাই। তবুও...'

মিস্ মারে নমনীয় ভাবে শুধু মাথাটা একটু ঝোঁকালেন।

'দুটো গুলি চলার আওয়াজ পুরো বাড়িটাতে ছড়িয়ে পড়ল।' এক মুহূর্ত থেমে তিনি বলতে লাগলেন, 'আমরা জানলা দিয়ে দেখলাম—মেঝেতে দুটো কুঁকড়ানো দেহ পড়ে আছে! শেড লাগানো বাতিদানের আলোয় সেই বীভৎস ডেথ মাস্ক-এর ল্যাপিস-লাজুলি পাথরের চোখ দিয়ে ঠাণ্ডা নীল আলো বেরোচ্ছে, আমি ভয়ে আর অন্ধ বিশ্বাসে সিঁটিয়ে গেলাম।'

অসন্তুষ্ট, বিরক্ত মুখ করে, পুরনো সিঁদুর রঙের ড্রেসিং গাউনটা গায়ে জড়িয়ে, হোমস্ তার আরাম কেদারায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে বসেছিল। বলল, 'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, সামনের দেরাজের উপর তুমি চুরুটের বাক্স দেখবে। যদি মিস্ মারের কোনও আপত্তি না থাকে, তা হলে আমাকে বাক্সটা একটু দাও।'

ভদ্রমহিলা বললেন, 'মিঃ হোমস্, একজন অ্যাংলো ইন্ডিয়ান কন্যা কখনওই এতে আপত্তি করবে না।' তারপর ঠোঁট কামড়ে খানিক ইতস্তত করে বলে ফেললেন, 'মেজর আর্নশ, ক্যাপ্টেন ল্যাশার আর আমি এরপরে সেই রুদ্ধ ঘর ভেঙে ঢুকলাম। আমার সব থেকে বেশি মনে আছে কর্নেল ওয়ারবারটনের চুরুটের গন্ধ!'

এটা বলার পর তিনি কিছুক্ষণ থামলেন। শার্লক হোমস্ চুরুটের প্যাকেট হাতে নিয়ে লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে, মিস্ মারের দিকে স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকল।

'আমি আপনাকে দুঃখ দিতে চাই না। কিন্তু আপনি কী বলছেন, আপনি কি ঠিক জানেন?'

'মিঃ শার্লক হোমস্—মেয়েটি উত্তর দিলেন, 'অর্থহীন কথা বলা আমার স্বভাব নয়। তখন আমার মাথার মধ্যে যে অদ্ভুত চিন্তা খেলে গিয়েছিল, আমার সেটাও মনে আছে। যে ঘরটা এক রাশ পেতলের জিনিস, কাঠের মূর্তি এবং লাল পালিশের বাতিদান দিয়ে সাজানো, সে ঘরে চুরুটের চেয়ে ধূপের গন্ধ অনেক বেশি মানায়।'

এক মুহূর্তের জন্য হোমস্ ফায়ারপ্লেসের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়াল। খুব চিন্তামগ্ন হয়ে বলল, 'এটা হতে পারে—আরও ১৪১ টা অন্য কারণ আছে। কী হয়েছিল, সেটা আরও বিশদ ভাবে শুনতে চাই। যেমন ধরুন, আপনি জনৈক মেজর আর্নশ এবং জনৈক ক্যাপ্টেন ল্যাশারের নাম উল্লেখ করেছিলেন। এই দুজন ভদ্রলোক কি তখন ও-বাড়িতে অতিথি ছিলেন?'

'হ্যাঁ, মেজর আর্নশ বেশ কিছুদিন ধরেই বাড়িতে অতিথি হয়ে আছেন। কিন্তু ক্যাপ্টেন ল্যাশার... ক্যাপ্টেন ল্যাশার শুধু সৌজন্য বিনিময় করতে এসেছিলেন। উনি কর্নেল ওয়ারবাটন-এর ভাগ্নে। সত্যি বলতে, ওনার একমাত্র আত্মীয়! আর মেজর আর্নশ-এর চেয়ে বয়সে অনেক ছোট।'

'কিন্তু ম্যাডাম, আপনি কাল রাত্রের ঘটনা বলছিলেন যে?'

কোরা মারে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকলেন। যেন মনে মনে ভাবনাগুলোকে সাজিয়ে নিলেন। তারপরে নিচু কিন্তু উদ্বিগ্ন স্বরে বলতে থাকলেন, 'ওয়ারবারটন ইন্ডিয়াতে এলেন। এলেনার আমার সবচেয়ে প্রিয় বান্ধবী। অসাধারণ সুন্দরী। এটা আমি একটুও খারাপ ভাবে বলছি না, ও যখন কর্নেল ওয়ারবাটনের স্ত্রী হতে রাজি হল, আমরা সবাই অবাক হয়ে গিয়েছিলাম! কর্নেল ওয়ারবারটন বেশ দৃঢ় চরিত্রের স্বনামধন্য সৈনিক ছিলেন। কিন্তু আমার মনে হয় একসঙ্গে বসবাস করার জন্য তিনি খুব সহজ লোক ছিলেন না। বদমেজাজি, আর ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক সংগ্রহগুলোর ব্যাপারে ভীষণ খুঁতখুঁতে ছিলেন। যদিও মাঝে মাঝে একটু-আধটু ঝগড়াঝাঁটি হত...সত্যি বলতে, কাল রাতেই একটু ঝগড়া হয়েছিল। তবে আমি নিশ্চিত, এমন কিছু হয়নি, যার জন্য এই বীভৎস ঘটনা ঘটতে পারে!... ভারত ছাড়ার পর, আমি ওদের সঙ্গেই কেমব্রিজ টেরাস-এর এই বাড়িতে থাকতে এলাম।

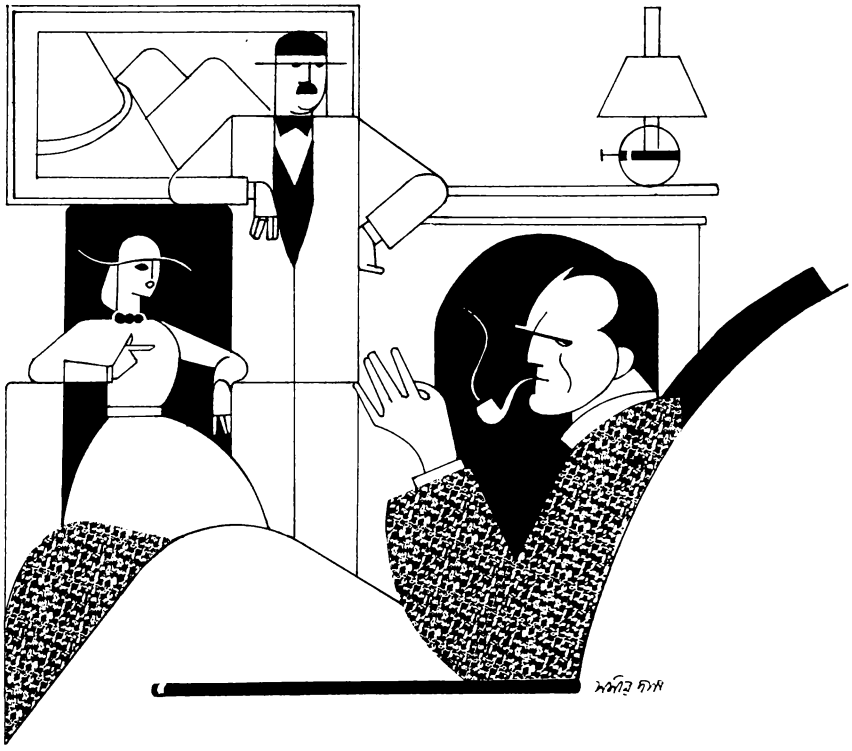

এখানেও আমরা এমনভাবে জীবনযাপন করতাম, যেন ভারতেরই কোনও একটা পাহাড়ী শহরে বাস করছি। জর্জের ভারতীয় গৃহসেবক চন্দ্রলালের সেই সাদা উর্দি পরা চেহারা! বাড়ি ভর্তি অদ্ভুত সব দেবদেবীর মূর্তি! রাতে ডিনারের পর এলেনার তার স্বামীর সঙ্গে কথা বলতে বলতে কিউরিও ঘরে ঢুকল। মেজর আর্নশ আর আমি একটা ছোট পড়ার ঘরে বসে থাকলাম। এটাকে ডেন বলা হয়।'

'এক মিনিট!' শার্লক হোমস্ কথার মাঝখানেই বলে উঠল। ও নিজের শার্টের হাতায় কী যেন একটা লিখে নিয়েছিল। 'একটু আগেই আপনি বলেছিলেন বাড়িটার সামনে, বাগানের দিকে মুখ করা দুটো ঘর আছে। যার মধ্যে একটা হল কর্নেল ওয়ারবারটনের কিউরিও ঘর। সামনের অন্য ঘরটাই ডেন?'

'না। সামনের অন্য ঘরটা খাবার ঘর। খাবার ঘরের পিছনেই ডেন। কিন্তু দুটো ঘরের মধ্যে যাতায়াতের কোনও রাস্তা নেই। তো মেজর আর্নশ সেই একঘেয়ে কথাবার্তা বলে যাচ্ছিলেন, এমন সময় জ্যাক ত্রস্ত হয়ে ঘরে ঢুকলেন।'

হোমস্ বলে উঠল, 'আমি ধরে নিচ্ছি, জ্যাক বলতে

আপনি ক্যাপ্টেন ল্যাশারকে বোঝাচ্ছিলেন?'

আমাদের অতিথি তাঁর সুন্দর চোখ দুটি মেলে তাকালেন, মিষ্টি হাসলেন। তারপরেই তাঁর মুখটা গম্ভীর হয়ে গেল।

জ্যাক বললেন, হলের মধ্যে দিয়ে আসার পথে তিনি তাঁর মামা এবং এলেনারের মধ্যে কথা কাটাকাটির শব্দ শুনেছেন। বেচারা জ্যাক কী বিরক্তই না হয়েছিলেন! বললেন, আমি সেই কেনসিনটন থেকে বুড়ো মানুষটার সঙ্গে দেখা করতে এলাম, ঠিক আছে, এখন আর আমি ওদের বিরক্ত করতে চাই না। কিন্তু কী ব্যাপারে ওঁরা সব সময় ঝগড়া করেন বলো তো?... তখন আমি প্রতিবাদ করলাম। জ্যাককে বললাম, তিনি তাঁদের প্রতি অবিচার করেছেন। তো তিনি উত্তর দিলেন, দ্যাখো, আমি ঝগড়াঝাঁটি একদম ভালবাসি না। আর আমার মামার হয়ে বলা হয়ে গেলেও আমি মনে করি, এলেনারের উচিত তার পরিবারের সঙ্গে একটু মানিয়ে চলা। তখন আমি বললাম—এলেনার আপনার মামার প্রতি খুবই অনুগত। সে যাই হোক, আমি দুঃখের সঙ্গে আরও জানাচ্ছি—যখন মেজর আর্নশ প্রস্তাব দিলেন তিনজনে মিলে 'উইস্ট' নামে তাস খেলার, তখন জ্যাক মোটেই ভদ্র ব্যবহার করেননি। তখন আমি এবং মেজর আর্নশ 'বেশিক' নামে একটা তাসের খেলা খেলতে লাগলাম।'

'মেজর আর্নশ কিংবা আপনি কি তারপর ঘর থেকে বাইরে গিয়েছিলেন?'

'হ্যাঁ। ওপর থেকে নস্যির ডিবে নিয়ে আসার ব্যাপারে মেজর কিছু একটা বলেছিলেন।'

আমার মনে হলো—অন্য পরিস্থিতি হলে হয়তো কোরা মারে হাসতেন!

'নিজের সবগুলো পকেট হাতড়াতে হাতড়াতে মেজর ছুটে বেরিয়ে গেলেন। আর দিব্যি করে বলতে লাগলেন, নস্যি ছাড়া উনি কিছুতেই ঠিক মতো বসে তাস খেলতে পারেন না!... মিঃ হোমস্, আমি তাস হাতে নিয়ে সেখানে বসেছিলাম। অপেক্ষা করতে করতে সেই নিস্তব্ধ ঘরে মনে হল—রাতের সমস্ত অজানা ভয়গুলো চারদিক থেকে আমাকে আস্তে আস্তে ঘিরে ফেলল। ডিনারের সময় এলেনারের চক্‌চকে চোখ দুটো মনে পড়ে গেল। মনে পড়ে গেল ভারতীয় গৃহসেবক চন্দ্রলালের মুখ। যমের মুখোশটা বাড়ি আসার পর থেকে চন্দ্রলাল কেমন যেন পাল্টে গেছে! ঠিক সেই মুহূর্তেই, মিঃ হোমস্, আমি রিভলবারের পর পর দুটো গুলির আওয়াজ শুনতে পেলাম।'

উত্তেজনায় কোরা মারে উঠে দাঁড়িয়ে পড়েছিলেন

'ওঃ! দয়া করে ভাববেন না, আমি ভুল শুনেছিলাম। বা এটাও মনে করবেন না—অন্য কোনও শব্দকে গুলির শব্দ বলে ভুল করেছিলাম। কিংবা জর্জের মৃত্যুর কারণ এই গুলি নয়!'

তিনি থামলেন। তারপর দীর্ঘ এক শ্বাস টেনে আবার বসে পড়লেন।

'এক মুহূর্তের জন্য স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিলাম। তারপরেই ছুটে বেরিয়ে গেলাম। মেজর আর্নশের সঙ্গে প্রায় ধাক্কাই খেলাম। আমার প্রশ্নের উত্তরে তিনি বিড় বিড় করে কিছু বললেন। জ্যাক পাশের ডাইনিং-রুম থেকে বেরিয়ে এলেন। জ্যাক আমায় বললেন, তুমি ভিতরেই থাকো কোরা। বাড়িতে হয়তো চোর ঢুকেছে। দুজনেই কিউরিও রুমের দরজার কাছে ছুটে গেলেন। ধুৎতেরি চাবি দেওয়া আছে—মেজর আর্নশ চিৎকার করে উঠলেন—'হাত লাগাও হে ছোকরা, আমরা এই দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারব।'

'তারপর?'

'জ্যাক বলল, আপনি কি চান এ রকম একটা দরজায় আমরা কামান দাগি? একটু অপেক্ষা করুন, আমি একটু ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলো চেষ্টা করে দেখি।—তো আমরা সবাই ছুটে বাইরে গেলাম।'

'আপনারা সবাই?'

'মেজর আর্নশ, জ্যাক ল্যাশার, চন্দ্রলাল আর আমি। সব থেকে কাছের যে জানলাটা, সেটা দিয়ে একটা উঁকি দিয়েই দেখা গেল—ব্রাসেল্‌স-এ তৈরি লাল কার্পেটের উপর জর্জ এবং এলেনার ওয়ারবারটন চিৎ হয়ে পড়ে আছেন। এলেনারের বুকের একটি ক্ষত থেকে তখনও রক্ত গড়িয়ে পড়ছিল!'

'আপনি জানতেন?'

'নিজের সংগ্রহগুলোর জন্য জর্জের প্রচণ্ড ভয় ছিল।' মিস্ মারে খুব সহজ ভাবে উত্তর দিলেন, 'ওই ঘরের ফায়ারপ্লেসও ইট গেঁথে বন্ধ করে দেওয়া আছে। চন্দ্রলাল ভাবলেশহীন মুখে দেওয়ালে টাঙানো সেই যমের মুখোশের কঠিন নীল চোখের দিকে তাকিয়েছিল। মেজর আর্নশের-এর পায়ের ধাক্কায় জর্জের হাতের পাশে পড়ে থাকা রিভলবারটি ছিটকে গেল। মেজর আর্নশ বললেন, 'এটা খুবই সিরিয়াস ঘটনা। আমরা বরং একজন ডাক্তারকে ডাকি।'

॥ ৩ ॥

পুরো ঘটনাটা বলা শেষ হওয়ার পর আরও খানিকক্ষণ হোমস্ আগুনের সামনে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। তার হাত খেলার ছলে ছুরি দিয়ে ফায়ারপ্লেসের ওপরে, কাঠের শেলফে আঁকিবুঁকি কাটছে। শেলফের সঙ্গে যেন এক তরফা কোনও বাক্যালাপ করে চলেছে।

'হুঁ!' হোমস্ বলল, 'এখন পরিস্থিতিটা কী?'

'বেচারা এলেনার বেসওয়াটার-এর একটা নার্সিংহোমে প্রচণ্ড আহত হয়ে শুয়ে আছে। না-ও সেরে উঠতে পারে। জর্জের দেহ মর্গে পাঠানো হয়েছে। আজকেও আমি যখন কেমব্রিজ টেরাস থেকে বেরিয়েছি, তখনও আমার মনে একটা অলীক আশা ছিল—ডাঃ ওয়াটসনকে ধরে আমি আপনার কাছ থেকে কোনও সাহায্য পাব। পুলিশের হয়ে ইন্সপেক্টর ম্যাক্‌ডোনাল্ড এসেছিলেন। কিন্তু উনি কী-বা করতে পারেন!'

'সত্যিই তো, কী-বা পারবেন?' হোমস্ প্রতিধ্বনি করল। কিন্তু সেই সঙ্গে ওর গভীরে চোখগুলো চকচক করে উঠল। তারপর ছুরিটা তুলে খামগুলোর উপর অস্ত্রের মতো আছড়ে ফেলল।

'তবুও... ইন্সপেক্টর ম্যাক্! তবুও ভাল। আজ সকালে আমি ইন্সপেক্টর লেশট্রেড বা ইন্সপেক্টর গ্রেডসনকে কিছুতেই সহ্য করতে পারতাম না। ম্যাডাম, যদি আমাদের কোট আর হ্যাট পরার সময়টুকু দেন, তাহলে আমরা একটু কেমব্রিজ টেরাসে যাবো।'

আমি প্রতিবাদ করে উঠলাম, 'হোমস্,—মিস্ মারের মনে কোনও রকম মিথ্যে আশা জাগানো কিন্তু প্রচণ্ড অন্যায় হবে।'

আমার বন্ধু আমার দিকে ঠাণ্ডা, নির্বিকার দৃষ্টিতে তাকাল।

'মাই ডিয়ার ওয়াটসন, আমি আশাও দিচ্ছি না, আবার নিরাশও করছি না। আমি শুধু তথ্যের অনুসন্ধান করব।'

আমি লক্ষ করলাম হোমস্ তার ম্যাগনিফাইন লেন্সটা পকেটে পুরল।

যাওয়ার সময়ে হোমস্ ঠোঁট কামড়ে গভীর চিন্তায় ডুবে ছিল।

এপ্রিলের সেই ঝলমলে সকালে কেমব্রিজ টেরাস ছিল নিঃস্তব্ধ, জনমানবশূণ্য। সাদা জানলা এবং সবুজ সদর দরজাওয়ালা পাথরের বাড়িটা—পাথরের দেওয়াল এবং ছোট একফালি পাথরের বাগানের পিছনে দাঁড়িয়ে ছিল।

বাড়িতে ঢোকার মুখেই, বাঁ-হাতে ফ্রেঞ্চ জানলাগুলোর পাশে সাদা উর্দি পরা, পাগড়ি বাঁধা, ভারতীয় গৃহসেবককে দেখে, আমি বেশ চমকেই উঠলাম। চন্দ্রলাল! ওদের দেশের যে কোনও মূর্তির মতোই স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে চন্দ্রলাল আমাদের দেখছিল। পরক্ষণেই সে একটা ফ্রেঞ্চ উইন্ডোর মধ্যে দিয়ে বাড়ির ভিতরে মিলিয়ে গেল!

স্পষ্টই বোঝা গেল—শার্লক হোমস্‌ও একই রকম চমকে গেছে! আমি দেখলাম, ভারতীয় গৃহসেবকের মিলিয়ে যাওয়ার দৃশ্যটা দেখতে দেখতে ফ্রককোটের নীচে তার হাত দুটো কেমন যেন শক্ত হয়ে উঠল। সদর দরজার ঠিক পাশের জানলাটা একদম অক্ষত ছিল। পাথরের বাগানের একটা ক্ষতই আমাদের

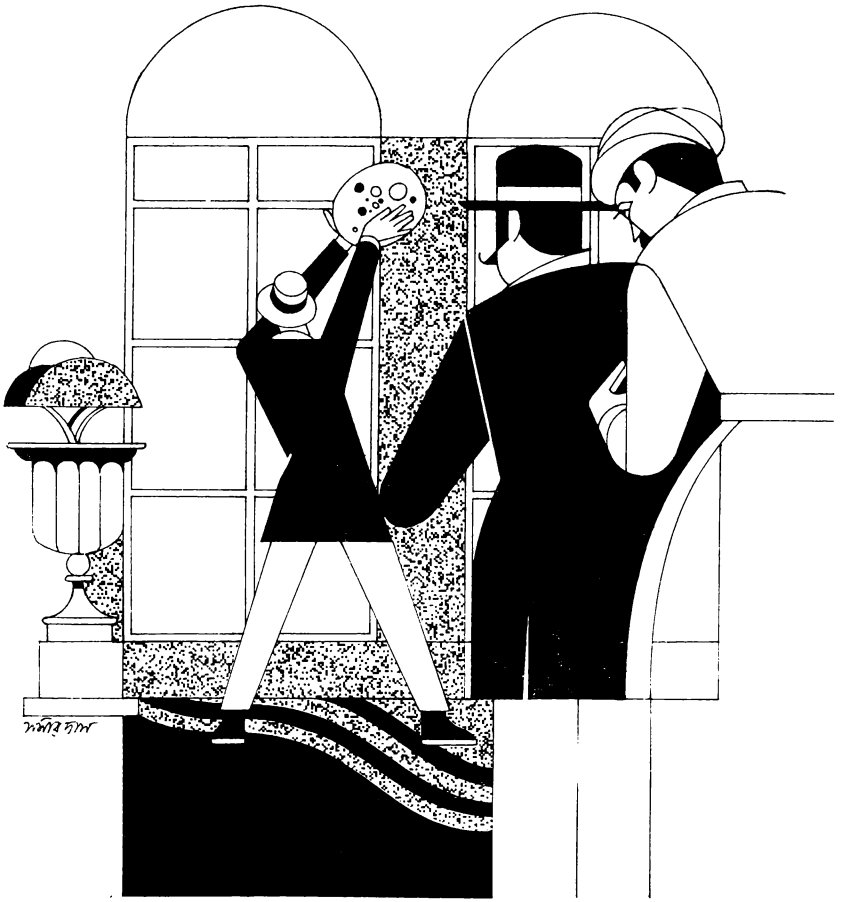

জানিয়ে দিল—কোথা থেকে একটা বড় পাথর উপড়ে নেওয়া হয়েছে। বাঁ-দিকে একটু দূরের জানলাটা একবারে চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে গেছে। এই ফাঁক দিয়েই ভারতীয় গৃহসেবক নিঃশব্দে ভিতরে ঢুকে গেছে!

হোমস্ শিস দিয়ে উঠল কিন্তু যতক্ষণ না কোরা মারে আমাদের কাছ থেকে চলে গেলেন, হোমস্ কোনও কথা বলল না।

'ওয়াটসন বলো তো, তুমি কি মিস্ মারের গল্পের মধ্যে কোনও অদ্ভুত অসংলগ্নতা লক্ষ করলে?'

'হ্যাঁ, অদ্ভুত বটে, তবে বীভৎস! কিন্তু অসংলগ্ন মোটেই না।'

'কিন্তু তুমিই তো এ ব্যাপারে প্রথম প্রতিবাদ করেছিলে!'

'মাই ডিয়ার ফ্রেন্ড, আজ সকাল থেকে কিন্তু আমি প্রতিবাদের একটা শব্দও উচ্চারণ করিনি।'

'হয়তো আজ সকালে না।' শার্লক হোমস্ বলল, 'আরে, ইন্সপেক্টর ম্যাক্! এবার দেখছি অন্য একটা সমস্যা নিয়ে দেখা হয়ে গেল!'

সেই চুরমার হওয়া জানলার মধ্যে দিয়ে ভাঙা কাচের উপর সন্তর্পণে পা ফেলতে ফেলতে, বালি রঙের চুল, মুখে খয়েরি তিল এবং চেহারায় সুস্পষ্ট পুলিশি ছাপওয়ালা একজন অফিসার বেরিয়ে এলেন।

'আরে মিঃ হোমস্, আপনি নিশ্চয় এটাকে কোনও সমস্যা বলছেন না?' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড ভুরু কুঁচকে মন্তব্য করলেন, 'যদি না এ প্রশ্ন ওঠে—কর্নেল ওয়ারবারটন ঠিক কী কারণে পাগল হয়ে গেলেন?'

'হ্যাঁ-হ্যাঁ।' হোমস্ বেশ ভদ্র ভাবেই বলল, 'আশা করি, আপনি আমাদের ঢুকতে দেবেন?'

'হ্যাঁ, আসুন।' অল্প বয়েসি স্কটিশ পুলিশ উত্তর দিলেন।

॥ ৪ ॥

আমরা একটা উঁচু সিলিংওয়ালা সরু ঘরে ঢুকলাম। ঘরে বেশ কিছু আরামদায়ক চেয়ার সাজানো। অবশ্য পরিবেশটা কোনও নিষ্ঠুর, জংলী মিউজিয়ামের। এবনি কাঠের তৈরি একটা দেরাজের উপর জানলার দিকে মুখ করে একটা অদ্ভুত বস্তু রাখা ছিল। খয়েরি রঙের, সোনা বাঁধানো মানুষের মুখের আকৃতি, কঠিন আর চকচকে নীল পাথরের দুটো বড় বড় চোখ!

'জিনিসটা বেশ সুন্দর, তাই না?' ম্যাকডোনাল্ড ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'ওই হল সেই যমের মুখোশ! এটা সবার ওপর নাকি পাহাড়ী জাদুর মতো কাজ করে। মেজর আর্নশ আর ক্যাপ্টেন ল্যাশার ডেনে বসে কথা বলে বলে, একজন আরেকজনের মাথা খারাপ করে দিচ্ছেন!'

অবাক হয়ে দেখলাম, হোমস্ সেই বীভৎস জিনিসটার দিকে দৃষ্টিপাতই করল না।

ঘরের মধ্যে ঘুরে ঘুরে বিভিন্ন কাচের বাক্স আর দেরাজগুলোর মধ্যে উঁকি মারতে মারতে হোমস্ বলল, 'আমি ধরে নিচ্ছি মিঃ ম্যাক, আপনি বাড়ির সব বাসিন্দাদের ইতিমধ্যেই জিজ্ঞাসাবাদ করে নিয়েছেন?'

'এ ছাড়া আমি তো আর কিছুই করিনি।' ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড কাতর ভাবে বললেন, 'কিন্তু ওরা আমাকে আর কী বলবেন?...এই ঘরটা তো তালা দেওয়া ছিল। একমাত্র লোক—যে নিজেকে এবং নিজের স্ত্রীকে গুলি করে অপরাধ করেছে, সে তো মারা গেছে। পুলিশের খাতায় কেসটা বন্ধ হয়ে গেছে। এখন আর কী হবে, মিঃ হোমস্?'

আমার বন্ধু হঠাৎ ঝুঁকে পড়ল।

'আরে, এটা কী?' মাটি থেকে কী একটা জিনিস কুড়িয়ে নিয়ে পরীক্ষা করতে করতে হোমস্ বলল।

'কর্নেল ওয়ারবারটনের পুড়ে যাওয়া সিগারেটের শেষটা! দেখতেই পাচ্ছেন, কার্পেটটা ওখানে পুড়ে একটা গোল গর্ত হয়ে গেছে।' ম্যাকডোলাল্ড উত্তর দিলেন।

'হ্যাঁ, ঠিক তাই।'

এই সময়ই হঠাৎ দরজাটা খুলে গেল। একজন মোটাসোটা বয়স্ক ভদ্রলোক, যাকে মেজর আর্নশ বলেই ধরে নিলাম, তিনি এলেন। তার পিছনেই কোরা মারের সঙ্গে একজন লম্বা, তীক্ষ্ণ নাক, মিলিটারি গোঁফ ও তামাটে রঙের অল্পবয়েসি ভদ্রলোক ঘরে ঢুকলেন।

'স্যর, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি মিঃ শার্লক হোমস্।' মেজর আর্নশ একটু কাঠ-কাঠ ভাবে আরম্ভ করলেন, 'আমি প্রথমেই বলে নিতে চাই, এ রকম একটা প্রাইভেট ট্র্যাজেডিতে মিস্ মারে কেন যে আপনাদের ডেকে পাঠিয়েছেন, আমি বুঝতে পারছি না!'

'অন্যরা হয়তো কারণটা বুঝতে পারছেন।' শার্লক হোমস্ শান্ত ভাবে উত্তর দিলেন, 'ক্যাপ্টেন ল্যাশার, আপনার মামা কি সব সময়ে একই ব্রান্ডের সিগার খেতেন?'

'হ্যাঁ, স্যার' সেই অল্পবয়েসি ভদ্রলোক হকচকিয়ে উঠে হোমসের দিকে এক ঝলক তাকিয়ে উত্তর দিলেন, 'ওই তো সাইড টেবিলের উপর।'

আমার বন্ধু যখন চুরুটের বাক্সটা তুলে নিল, আমরা সবাই চুপচাপ, শার্লক হোমসের দিকে তাকিয়ে থাকলাম। এক মুহূর্তের জন্য ভিতরের বস্তুগুলো দেখে নিয়ে, বাক্সটা নাকের কাছে তুলে জোরে শ্বাস নিলেন।

'ডাচ্!' হোমস্ বলল, 'মিস্ মারে, আপনার ধারণাটাই ঠিক। কর্নেল ওয়ারবারটন পাগল ছিলেন না।'

মেজর আর্নশ জোরে হাসি চাপবার চেষ্টা করলেন। আর সেই অল্পবয়েসি ভদ্রলোক তো মেজর আর্নশের চেয়ে বেশি কেতাদুরস্ত হওয়ার জন্য গোঁফে হাত বুলিয়ে, হাসি চাপার চেষ্টা করলেন।

'ভগবান সাক্ষি, আপনি আমাদের আশ্বস্ত করায় আমরা সবাই খুব শান্তি পেলাম মিঃ হোমস্।' মিস্ মারে বললেন, নিশ্চয়ই কর্নেলের চুরুটের পছন্দ থেকেই আপনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন?

'অংশত।' আমার বন্ধু গম্ভীর ভাবে উত্তর দিল, ডাঃ ওয়াটশন আপনাদের বলবেন, তামাক নিয়ে আমি বেশ কিছু পড়াশোনা করেছি। একটা লেখাও লিখেছি। এই লেখায় ১৪০টা ভিন্ন-ভিন্ন রকমের তামাকের ছাইয়ের ওপরে আমার গবেষণা নথিভুক্ত করা আছে। কর্নেল ওয়ারবারটনের চুরুটের পছন্দ অন্য এভিডেন্সগুলিকে জোরালো করছে মাত্র। কী বলো, ম্যাকডোনাল্ড?'

স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড-এর ভদ্রলোকটির কপাল ক্রমশ কুঁচকে উঠছিল। তিনি সন্দিহান দৃষ্টিতে হোমসের দিকে তাকিয়ে ছিলেন। হঠাৎ বলে উঠলেন, 'এভিডেন্স! আপনি কী বলতে চাইছেন? এটা তো সোজা ব্যাপার। একটা ঘর, ভিতর থেকে তালা দেওয়া। ভিতর থেকে খিল, ছিটকিনি, সব আটকানো। সেখানে কর্নেল আর তার স্ত্রী গুলিবিদ্ধ হয়েছেন। এটা কি আপনি অস্বীকার করেন?'

'না।'

'তা হলে মিঃ হোমস্, আমরা এখন এই ফ্যাক্টরগুলোকেই মাথায় রাখি।'

আমার বন্ধু ততক্ষণে সেই এবনি কাঠের ক্যাবিনেটের দিকে এগিয়ে গেছে, যার মাথায় বীভৎস রং-করা মুখটা বসানো ছিল। হাত দুটো পেছনে জড়ো করে, ও সেই মুখটার দিকেই মন দিয়ে কী দেখছিল!

'তাই তো!' হোমস্ উত্তর দিল, 'বন্ধ দরজার ব্যাপারে আপনার কী থিয়োরি, ইন্সপেক্টর ম্যাক?'

'সেটা এই যে—কর্নেল নিজেই, গোপনীয়তার জন্য, সেটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়েছিলেন।'

'ঠিক তাই! ঘটনাটা ঠিক ধরেছেন।'

'এতে এটাই বোঝা যাচ্ছে, পাগলামির বশেই কর্নেল ওয়ারবারটন এই জঘন্য কাজটি করে বসেছেন।' ম্যাকডোনাল্ড উত্তর দিলেন।

'দেখুন মিঃ হোমস্—'ল্যাশার বলে উঠলেন, 'আমরা সবাই জানি, আপনি আপনার বুদ্ধি দিয়ে ন্যায়ের সেবা করার জন্য সুপরিচিত। তাই আমরা সবাই মামার নাম থেকে কলঙ্ক মুছে ফেলার জন্য প্রচণ্ড আগ্রহী। কিন্তু কী আর করা, প্রমাণকে তো অস্বীকারও করা যাচ্ছে না! ভাল না লাগলেও, ইন্সপেক্টরের সঙ্গে আমরা সবাই একমত হতে বাধ্য হচ্ছি, কর্নেল ওয়ারবারটন নিজেই নিজের পাগলামির শিকার হয়েছেন!'

হোমস্ একটা হাত তুলল।

'কর্নেল ওয়ারবারটন খুব ঠাণ্ডা মাথায় খুনের শিকার হয়ে গেলেন!' হোমস্ আস্তে আস্তে বলল।

এই কথাগুলোর পরেই, ঘরটা নিস্তব্ধ হয়ে গেল। আমরা পরস্পরের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করলাম।

'ফর গড সেক, আপনি কার ঘাড়ে দোষটা চাপালেন?' মেজর আর্নশ চেঁচিয়ে উঠলেন, 'আমি আপনাকে জানিয়ে দিচ্ছি, এ-দেশে মানহানির জন্য আইনি ব্যবস্থা আছে।'

'শান্তি! শান্তি!' হোমস্ হাল্কা ভাবেই বলল, 'মেজর, আপনাকে আমার দলে টেনে খুব গোপনীয়

ভাবে জানাচ্ছি, আমার কেসটার প্রমান হল—ফ্রেঞ্চ উইন্ডো থেকে ভেঙে পড়া ওই কাঁচের টুকরোগুলো। আপনি দেখতেই পাচ্ছেন, সবগুলোকে আমি ফায়ারপ্লেসে জড়ো করেছি। যখন কাল সকালে ফিরে এসে, কাচের টুকরোগুলোকে একটা একটা করে সাজিয়ে ফেলব, তখনই আমারা কেসটাকে প্রমাণ করতে পারব। ইন্সপেক্টর ম্যাক, আমি ধরে নিচ্ছি আপনি ঝিনুকের মাংস খেতে পছন্দ করেন?'

ম্যাকডোনাল্ডের মুখটা লাল হয়ে উঠল।

'মিঃ হোমস্, আমি আপনাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি, পছন্দও করি।' ইন্সপেক্টর কাটা কাটা ভাবে বললেন, কিন্তু কখনও কখনও মানুষকেই ঠিক এ রকম ভাবে...এরসঙ্গে ঝিনুকের মাংসের সম্বন্ধটা কী, বলুন তো?'

'মানে, ঝিনুকের মাংস খেতে হলে, আপনি নিশ্চয়ই আপনার হাতের কাছে রাখা কাঁটা দিয়েই মাংসটা খাবেন। যদি সেটা না করে আপনি পাশে বসা ভদ্রলোকটির প্লেটের কাছে রাখা কাঁটাটি হাত বাড়িয়ে তুলে নেন, তা হলে যে কোনও তীক্ষ্ণ দৃষ্টিওয়ালা মানুষের কাছেই, সেটা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠবে। আপনাকে এটা নিয়ে চিন্তা করতে বলছি।'

ম্যাকডোনাল্ড বেশ দীর্ঘ সময় ধরে আমার বন্ধুর দিকে স্থির তাকিয়ে থাকলেন।

'হ্যাঁ, মিঃ হোমস্।' খানিক পরে ম্যাক বললেন, 'খুবই ইন্টারেস্টিং। আপনার সংকেত পেলে, আমি খুব খুশি হব।'

'আমি আপনাকে অ্যাডভাইস করব—আপনি জানলার ভাঙা কাচের জায়গায় তক্তা মেরে দিন।'

হোমস্ উত্তর দিল, 'তাছাড়াও কাল সকালে যতক্ষণ-না আমরা সবাই ব্যাপারটা দেখছি, কোনও কিছু যেন নাড়াচাড়া করা না হয়। এসো, ওয়াটসন। একটা বেজে গেছে, হোটেলে গিয়ে কিছু খেয়ে নেওয়া যাক।'

॥ ৫ ॥

দুপুরবেলায় ডাক্তারিতে ব্যস্ত হয়ে পড়লাম। সন্ধের আগে বেকার স্ট্রিট যাওয়া হয়ে উঠল না। মিসেস হার্ডসন দরজা খুলে দিলেন। আমি সিঁড়ির মাথায় দাঁড়িয়ে খেয়ে যাব কি না বলছিলাম। বাড়ির ভিতর থেকে জোরে একটা গুলির আওয়াজ পাওয়া গেল। মিসেস হার্ডসন সিঁড়ির রেলিংটা আঁকড়ে ধরলেন।

'দেখুন স্যর, উনি আবার এটা আরম্ভ করেছেন!' প্রায় কাঁদো কাঁদো হয়ে মিসেস হার্ডসন বললেন, 'সেই যাচ্ছেতাই গুলির আওয়াজ! ছ'মাসও হয়নি, ম্যান্টেল পিস্-এর সব চকলা উঠিয়ে দিয়েছেন। মিঃ হোমস্ অবশ্য বলেছেন সবই নাকি ন্যায়ের জন্য। ওঃ! ডাঃ ওয়াটশন, আপনি তাড়াতাড়ি উপরে যান। না হলে এবার আরও কোনও দামি জিনিস যাবে!'

কোনও রকমে ভদ্রমহিলাকে একটা সান্ত্বনা বাক্য ছুঁড়ে দিয়ে, দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠলাম। আমাদের পুরনো বসার ঘরের দরজা খুলে ঢোকা মাত্রই, দ্বিতীয় গুলির আওয়াজটা পাওয়া গেল। একরাশ কালো বারুদের ধোঁয়ার মধ্যে শার্লক হোমস্‌কে এক ঝলক দেখতে পেলাম। পরনে ড্রেসিংগাউন। ঠোঁটে একটা চুরুট, ডান হাতে ধোঁয়া ওঠা রিভলবার নিয়ে, শার্লক নিজের ইজিচেয়ারে আধশোয়া হয়েছিল।

'আহ ওয়াটসন!' হোমস্ তৃপ্ত ভাবে বলল।

'হায় ভগবান, হোমস্, এটা সত্যিই অসহ্য' আমি বলে উঠলাম, 'এখানে তো পুরো রাইফেল রেঞ্জ-এর গন্ধ বেরোচ্ছে। তুমি ক্ষতির ব্যাপারে কেয়ার না করলেও, মিসেস হার্ডসনের কথা ভাব।'

আমি জানলাগুলো খুলে দিলাম। নিশ্চিত হলাম যে রাস্তার ঘোড়ার গাড়ির আওয়াজে গুলির আওয়াজ চাপা পড়ে গেছে।

একটু কঠিন স্বরেই বললাম, 'পরিবেশটা ভীষণ অস্বাস্থ্যকর হয়ে উঠেছে!'

হোমস্ হাত বাড়িয়ে রিভলবারটা ম্যান্টেল পিসের উপর তুলে রাখল।

'সত্যি ওয়াটসন, আমি ভেবে পাই না—তোমায় ছাড়া আমি কী করতাম!' হোমস্ মন্তব্য করল, 'আগেও লক্ষ করেছি—মানুষের শিক্ষিত মনকে ভালো কাজে লাগানোর জন্য, একটা পরশ পাথর তোমার কাছে আছে।'

'হ্যাঁ, আমি জানি। সেটা এমন একটা পরশ পাথর—তোমায় সাহায্য করার জন্য, সেটা এর আগে তিন-তিনবার আইন লঙঘন করেছে।' আমি বেশ তিক্ত ভাবে উত্তর দিলাম।

'মাই ডিয়ার ফেলো!' হোমসের বলার ভঙ্গিতেই এমন একটা কিছু ছিল, আমার মনের সব ক্ষোভ নিমেষেই উবে গেল।

চেয়ারে বসতে বসতে বললাম, 'অনেকদিন তোমায় চুরুট খেতে দেখিনি!'

'সবটাই মুডের ব্যাপার ওয়াটসন। অবশ্য এটা আমি কর্নেল ওয়ারবারটনের স্টক থেকে একটা চুরুট সরিয়ে নিয়েছি!' ম্যান্টেল পিসে রাখা ঘড়ির দিকে তাকিয়ে হোমস্ থেমে গেল। তারপর বলল, 'আমাদের হাতে আর একঘণ্টা সময় আছে। তা হলে এ বার আমরা মানুষের শয়তানির সমস্যাগুলো নিয়ে আলোচনা করি। এটা এমন শক্তি, যা নিকৃষ্টতম মানুষের মধ্যেও বিদ্যমান। ওয়াটসন, স্টাডি ভেরিয়াস-টা দাও। তোমার পিছনের কোনায় রাখা আছে।'

তখন প্রায় আটটা বাজে। সবেমাত্র আলো জ্বালিয়েছি, এমন সময় দরজায় নক্ করে, ইন্সপেক্টর ম্যাকডোনাল্ড হুড়মুড় করে ঘরে ঢুকলেন।

'মিঃ হোমস্, আমি আপনার মেসেজ পেয়েছি। আপনার কথা মতোই সব ব্যবস্থা করা হয়েছে। সামনের বাগানে রাত বারোটার সময় একজন কনস্টেবল থাকবে, ফ্রেঞ্চ উইন্ডোগুলোর ব্যাপারে

চিন্তা করবেন না। বাড়ির লোকজনের ঘুম না ভাঙিয়ে আমরা ভিতরে ঢুকে পড়তে পারব।'

হোমস্ নিজের আঙুলগুলিকে ঘষতে লাগল।

'অসাধারণ! অসাধারণ! চটপট নির্দেশ পালন করার ক্ষমতাই আপনাকে অনেক দূর এগিয়ে যেতে সাহায্য করবে। মিসেস হার্ডসন আমাদের এখানে কিছু খাবার দিয়ে যাবেন, আমার মনে হয়—মাঝরাত হওয়ার আগেই আমরা নিজেদের পজিশন নিয়ে নিলে, মারাত্মক ভুল হয়ে যাবে। মিঃ ম্যাক, আপনি চেয়ারটা টেনে এনে তামাকটা একবার টেস্ট করে দেখুন। ওয়াটসন আপনাকে এর একটা বিশেষত্বর কথা বলবে'।

সন্ধেটা বেশ ভালভাবেই কাটল। হোমস্ বেশ ভালো মুডে ছিল। স্কটল্যান্ড ইয়ার্ডের ইন্সপেক্টরের মুখে টাকা-জালিয়াতদের গল্প মন দিয়ে শুনে গেল। তারা নাকি ফ্রেঞ্চ কোষাগারকেই প্রায় উঠিয়ে দিয়েছিল। তারপরে হোমস্ নিজেই সেই স্কটিশ ভদ্রলোককে পাহাড়ী জাতিগুলোর উন্নতির ক্ষেত্রে, রিউনিক গল্পগুলোর সম্ভাব্য প্রভাব নিয়ে এক ইন্টারেস্টিং থিয়োরি শোনাল। ঘড়িতে বারোটা বাজার শব্দে, আমরা টান টান হয়ে উঠলাম।

হোমস্ নিজের ডেস্কের কাছে উঠে গেল। ড্রয়ার খুলে একটা পিস্তল বার করল। তখন রিডিং-ল্যাম্পের সবুজ আলোয় তার মুখে আশ্চর্য গভীরতা লক্ষ করলাম।

'ওয়াটসন, এটা তোমার পকেটে ঢুকিয়ে নাও। আমার মনে হয় লোকটা ভায়োল্যান্ট হয়ে উঠতে পারে। মিঃ ম্যাক, মিসেস হার্ডসন এক ঘন্টা আগেই শুয়ে পড়েছেন। আপনি যদি তৈরি থাকেন, আমরা নীচে নেমে, এক্কাগাড়ি ডাকতে পারি।'

ছোট ছোট গলির মধ্যে দিয়ে কিছুক্ষণের মধ্যেই আমরা এডওয়ার রোডে পৌঁছে গেলাম। হোমসের ইশারায় কোচোয়ান এক পাশে গাড়ি দাঁড় করাল। আমরা তাড়াতাড়ি কেমব্রিজ টেরাসের গেটে ঢুকে পড়লাম।

ম্যাকডোনাল্ড জানলায় বসানো তক্তাগুলোর দিকে ইশারা করলেন।

'এগুলো এক দিকে আলগা করা আছে' ম্যাক ফিস্‌ফিস্ করে বললেন, 'কিন্তু সাবধানে চলুন।'

একটা অল্প মচ্‌মচ্ শব্দ হওয়ার পরেই, আমরা তক্তাগুলোর পাশ দিয়ে কর্নেল ওয়ারবারটনের কিউরিও রুমে, অন্ধকারে ঢুকে পড়লাম।

হোমস্ নিজের পকেট থেকে একটা ঢাকা দেওয়া লণ্ঠন বার করল। তার মৃদু আলোয় হাতড়াতে হাতড়াতে আমরা ঘরের এক কোনায় রাখা একটা কাউচের কাছে এলাম।

'এতেই হবে।' আমার বন্ধু ফিস্‌ফিস্ করে বলল, 'বিশ্রামের জন্য আমরা এর থেকেও খারাপ জায়গা পেতে পারতাম। তা-ছাড়া আমাদের দরকার মতো এটা ফায়ারপ্লেসের বেশ কাছাকাছি আছে।'

॥ ৬ ॥

নিশুতি রাত। আমরাও পাহারা দিতে দিতে খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম। রাত আরও একটু বাড়ল, রাস্তা দিয়ে একটা এক্কাগাড়ি চলে গেল। আস্তে আস্তে তাদের ঘোড়ার খুরের খট্‌খট্ মিলিয়ে গেল। প্রায় এক ঘণ্টা কিংবা তারও পরে একটা দমকল এডওয়ার রোড দিয়ে প্রচণ্ড জোরে ঘণ্টা বাজিয়ে ছুটে যেতে, ঘোড়াগুলোর দুরন্ত ক্ষুরের শব্দ আর সহিসের চাবুকের হিস্‌হিস্ শব্দ শোনা গেল। অন্য প্রান্তে শুধু বিশাল গ্র্যান্ডফাদার ঘড়ির টিক্‌টিক্ ছাড়া ঘরটা সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ।

প্রাচীন পাশ্চাত্য জাদুঘরের সুন্দর গন্ধে পরিবেশটা ভারী হয়ে ছিল, আর আস্তে আস্তে ক্লান্তিতে অবশ হয়ে পড়েছিলাম। তাই নিজের স্নায়ুগুলোকে প্রচণ্ড মন দিয়ে জাগিয়ে রাখার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিলাম।

সম্পূর্ণ অন্ধকার ঘর। কিন্তু আস্তে আস্তে সেই অন্ধকারে চোখটা অভ্যস্ত হয়ে গেল। তখন তক্তা না

লাগানো ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকে আসা রাস্তার ঝাপসা আলোয় এমন একটা জিনিস দেখলাম, যে বুকের রক্ত হিম হয়ে গেল! একটা মুখ—অস্পষ্ট, ঝাপসা। কিন্তু দুঃস্বপ্নের মতো ভয়ঙ্কর। সেই ঝাপ্সা আলোয় ঘরের কোণ থেকে আমার দিকে চোখ পাকাচ্ছিল। আমি চাইনি, তবু চমকে উঠেছিলাম!

হোমস্ আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিল।

'সেই মুখোসটা!' ফিস্ ফিস্ করে হোমস্ বলল, 'কিন্তু আমাদের ট্রফি কম ইম্প্রেসিভ হলেও, অনেক বেশি ডেঞ্জারাস!'

আমি হেলান দিয়ে আরাম করার চেষ্টা করলাম। কিন্তু রোমহর্ষক মুখোসটা আমার চিন্তা-ভাবনা অন্য দিকে চালিত করে দিল। কর্নেল ওয়ারবারটনের গৃহসেবক চন্দ্রলালের শয়তানি ভরা চেহারাটা মনে পড়ে গেল। চন্দ্রলালের উপর সেই যমের মুখোশের ঠিক কী প্রভাব হয়েছিল, সে-ব্যাপারে মিস্ মারের ঠিক বর্ণনাটা মনে করার চেষ্টা করতে লাগলাম।

খানিকক্ষণ সব চুপচাপ। একটু পরেই ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ঢুকে আসা আবছা আলোর সামনে দিয়ে একটা ঝুঁকে-পড়া মানুষের মূর্তি চট করে আমার কাছেই অন্ধকার জায়গাটায় মিলিয়ে গেল। কার্পেট পাতা থাকায় তার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল না।

মনে হল, তার পরণে উঁচু কলারওয়ালা জামা আর তার অল্প উঁচু করা হাতের মধ্যে, একটা সরু লম্বা চকচকে কিছু ধরা ছিল। মুহূর্তের মধ্যে ফায়ার প্লেসের সামনে একটা আলোর রশ্মি দেখা গেল, যেন লণ্ঠনের ঢাকনাটা খুলে দেওয়া হল। কাচের একটা মৃদু ঠন্ঠন্ আওয়াজ ভেসে এল।

উঠে দাঁড়াতে যাচ্ছিলাম।

'কে?'

একটা চাপা চিৎকার শোনা গেল। তার পরেই প্রচণ্ড ধস্তাধস্তির আওয়াজ!

'ওয়াটসন! ওয়াটসন!'

গোঙানির আওয়াজের মধ্যে হোমসের গলা চিনতে পেরে, ভয় পেয়ে গেলাম। এগোতে গিয়ে হঠাৎ দেখতে পেলাম ধস্তাধস্তির দৃশ্য! ঝাঁপিয়ে পড়লাম।

লোহার মতো কঠিন একটা হাত আমার গলাটা টিপে ধরল। আধো অন্ধকারে আক্রমণকারীর মাথা এক হাত দিয়ে পিছনে ঠেলার চেষ্টা করতেই, জংলী নেকড়ের মতো সে আমার হাতে দাঁত বসিয়ে দিল। লোকটার গায়ে পাগলের চেয়েও বেশি শক্তি ছিল। ম্যাকডোনাল্ড একটা গ্যাসবাতি জ্বালিয়ে আমাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন। এ বার আমরা আক্রমণকারীকে সহজেই কাবু করে ফেললাম।

হোমস্ ক্লান্ত, রক্তশূন্য মুখ নিয়ে দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়েছিল। তার কাঁধে আক্রমণকারী ফায়ারপ্লেস খোঁচাবার ভারী পেতলের পোকার দিয়ে আঘাত করেছিল। সেখানেই হোমস্ বলল, 'কর্নেল ওয়ারবারটনের খুন এবং তাঁর স্ত্রীকে খুন করার চেষ্টার দায়ে আপনি এঁকে গ্রেফতার করতে পারেন।'

ম্যাকডোনাল্ড আমাদের আক্রমণকারীর মুখের ঢাকা খুলে দিলেন। এক মুহূর্ত তাকিয়ে থাকার পর, আমার মুখ দিয়ে একটা অস্পষ্ট আওয়াজ বেরিয়ে এল। কী নির্মম চোখ আর কঠিন মুখভঙ্গি! প্রথম এক মুহূর্তে তার মধ্যে আমি ক্যাপ্টেন জ্যাক ল্যাশারের সুন্দর চেহারার কোনও মিলই খুঁজে পাইনি!

॥ ৭ ॥

আমরা যখন বেকার স্ট্রিটে ফিরে এলাম, ঘরের জানলা দিয়ে তখন ভোরের প্রথম আলো এসে ঢুকছে।

হোমস্ চেয়ারে হেলান দেওয়ার সময়ে দেখলাম আস্তে আস্তে ওর মুখের ফ্যাকাশে ভাবটা কেটে যাচ্ছে।

'সত্যিই ওয়াটসন, আমি তোমার কাছে ক্ষমাপ্রার্থী।' হোমস্ বলল, 'ক্যাপ্টেন জ্যাক সত্যিই সাঙ্ঘাতিক লোক। তোমার যে হাতটা কামড়ে দিয়েছেন, সেটা কেমন আছে?'

'একটু ব্যাথা আছে।' আমি স্বীকার করলাম,'আইডিন আর ব্যান্ডেজে ঠিক হয়ে যাবে

আমি কিন্তু তোমার কাঁধের ব্যাপারে অনেক বেশি চিন্তিত। কারণ পোকার দিয়ে তোমায় খুব বিশ্রী ভাবে আঘাত করেছে। সেটা দেখতে দাও।'

'পরে হবে, পরে হবে, ওয়াটসন। এটা অল্প আঘাত।' একটু অধৈর্য হয়ে হোমস্ উত্তর দিল, 'তবে এখন স্বীকার করছি, রাতে আমার মাঝে মাঝে সন্দেহ হয়েছে যে লোকটা হয়তো আমাদের ফাঁদে পা-ই দেবে না।'

'ফাঁদ?'

'হ্যাঁ টোপ ফেলা ফাঁদ ওয়াটসন! সে যদি আমার টোপটা না গিলত, তা হলে ক্যাপ্টেন ল্যাশারকে ধরা আমাদের পক্ষে খুবই কঠিন হত। বুদ্ধির চেয়ে খুনীর যে ভয় বেশি হয়, এটা ধরে নিয়েই একটা চান্স নিলাম। আর হলও তাই!'

'সত্যি, আমি এখনও বুঝতে পারছি না, তুমি কেমন করে এই কেসের জটটা ছাড়ালে!'

হোমস্ নিজের চেয়ারে হেলান দিয়ে বসে, আঙুলের ডগাগুলোকে জড়ো করল।

'হে বন্ধু, সমস্যাটা খুব কঠিন ছিল না। ক্লু-গুলো সব সামনেই ছিল। কিন্তু খুনীকে নিজেই কোনও-না-কোনও ভাবে নিজের অপরাধটা স্বীকার করে নিতে হবে, এটাই ছিল সূক্ষ্মতা! যার বিবেচনা করার প্রশিক্ষণ আছে, তার কাছে সারকামস্ট্যানশিয়াল এভিডেন্সই যথেষ্ট।'

'আমি তো কিছু লক্ষ করলাম না!'

'লক্ষ সবই করেছ, কিন্তু বিবেচনা করোনি। মিস্ মারে যখন ঘটনাটা বলছিলেন, তিনি বলেছিলেন—কিউরিও রুমের দরজা বন্ধ ছিল, কিন্তু জানলার পর্দা টানা ছিল না। লক্ষ করো ওয়াটসন, পর্দা টানা ছিল না। তাও নীচের তলায় রাস্তার ওপরের ঘর। এটা অদ্ভুত ঘটনা। তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে, মিস্ মারেকে থামিয়ে আমি কর্নেল ওয়ারবারটনের অভ্যেসগুলোর কথা জিজ্ঞেস করেছিলাম। ঘটনাগুলো থেকে আমার মনে হয়েছিল—কর্নেল ওয়ারবারটন নিশ্চয়ই কার জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। তিনি বা সাক্ষাৎকারী চেয়েছিলেন—চুপিসারে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়েই দেখা হোক। এই বয়স্ক সৈনিকটি সদ্য একজন সুন্দরী এবং যুবতী মহিলাকে বিয়ে করায়, কোনও মহিলার কথা আমি মাথা থেকে সরিয়ে দিয়েছিলাম। আমার থিয়োরি যদি ঠিক হয়, তা হলে আগন্তুক এমন কোনও লোক, যার সঙ্গে কর্নেল ওয়ারবারটনের নিভৃত সাক্ষাতকার পরিবারের অন্য একজন সদস্যের পছন্দ নয়। তাই এ ভাবে ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে কর্নেলের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা।'

'কিন্তু সেগুলো তো বন্ধ ছিল।'

'স্বাভাবিক, মিস্ মারে বলেছিলেন—নৈশভোজের ঠিক পরেই মিসেস ওয়ারবারটন তার স্বামীর সঙ্গে কিউরিও রুমে ঢুকেছিলেন, আর তাদের মধ্যে কথা কাটাকাটি হয়েছিল। আমার মনে হয়েছিল—কর্নেল যদি কারো আসার অপেক্ষায় থাকেন, তা হলে উনি জানলার পর্দাগুলো সরিয়ে রাখবেন। যাতে আগন্তুক দেখতে পান যে তিনি ঘরে একলা নেই। প্রথমে অবশ্য এই সবই আমার ধারণা ছিল, যেগুলো হয়তো সত্যের সঙ্গে মিলে যেতেও পারত।'

'আর সেই রহস্যময় আগন্তুকের পরিচয়?'

'আবার দুয়ে দুয়ে চার, ওয়াটসন। আমরা জানতাম— মিসেস ওয়ারবারটন তার স্বামীর ভাগ্নেকে অপছন্দ করতেন। মিস্ মারের কাছে ঘটনাটা শুনতে শুনতে প্রথমেই আমার যে কথাগুলো মনে হয়েছিল, সেগুলোই বলছি। আমি এ ব্যাপারে কিছুই করতে পারতাম না। কিন্তু কথার শেষের দিকে একটা তথ্য আমার সন্দেহকে নিশ্চিত ভাবে পাল্টে দিল। বুঝলাম, আমরা একটা ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিত খুনের সামনে দাঁড়িয়ে আছি!'

'আমার মনে পড়ছে না ...'

'কিন্তু তুমি সেটা ধরিয়ে দিয়েছিলে, ওয়াটসন। যখন তুমি 'অসহ্য' শব্দটা ব্যবহার করেছিলে।'

'ওহ্ হোমস্!' আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, 'তা হলে কর্নেলের চুরুটের গন্ধ সম্বন্ধে মিস্ মারের সেই মন্তব্য ...'

'একটা ঘরে, যেখানে এক্ষুনি দুটো গুলি চলেছে, সেখানে প্রচণ্ড বারুদের গন্ধ বেরোবে। আমি তখনই

জানতাম— কিউরিও রুমের ভেতরে কোনও গুলি ছোড়া হয়নি।'

'কিন্তু গুলির আওয়াজ তো গোটা বাড়ির লোকেই শুনেছে।'

'বন্ধ জানলার বাইরে থেকে গুলি করা হয়েছে। যেহেতু খুনীর টিপল অত্যন্ত ভালো, তাই মিলিটারির লোক হওয়া তার পক্ষে স্বাভাবিক। রুদ্ধ ঘরের রোমাঞ্চটা ভেদ করার জন্য আমার একটা কাজ করার ছিল। তোমার মুখেই উত্তর পেয়ে গেলাম। কর্নেলের চুরুট ধরিয়ে, নীচে তোমার আওয়াজ পাওয়া অবধি অপেক্ষা করলাম। তারপর কর্নেল যে রিভলবারের গুলিতে মারা গেছেন, ঠিক সে রকমই একটা রিভলবার থেকে দুটো গুলি ছুড়লাম।'

'কিন্তু সব ক্ষেত্রেই বারুদের গুঁড়ো তো থাকা উচিত।' আমি চিন্তিত হয়ে বললাম।

'সব ক্ষেত্রে নয়। গুলির বারুদ খুবই মজার ব্যাপার। বারুদের পোড়া দাগ না থাকা কিছুই প্রমাণ করে না। সিগারের গন্ধটা অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তোমার কনফারমেশন আমায় যথেষ্ট সাহায্য করলেও, ওই বাড়িতে গিয়েই পুরো ব্যাপারটা আমার মাথায় খেলে গেল।'

'কিন্তু তুমি সেই ভারতীয় গৃহসেবককে দেখে, যথেষ্ট চমকে উঠেছিলে!' আমি না বলে থাকতে পারলাম না, কারণ হোমসের গলায় একটা আত্মপ্রসাদের সুর লক্ষ্য করছিলাম।

'না, ওয়াটসন। ভাঙা জানলাটা দিয়ে তাকে ভেতরে চলে যেতে দেখে, আমি চমকে উঠেছিলাম।'

'কিন্তু মিস্ মারে তো আমাদের বলেছিলেন—ঘরে ঢোকার জন্য ক্যাপ্টেন ল্যাশার জানলার কাচটা ভেঙেছিলেন।'

'একজন রাজমিস্ত্রির কাছে যেমন ইট আর মশলা, ঠিক তেমনই গুরুত্বপূর্ণ এই তথ্যটা। একজন বিচক্ষণ ব্যক্তির কাছে বলার সময়ে ভদ্রমহিলা সেটা বাদ দিয়ে দেবেন, এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। মনে করে দ্যাখো, তিনি বলেছিলেন-যে ক্যাপ্টেন ল্যাশার বাড়ি থেকে ছুটে বেরিয়ে গিয়ে, ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে উঁকি মেরেছিলেন। তারপরে রক গার্ডেন থেকে পাথর তুলে নিয়ে জানলার কাচ ভেঙে ঘরে ঢুকেছিলেন।'

'ঠিক তাই।'

'আমি চমকে উঠেছিলাম, কারণ সেই ভারতীয় লোকটিকে চুরমার হয়ে যাওয়া দূরের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো দিয়ে ভেতরে ঢুকে যেতে দেখেছিলাম। যখন কিনা সদর দরজার পাশের ফ্রেঞ্চ উইন্ডোটা অক্ষত অবস্থায় ছিল। বাড়ির দিকে এগিয়ে যেতে যেতে আমি প্রথম উইন্ডোটার ঠিক তলাতেই বাগানের মধ্যে একটি গর্ত দেখেছিলাম। যেখান থেকে ক্যাপ্টেন ল্যাশার পাথর তুলে নিয়েছিলেন। দ্বিতীয় কাচটারই নিজস্ব কোনও কাহিনী না থাকলে, কেন উনি ছুটে গিয়ে দ্বিতীয় জানলার কাচটা ভাঙলেন? সে জন্যই ম্যাকডোনাল্ডকে ঝিনুক এবং কাছাকাছি রাখা কাঁটা-চামচের কথা বলে ব্যাপারটা বোঝাতে পেরেছিলাম। যখন আমি কর্নেল ওয়ারবারটনের সিগার-বাক্সটা শুঁকলাম, তখনই আমার অনুসন্ধানের প্রথম পর্ব শেষ হয়ে গেল। ওগুলো ডাচ্ সিগার ছিল। সিগারের মধ্যে সবচেয়ে মৃদু গন্ধ।'

আমি বললাম, 'এ ব্যাপারটা আমার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেছে। কিন্তু সকলের সামনে একটা কথা বলতে পারিনি—জানলার ভাঙা কাচ জোড়া দেওয়ার প্ল্যান করে, তুমি নিজেই সমস্ত প্রমাণ নষ্ট হওয়ার ঝুঁকি নিয়ে ফেলছ!'

হোমস্ পার্সিয়ান চটি পরে পাইপে তামাক ভরতে লাগল।

'প্রিয় বন্ধু, এই ভাঙা কাচের টুকরোগুলোকে জোড়া লাগিয়ে, গুলির ফুটো দুটো প্রমাণ করা আমার পক্ষে সত্যিই অসম্ভব ছিল। না, এটা পুরোটাই একটা ভাঁওতা! কিন্তু কেউ যদি সেই ভাঙা কাচের টুকরোগুলোকে সরিয়ে ফেলার চেষ্টা করে, তবে সে-ই কর্নেল ওয়ারবারটনের খুনী। আমি ইচ্ছে করেই আমার হাতের তাসগুলো দেখিয়েছিলাম। তার পরের ঘটনা তো তুমি জানোই। আমাদের খুনীটি তার নকল চাবি দিয়ে ঘরে ঢুকে এসেছিল। একটা পোকারকে নিজের সঙ্গে অস্ত্র হিসাবে এনেছিল। আমার তো মনে হয় না আর কিছু বলার আছে।'

'কিন্তু খুনের কারণটা কী, হোমস্?'

'বেশি দূর চিন্তা করার দরকার নেই, ওয়াটসন। আমাদের তো বলা হয়েছিল—কর্নেল ওয়ারবারটনের বিয়ের আগে অবধি ল্যাশারই তাঁর একমাত্র আত্মীয় ছিলেন। তার মানে ধরে নিতে পারি, তাঁর একমাত্র উত্তরাধিকারী ছিলেন। মিস্ মারের কথা মতো মিসেস ওয়ারবারটন ল্যাশারকে অপছন্দ করতেন, ওর ব্যয়বহুল জীবনধারার জন্য। অতএব কর্নেলের স্ত্রীর প্রভাব ক্যাপ্টেন জ্যাকের স্বার্থের পক্ষে মারাত্মক হয়ে উঠতে পারে।'

'ঠিক।'

'সেই রাত্রে খুনী খোলাখুলি ভাবে বাড়িতে এসেছিল। মিস্ মারে এবং মেজর আর্নশের সঙ্গে কথা বলার পর খাবার ঘরে ঢুকে ছিল। আসলে কিন্তু সে খাবার ঘরের জানলা দিয়ে সামনের বাগানে নেমে, কিউরিও রুমের ফ্রেঞ্চ উইন্ডো অবধি হেঁটে গিয়ে, জানলার কাচের মধ্যে দিয়ে কর্নেল ওয়ারবারটন এবং তার স্ত্রীকে গুলি করেছিল।

'বেশ।'

'সেখান থেকে আবার সেই একই পথে ফিরে আসতে, সাইন বোর্ড থেকে একটা ডি-ক্যান্টার তুলে নিতে এবং ছুট্টে হলঘরে বেরিয়ে যেতে তার কয়েক সেকেন্ডের বেশি সময় লাগার কথা নয়। খুনী ব্যাপারটা বেশ চটপট করেছিল। কারণ, তোমার নিশ্চয়ই মনে আছে— অন্যদের থেকে কয়েক মুহূর্ত পরেই সে হলঘরে বেরিয়ে আসতে পেরেছিল। কর্নেল ওয়ারবারটনের পাগলামির রটনা পুরোপুরি বিশ্বাসযোগ্য করতে ওর দরকার ছিল সেই গুলির ফুটোগুলোকে নিশ্চিহ্ন করা, আর ঘরে ঢুকে মৃতদেহের পাশে রিভলবারটা ফেলে দেওয়া।'

'মিসেস ওয়ারবারটন যদি তখন সেখানে না থাকতেন, আর ল্যাশার যদি তার মামার সঙ্গে দেখা করতে পারত, তা হলে, কী হত?' আমি জিজ্ঞেস করলাম।

'আঃ! ওয়াটসন, আমরা শুধুই আন্দাজ করতে পারি। তবে আগেভাগেই হাতিয়ার নিয়ে আসাতে, আমরা খারাপটাই ধরে নিচ্ছি। আমার কোনও সন্দেহ নেই মামলাটা কোর্টে উঠলে দেখা যাবে ল্যাশার খুবই আর্থিক কষ্টে ছিল। আমরা জানি, ল্যাশার পথের কাঁটা যে কোনও উপায়ে সরিয়ে দিতে দ্বিধা করবে না! ওয়েল মাই ডিয়ার ফেলো, তোমার বাড়ি যাওয়ার সময় হয়ে গেছে।'

'কিন্তু হোমস্, তোমার কাঁধ?' আমি বলে উঠলাম। 'তুমি বিশ্রাম নেওয়ার আগে আমি একটু মলম লাগিয়ে দিই?'

'আহা ওয়াটসন—' আমার বন্ধু উত্তর দিলেন, 'তোমার এতদিনে জানা উচিত, মানুষের মনই শরীরের উপর রাজত্ব করে।'

ছবি : সমীর দাস

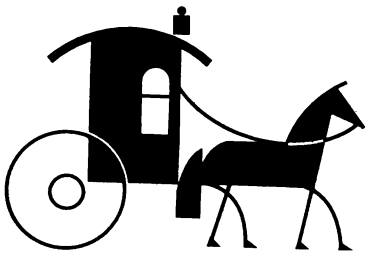

শানিদার গুহার রহস্য

দিলীপ মজুমদার

শানিদার গুহা। বাগদাদ থেকে ২৫০ মাইল দূরে উত্তর ইরাকের একটি প্রাকৃতিক গুহা এটি। সমুদ্রতল থেকে এই গুহা ২৫০০ ফুট উঁচু। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে গুহার মুখ যথাক্রমে ২৬ ফুট ও ৮২ ফুট। গুহাটি দক্ষিণমুখী। তাই উত্তরের ঠাণ্ডা, কনকনে বাতাস এর ভেতর ঢুকতে পারে না। গুহার অদূরে আছে অরণ্য, খুব কাছাকাছি আছে ঝর্ণা। তাই গুহার অধিবাসীদের খাদ্যের ও পানীয়ের অসুবিধে হয় না।

শানিদার গুহায় বাস করে কুর্দ উপজাতি। এরা চিন্তা-ভাবনা ও জীবনযাত্রা প্রণালীর দিক দিয়ে আদিম। এদের সঙ্গে আড়াই হাজার বছর আগের আসিরীয় গোপালকদের বিশেষ কোন পার্থক্য নেই। ফ্লিন্ট পাথর দিয়ে এরা আগুন জ্বালায়, গোল পাথর দিয়ে গম পেষে, ছাগলের চামড়ার খোল তৈরী করে জল নিয়ে আসে ঝর্ণা থেকে। মেয়েরা কাস্তে দিয়ে পাহাড়ী খেতে শস্য কাটে।

শানিদার গুহায় এখন কুর্দরা বাস করলেও প্রায় এক লক্ষ বছর আগেও যে এখানে মানুষ বাস করত, প্রত্নতাত্ত্বিকেরা সে প্রমাণ পেয়েছেন। গুহার মেঝে খুঁড়ে তাঁরা এর ভেতর প্রাচীন মানুষের অস্তিত্বের চিহ্ন দেখতে পেয়েছেন, বুঝতে পেয়েছেন যে তিন হাজার বংশ পরম্পরায় মানবজাতির প্রথম দিককার ইতিহাস রচিত হয়েছে এখানে।

শানিদার গুহার রহস্য আবিষ্কার করেন প্রত্নতাত্ত্বিক র‍্যালফ সোলেস্কি। ১৯৫১ সালে এই গুহা খনন করে তিনি এখানে চারটি স্তরের সন্ধান পান।

প্রথম স্তরের ঘনত্ব ৫ ফুট, মাটি কালো ও মসৃণ। অনুমিত হয় আজ থেকে সাত হাজার বছর আগে নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ এই স্তরে বাস করত। তখন সবে শিকার ছেড়ে কৃষিকাজ মন দিয়েছে সে, যাযাবরবৃত্তি ত্যাগ করে স্থায়ী আস্তানায় বসবাস করতে শুরু করেছে। এই স্তরে পাওয়া গিয়েছে গৃহপালিত পশুর হাড় এবং পাথরের অস্ত্র। আজও কুর্দরা ঐ ধরনের পাথরের অস্ত্র দিয়ে বাদাম গুঁড়ো করে। তামাক রাখার পাত্র ও পালিশ করা কিছু মাটির পাত্রও এখানে পাওয়া গিয়েছে।

দ্বিতীয় স্তরের মাটি কিছুটা তামাটে। মনে হয় প্রায় বারো হাজার বছর আগে এখানে মানুষ বাস করত। এসব মানুষ পশুপালন কৃষিকাজ মাটির পাত্র তৈরি —এসব কিছুই জানত না। পশুর হাড় এ স্তরে খুব কমই পাওয়া গিয়েছে, তবে শামুকের খোলার প্রচুর নজির আছে। এর থেকে বোঝা যায় যে তখনকার মানুষের অন্যতম প্রধান খাদ্য ছিল শামুক।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তরের মধ্যে ব্যবধান ১৭০০০ বছরের। সম্ভবতঃ এ সময় শানিদার গুহা ছিল মনুষ্যবসতিহীন, কারণ, এই সুদীর্ঘ সময়ে ব্যবহৃত কোন জিনিসের চিহ্ন পাওয়া যায় নি।

তৃতীয় স্তরের মধ্যে ২৯০০০ বছর থেকে ৩৮০০০ বছর আগের ইতিহাস পাওয়া যায়। এই স্তরের মাটি হলদেটে এবং পুরাতন প্রস্তর যুগের চিহ্ন এখানে পাওয়া যায়। এই স্তরের উপর নানা প্রস্তরখণ্ড দেখে প্রত্নতত্ত্ববিদরা অনুমান করেন যে প্রবল ভূমিকম্পের ফলে প্রস্তরখণ্ডগুলি ছিটকে এসে পড়েছিল।

চতুর্থ স্তরই সর্বশেষ স্তর। প্রায় পঞ্চাশ হাজার বছর আগেকার মানুষ এই স্তরে বাস করত। এ স্তরে একজন পূর্ণ মানব ও তিনটি শিশুর কঙ্কাল পাওয়া গিয়েছে।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

সব হ'তে আপন

মীরা মুখোপাধ্যায়

কিছু লোক আছে যারা শান্তিনিকেতনে পড়তাম শুনলেই বাঁকা হেসে বলে, 'শান্তিনিকেতন! যেখানে ছেলেমেয়েরা গরুকে বলে— এই গরু সর্‌না, নইলে ফুল ছুড়ে মারব।' প্রথম প্রথম রাগ হত। বয়সও অল্প ছিল। তাই ঝগড়া করে কত বন্ধুবিচ্ছেদ পর্যন্ত হয়ে গেছে। পরে বলতে শুরু করলাম, 'ও, তা হলে আপনি অন্য শান্তিনিকেতনের কথা বলছেন। আমাদের শান্তিনিকেতনে তো খোলা মাঠের মেলা। প্রকৃতিকে আমরা এত আপন করে পাই যে গরু বাছুর কুকুর বেড়াল কাঠবিড়ালী পাখপাখালী সবই 'আমাদের' হয়ে ওঠে— কাউকে মারতে হয় না— এমনকি সাপকেও না। 'কোপাই'-এর ধারে বেড়াতে গিয়ে দেখেছি, একটা বড় কালো সাপ রাস্তার এপার থেকে ওপার হচ্ছে। তার এ পাশে আমরা আর ও পাশে কতকগুলি সাঁওতাল পুরুষ ও নারী। সাপটা নিজের মর্জি মতন ওপারের কেয়া ঝোপে ঢুকে পড়ল। আমরাও যে যার মত রাস্তা ধরলাম।'

আমরা তিন বোন একসঙ্গে শান্তিনিকেতনে পড়তে যাই। আমাদের ভাগ্য যে সেটা ছিল ১৯৬১ সাল— কবিগুরুর জন্মশতবার্ষিকীর বছর। তখন কত বড় বড় মানুষকে দেখেছি। কত সহজ স্বাভাবিক ব্যবহার দেখেছি তাঁদের। ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তাঁদের ব্যবহার কত সহজ মধুর ছিল। এখন বুঝি, 'তিনিই মধ্যম যিনি চলেন তফাতে।'

সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, জওহরলাল নেহরু, সৈয়দ মুজতবা আলি, সত্যজিৎ রায়— এঁদের সঙ্গে ছাত্রছাত্রীদের ঘরোয়া সভা করে আলাপ আলোচনা হত। মনে হত না এঁরা দূরের মানুষ। রামকিঙ্করদা গ্রীষ্মে ভরা দুপুরে গান গাইতে গাইতে মূর্তি গড়ছেন, শৈলজারঞ্জনদা, মোহরদি উৎসবের গান শেখাচ্ছেন এখন মনে হয়, এ সব সত্যি ঘটনা তো?

সেবার পৌষমেলায় বাউল গানের আসরে পূর্ণদাস বাউলের বাবা নবীনদাস বাউল গান গাইতে গাইতে এমন ভাববিহ্বল হয়ে পড়লেন যে গান বন্ধ করে অতি ধীরে ধীরে বসে পড়লেন। ওঁরা বললেন ওঁর 'দশা' হয়েছে। এখন ভাবি কিন্তু মনে করতে পারি না, উনি কী এমন গান গেয়েছিলেন যা ওঁকে দেহমনের সুদূর পারে নিয়ে গেছিল?

এ বার তোমাদের দুটো মজার গল্প বলি, আমার জীবনের অভিজ্ঞতার কথা।

আমাদের তখনকার উপাচার্য সুধীরঞ্জনদা ছিলেন অপূর্ব মানুষ। উনি যখন প্রথম এলেন, ওঁকে স্বাগত জানাতে

সিংহসদনে ব্যবস্থা হল। আমাদের বিদ্যাভবনের ছাত্রীদের ওপর ভার পড়ল 'ওপনিং সং' গাইবার। মঞ্জুদি গানটি আমাকে আর বাসুকে (বাসনা দেববর্মনকে) শিখিয়ে দিয়ে বললেন, 'তোমরা আরও কিছু মেয়েদের শিখিয়ে ঐদিন গাইবে। কে কে গাইবে একটা লিস্ট করে নিও।' লিস্ট তো বেড়েই চলল কিন্তু গান কেউ বিশেষ শিখতে এল না। হয়ত আমরা তখন সবে ভর্ত্তি হয়েছি বলে আমাদের কাছে শিখতে ওদের আত্মসম্মানে লাগল। আমি একবার গাঁইগুঁই করে একটা রিহার্সেলের কথা বলাতে পাঞ্জাবী মেয়ে চঞ্চলকুমারী বলল, 'এ সব অতি সাধারণ গান, আমরা রোজ গাই। তোমরা তো নতুন— তোমরা প্র্যাকটিস কর।' গানটি ছিল— 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান।'

নির্দিষ্ট দিনে সন্ধ্যের মুখে সিংহসদনের আসরে সুধীরঞ্জনদা এসে বসলেন। ওঁকে চন্দনের ফোঁটা দিয়ে বরণ করল একটি সুসজ্জিতা মেয়ে। তারপর আমাদের গান শুরু হবার কথা— সে এক অপূর্ব কোরাস। একজন বলছে 'আনন্দেরই'— অন্যজন তখন ধরে ফেলেছে 'এসেছে আজ বান।' সে এক বিতিকিচ্ছিরি ব্যাপার। মাথা নিচু করে চেষ্টা করে যাচ্ছি গলা মেলাতে, কিন্তু কার সঙ্গে মেলাব? এক একজন এক একটা লাইন গাইছে। হঠাৎ দেখি একটা ভারী সুরেলা গলা হাতে মাত্রা দিয়ে গাইছে— 'আনন্দেরই সাগর হতে এসেছে আজ বান— দাঁড় ধরে আজ বোস রে সবাই, টান রে সবাই টান।' যিনি এই এতোগুলো বেসুরো বেতালাদের টেনে নিয়ে গেলেন সুরের জগতে তিনি আর কেউ নন— আমাদেরই সুধীরঞ্জনদা।

গান তো শেষ হল। আমি আর বাসু মাথা নিচু করে চুপি চুপি সরে পড়লাম। কিন্তু আশ্চর্য, পরের দিন কেউ আমাদের নিয়ে হাসাহাসি করল না। আস্তে আস্তে বুঝলাম এখানকার জীবন কত সহজ. স্বাভাবিক ছন্দে বাঁধা।

সুধীরঞ্জনদা কী করে সব ছাত্রছাত্রীদের নাম জানতেন, তা আমাদের এখনও বিস্ময়কর ঠেকে। আমার নানা ব্যাপারে ঝোঁক ছিল তাই আমার ঘরটা ভর্তি থাকত গাছের নানা রকম ছাল, ডালপালা, শ্রীসদনের সামনের রাস্তা থেকে কেনা নানা রকম মাটির পুতুল, সরা, ধূপদানী ইত্যাদিতে। তার ওপর থাকতো রং করার জন্য নানা আকারের সরা, নানা রং এ ভরা— সুতরাং ঘরটা যে সাজান গোছান ছিল না সেটা বুঝতেই পারছ।

সে দিন বুধবার— ছুটির দিন। মন্দিরের পর হোস্টেলে ঢুকছি দেখি সুধাদি, আমাদের হোস্টেলের সুপারিনটেন্‌ডেন্ট। বললেন, 'শোনো, আজ সুধীরঞ্জনদা আসবেন তোমাদের ঘর দোর দেখতে— দেখো ঘর যেন পরিষ্কার থাকে।' আমি তো এক দৌড়ে নিজের ঘরে ঢুকে যাবতীয় জিনিসপত্র খাটের নিচে ঢুকিয়ে দিয়ে বেডকভারটা মেঝে পর্যন্ত টেনে দিলাম। চট করে ঝাঁট দিয়ে ময়লাগুলো দরজার পাশে ঢুকিয়ে দিলাম। তারপর খুব খুশি খুশি মনে সিঁড়ি দিয়ে নামছি— ঠিক নিচের ধাপেই দেখি সুধীরঞ্জনদা। আমাকে দেখে ফিসফিস করে বললেন, 'তোমার ঘরটা পরিষ্কার আছে তো? সুধাদি দেখতে যাচ্ছেন।' আমি একগাল হেসে বললাম, 'হ্যাঁ'। সুধাদি যখন ওঁকে নিয়ে আমার ঘরে ঢুকলেন, তখন দেখলাম সুধীরঞ্জনদা বেশ নিশ্চিন্ত। আর সুধাদিকে যেন কেমন সন্দিগ্ধ মনে হল— জানি না, আমার মনের ভুলও হতে পারে।

এ রকম কত যে ঘটনা মনের মধ্যে ভেসে উঠছে তা আর একদিন তোমাদের শোনাব।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

ক্রিকেট

প্রসাদরঞ্জন রায়

গত মাসের উত্তর

১। প্রথম বিশ্বকাপের প্রথমদিন (৭ জুন, ১৯৭৫) দুজন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করেন: ভারতের বিরুদ্ধে ইংল্যান্ডের ডেনিস অ্যামিস আর পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে নিউজিল্যান্ডের গ্লেন টার্নার।

২। ভিভ রিচার্ডসের ১০১৩ রানের রেকর্ড ভেঙে ১৯৯১-৯২ বিশ্বকাপের শেষপর্যন্ত জাভেদ মিয়াঁদাদ করেছেন ১০২৯ রান।

৩। ৬.৯৬ : ১৯৮৭ সালে নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নাগপুরে ৩২.১ ওভারে ২২৪-১।

৪। প্রথম (১৯৭৫) বিশ্বকাপ ফাইনালে ক্লাইভ লয়েড।

৫। ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড, নাগপুর (১৯৮৭): সুনীল গাভাসকার ও চেতন শর্মা।

৬। ১৯৭৫ ও ১৯৭৯ বিশ্বকাপে এমন কোনও কেন্দ্রে খেলা হয়নি। ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে প্রথম এ রকম কেন্দ্র : সোয়ানসি, ৯ জুন, ১৯৮৩।

৭। গ্রাহাম গুচ, জাভেদ মিয়াঁদাদ ও মার্টিন ক্রো : প্রত্যেকেই একটি করে সেঞ্চুরি ও আটটি অর্ধশত রান করেছেন।

৮। ১৮টি উইকেট : রজার বিনি (১৯৮৩), ক্রেগ ম্যাকডারমট (১৯৮৭) ও ওয়াসিম আক্রম (১৯৯১-৯২)।

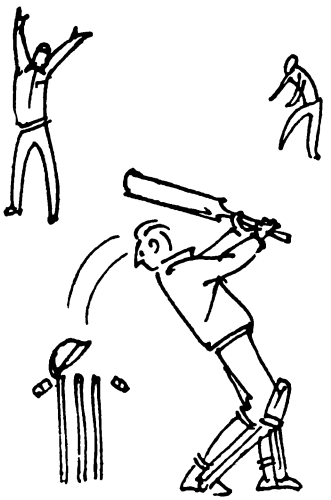

৯। নবজ্যোত সিং সিধু (১৯৮৭)।

১০। কেপলার ওয়েসেলস : ৭টি ক্যাচ (১৯৯১-৯২)।

১১। তিন ভাই রিচার্ড, ডেল ও ব্যারি হ্যাডলি নিউজিল্যান্ড দলে খেলেছেন।

১২। জন ট্রাইকস ও কেপলার ওয়েসেলস।

১৩। ডেরিক মারে (৬১) ও অ্যান্ডি রবার্টস (২৪)।

১৪। একজন বোলারের ওভারের কোটায় সবচেয়ে কম রান। পূর্ব অ্যাফ্রিকার বিরুদ্ধে বেদী (১৯৭৫): ১২ ওভার ৮ মেডেন ৬ রান ১ উইকেট।

১৫। ১৯৭৯, ম্যাঞ্চেস্টার, ইংল্যান্ড বনাম কানাডা: কানাডা ৪৫, ইংল্যান্ড ৪৬-২। মোট সময়: ৩ ঘন্টা ২৫ মিনিট।

১৬। অ্যালভিন কালিচরন।

১৭। ডানকান ফ্লেচার (জিম্বাবোয়ে)।

১৮। অ্যান্ড্রু ফ্লাওয়ার।

১৯। ইউয়ান চ্যাটফিল্ড।

২০। ক্লাইভ রাইস।

ফেলুদা ফোটো অ্যালবাম

সন্দীপ রায়

দ্বারভাঙ্গা ঘাটে ফেলুদা অ্যান্ড কোং পরিচালকের নির্দেশ শুনছেন।

সাইকেল রিক্সার উপর ক্যামেরা হাতে বাবা।

'সাধে কি বলে—ট্রুথ ইজ স্ট্রঙ্গার দ্যান ফিক্‌শন?'—কেদার ঘাটে তোলা সেই দৃশ্যের মেজাজট তিনজনকে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। পেছনে মুখ বাড়িয়ে কামু মুখোপাধ্যায়। নিচে, পাঁড়ে হাউলিতে নাইট-

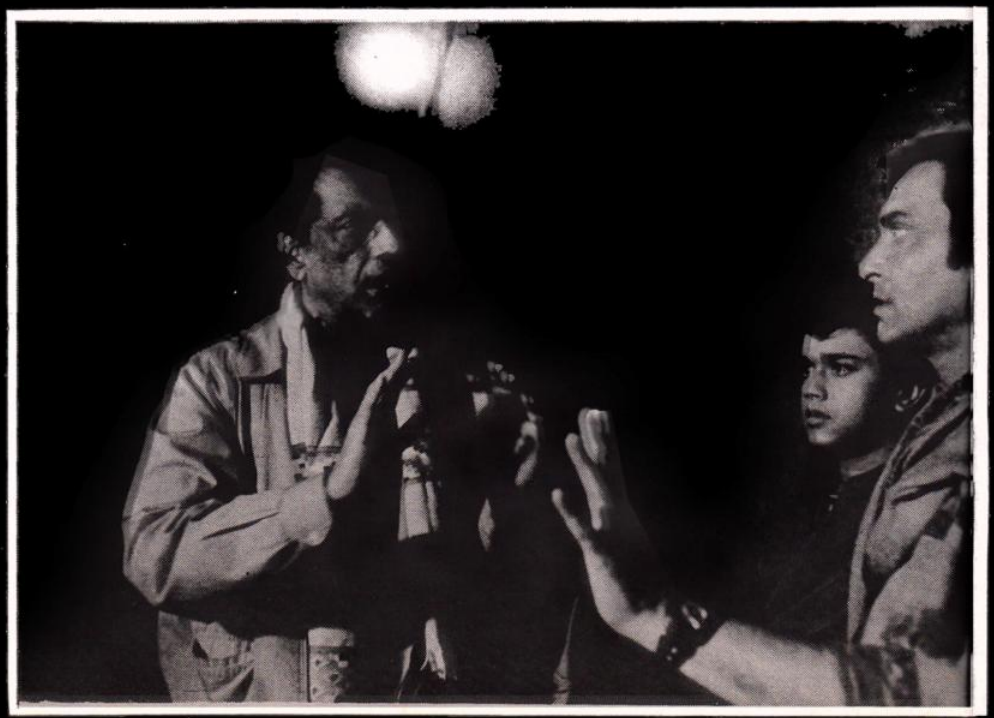

নাগওয়াতে জ্ঞান চক্রবর্তীর বাড়ি হয়ে উঠল
'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এ ঘোষালদের বাড়ি। সেই বাড়ির ছাদ
থেকে নিচে তাকিয়ে বাবা ও শ্রীমান জিৎ বোস (রুকু)।

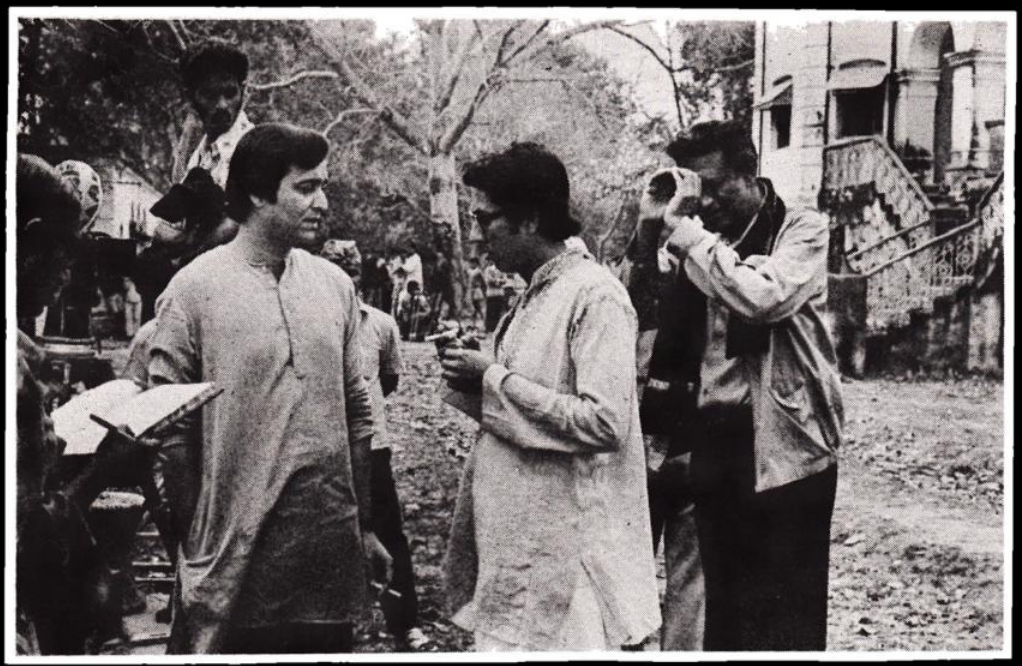

চক্রবর্তী-বাড়ির বাগানে ফেলুদা ও বিকাশ সিংহকে নিয়ে প্রথমে তোড়জোড়, (নিচে) তারপর শুটিং। বিকাশের ভূমিকায় বিপ্লব চট্টোপাধ্যায়।

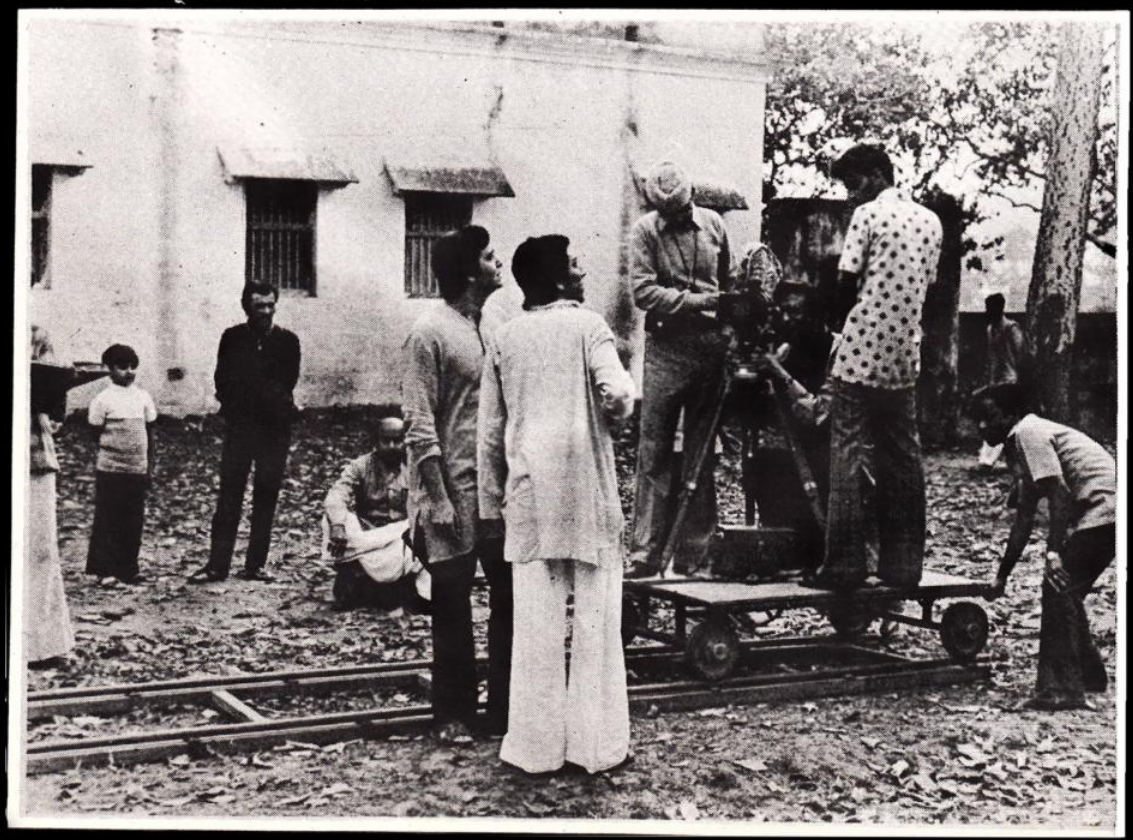

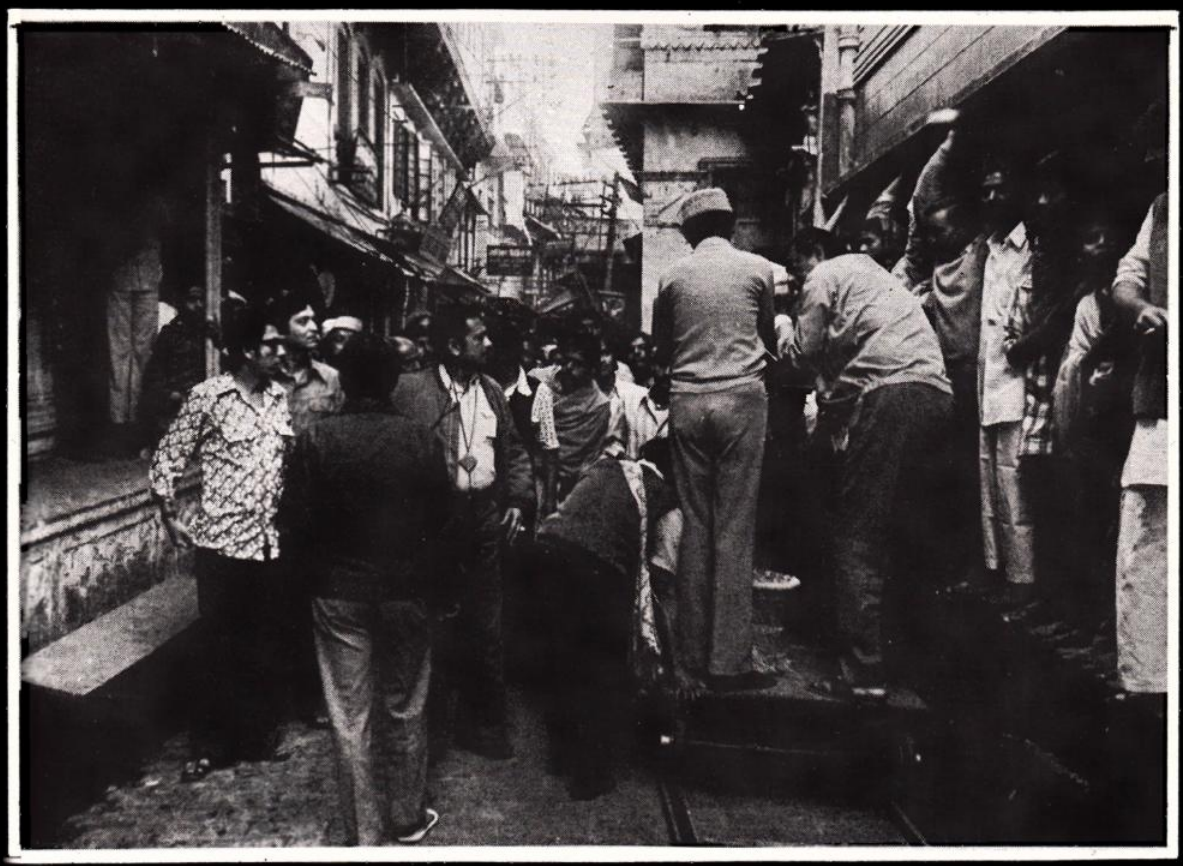

জনবহুল ঠঠেরি বাজারে ফেলুদা ও বিকাশকে নিয়ে কাজটা ছিল বেজায় ঝামেলার। নিচে, দ্বারভাঙ্গা ঘাটে আমাদের অতি পরিচিত দুই 'সন্ন্যাসী'র সঙ্গে বাবা দৃশ্যটা একবার ঝালিয়ে নিচ্ছেন।

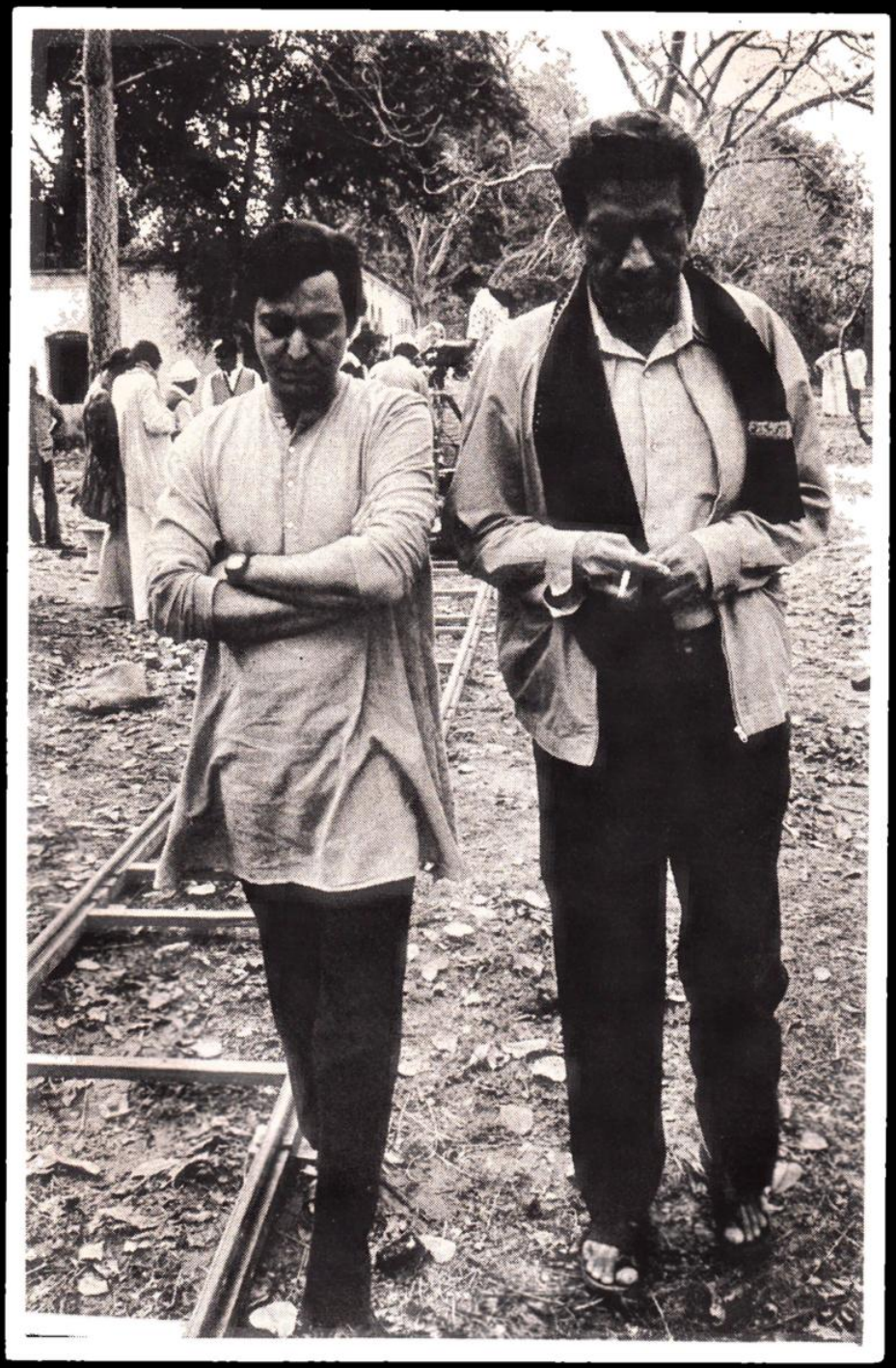

শট্ নেওয়ার আগে ফিল্মের ফেলুদা ও স্রষ্টা চিন্তায় মগ্ন।

ভাইপোর সন্ধানে লুবিন খুড়ো

মূল রচনা ও ছবি :
উইলিয়ম হিথ-রবিনসন

বাংলা রূপান্তর ঃ
চিত্রলেখা বসু

মৎস্য রাজ্যে

একদিন, লুবিন খুড়ো যখন সমুদ্রের তলায় খুঁজে বেড়াচ্ছে পিটারকে ঠিক তখনি সে গিয়ে পড়ল মৎস-শিশুদের মাঝে।

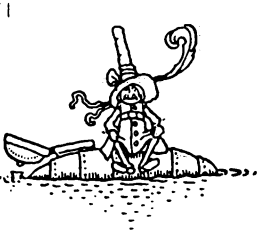

এক ছোট্ট মৎস শিশু খুড়োর কিম্ভূত জলযানটাকে টেনে নামাতে চাইল জলের তলায়। ছেলেটার নাছোড়বান্দা ভাব দেখে খুড়ো তাকে টেনে তুলল জলের ওপর।

অবাক হয়ে গেল খুড়ো। মৎসশিশু হলেও ছেলেটা মানুষের ভাষায় কথা বলতে পারে। আর সমুদ্রের সব আশ্চর্য সুন্দর সুন্দর গল্পও জানে অনেক। ছেলেটা খুড়োকে শুনিয়েও ছিল একটা গল্প।

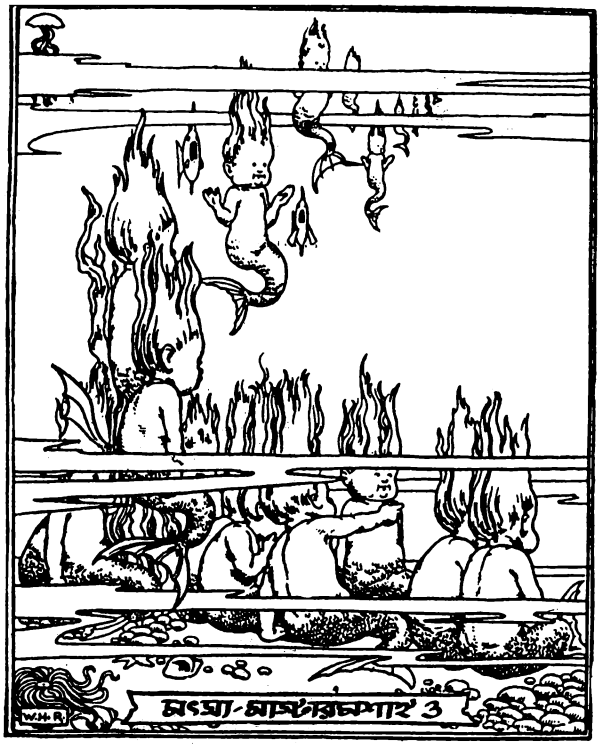

গল্পটা

দুঃখের। সেটা এই রকম ঃ 'আমাদের অবশেষে তো ইস্কুলে পাঠানো হল, সেখানে এক জ্ঞানী মাছ-বুড়ো ছিলেন আমাদের মাস্টারমশাই আমাদের যা যা জানা দরকার, সমস্তই সেই মাস্টারমশাই আমাদের শেখাতে চেষ্টা করেছিলেন।

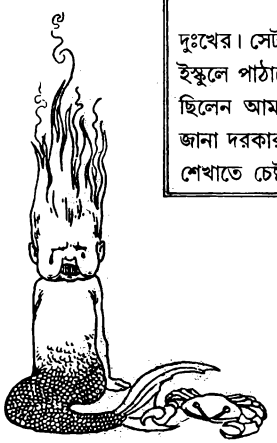

এক দুপুরে মাস্টারমশাই যখন আমাদের গান গাওয়া লাট্টু ঘোরানো শেখাচ্ছিলেন, আর খুব করে বোঝাচ্ছিলেন কী করেই সেটা গান গায়, সেই সময় হঠাৎ এসে হাজির হল এক বিশাল মাছ।

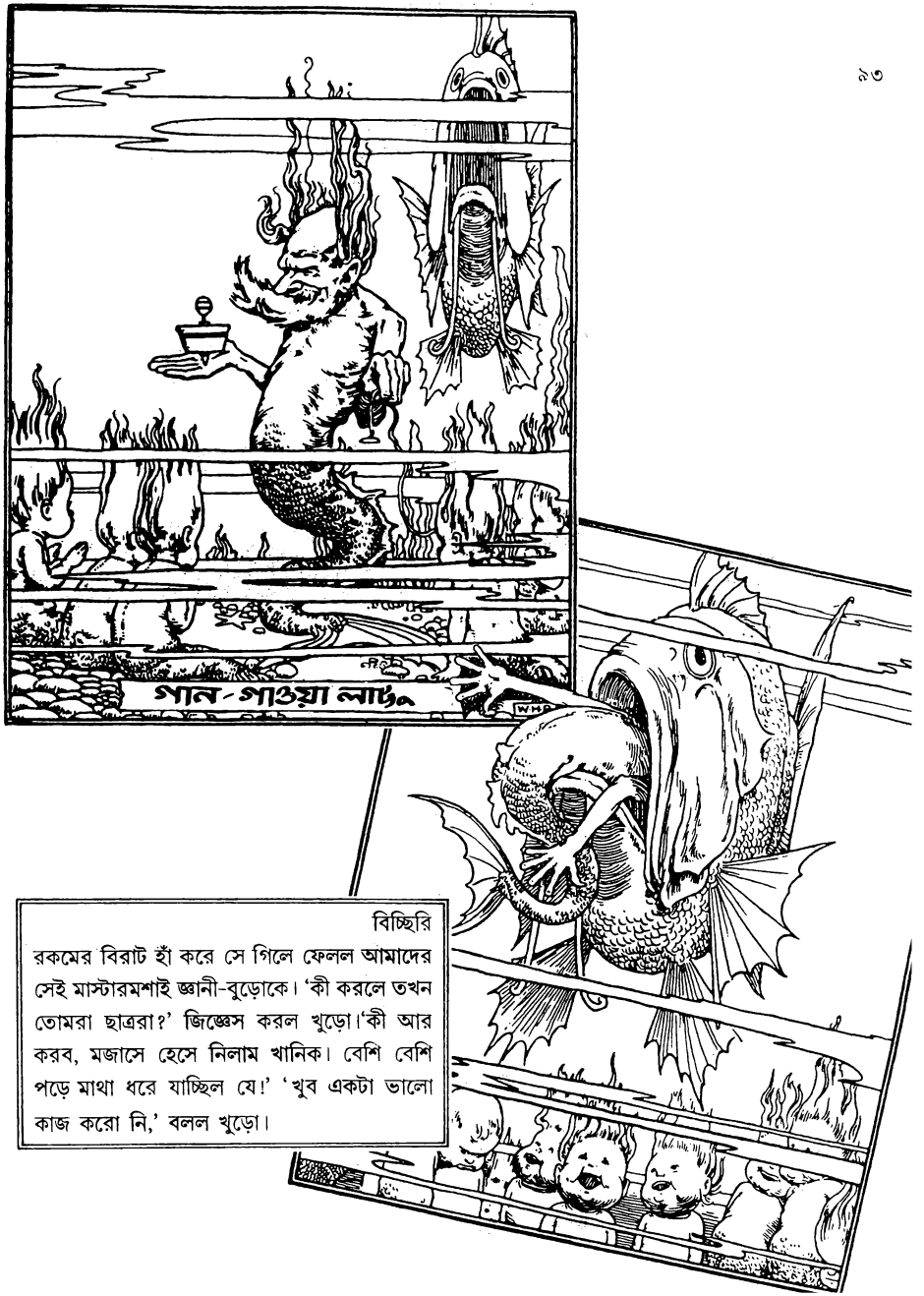

বিচ্ছিরি রকমের বিরাট হাঁ করে সে গিলে ফেলল আমাদের সেই মাস্টারমশাই জ্ঞানী-বুড়োকে। 'কী করলে তখন তোমরা ছাত্ররা?' জিজ্ঞেস করল খুড়ো।'কী আর করব, মজাসে হেসে নিলাম খানিক। বেশি বেশি পড়ে মাথা ধরে যাচ্ছিল যে!' 'খুব একটা ভালো কাজ করো নি,' বলল খুড়ো।

ছেলেবেলায়

ভারী খুশী হল খুড়ো মৎস শিশুর মুখে সুন্দর সুন্দর গল্প শুনে। 'আমি তোমাকে একটা গল্প বলছি এবার।' শুরু করল লুবিন খুড়ো ঃ 'আমার মনে পড়ছে— আমি যখন ছিলাম তোমার মতোই এক ছোট্ট ছেলে, তখন একবার বরফ-ঝড়ে হারিয়ে গিয়েছিলাম। বরফে চারদিক ঢাকা। অনেক ঘোরাঘুরি করেও হদিশ পেলাম না কোথায় আমাদের বাড়ি। কী আর করা? বরফের ওপর থেকে উঠে থাকা ছোট্ট একটা টুপির মতো জিনিস শুধু চোখে পড়ল। তারই পাশে রাত কাটাব বলে ঠিক করলাম।

কিন্তু যেই না একটু ঝিমুনি এসেছে, মনে হল—টুপিটা লাফিয়ে লাফিয়ে বরফ ফুঁড়ে ওপরে উঠে আসছে। টুপির পরে মাথা, শেষে বরফ ফুঁড়ে আমার সামনে উঠে দাঁড়াল কিম্ভূত চেহারার একটা লোক, টুপিটা ছিল তারই মাথায়।

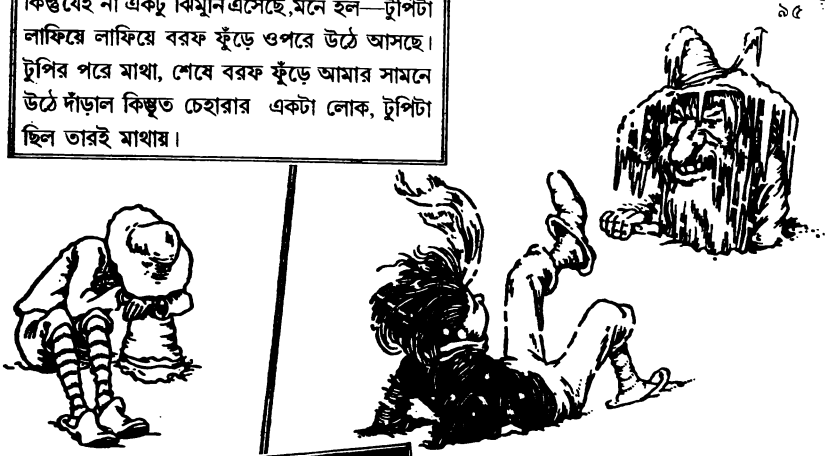

একটু ভয় হল। আর ভয়টা আরও বেড়ে গেল যখন লোকটা পেল্লায় এক তরোয়াল বের করে ভয়ঙ্কর গলায় বলল, 'এইবার তোমাকে আমি টুকরো করে ফেলব।' আমি তো টুকরো হতে চাই না, তাই প্রাণপণে দৌড়তে লাগলাম কোথায় যাচ্ছি নিজে জানি না, কিন্তু কী অদ্ভুত ব্যাপার দেখ—ঠিকই বাড়ি পৌঁছে গেলাম। আর উঠে পড়লাম সটান বিছানায়। আশ্চর্য, সে রাতে আমার বেশ ভালো ঘুম হয়েছিল।

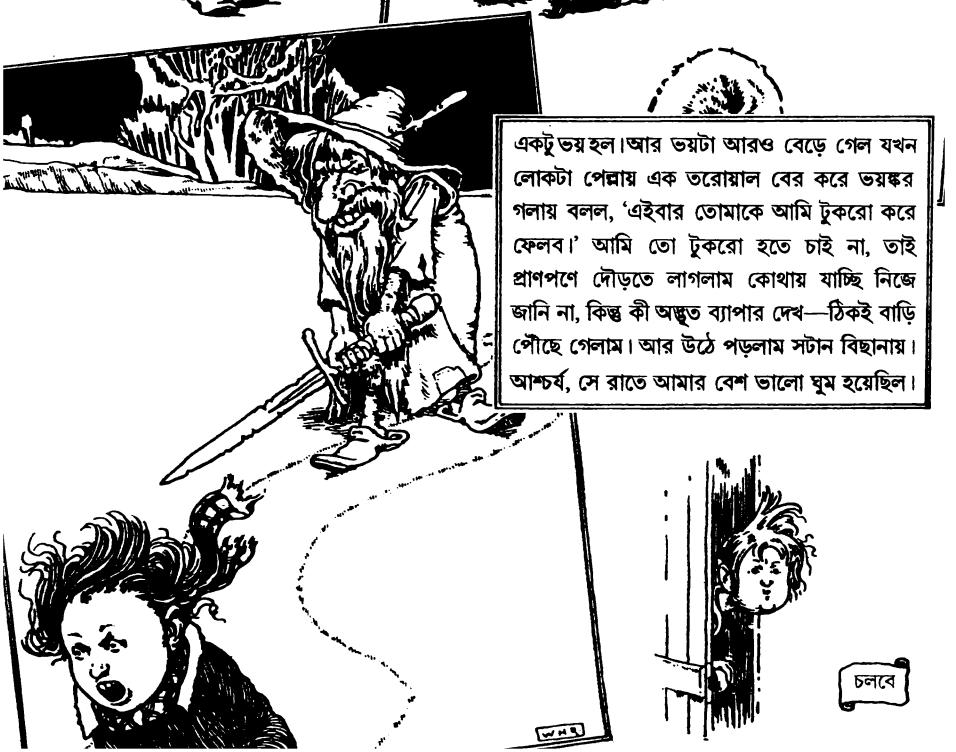

চলবে

কলেজের অ্যানুয়াল সোশাল ফাংশন নিয়ে কদিন ধরে এত ঝামেলায় রয়েছে গার্গী যে, তার ম্যাথ্‌স্ অনার্সের জটিল সমস্যাগুলো আপাতত মাথা থেকে হাওয়া। হাফ-ইয়ার্লি পরীক্ষাটা সদ্য হয়ে গেছে বলে যা একটু বাঁচোয়া, নইলে তার এই নাতি (ন+অতি) চওড়া কাঁধে এত সব দায়িত্ব নেওয়া সম্ভব হত না। তবু সে 'আই হাম্‌লি প্রে' বলে অনেক কাকুতি-মিনতি করেছিল সোশাল ফাংশনের দায়িত্বে থাকা পি.পি.পি-র কাছে। কিন্তু পি.পি.পি, অর্থাৎ অধ্যাপক প্রত্যুষপ্রসূন পাল একেবারে নাছোড় হয়ে বললেন, গার্গী, অন্তত স্যুভেনিরটার ভার তুমিই নাও। তোমার একটু লেখাটেখার হাত আছে যখন—

এর আগেই তার ঘাড়ে চেপেছে নাটকের তত-ছোট নয় একটি রোল, দুজন প্রখ্যাত কণ্ঠশিল্পীর সঙ্গে যোগাযোগ করা, তাঁদের ফাংশনের দিন নিয়ে আসার দায়িত্ব ইত্যাদি ইত্যাদি। এত সবের ওপর স্যুভেনির ছাপানো মানে আস্ত একটি সমুদ্রমন্থন সম্পন্ন করা। এর মধ্যেই তার কাছে গোটা দশেক কবিতা, দুটো প্রবন্ধ, ছটা সভাপতি-সম্পাদক প্রমুখের প্রতিবেদন, তা ছাড়াও বিজ্ঞাপনের প্রায় একশো ম্যাটার জমা পড়েছে, সেগুলো সাজিয়ে-গুছিয়ে দু-তিনদিনের মধ্যে প্রেসে না দিলে—

সকালে তার এক চিলতে ঘরখানায় বসে বিজ্ঞাপনগুলোই সাজাচ্ছে-গোছাচ্ছে, হঠাৎই তার দাদা সুশোভন বাজারের থলি হাতে ফিরে প্রায় হাঁপাতে লাগল, কী কাণ্ড, গল্‌ফ্ ক্লাবের পাশেই একটা খুন হয়েছে।

তার দাদা বাজার থেকে ফিরে রোজই মায়ের কাছে একটা না একটা জবর খবর স্কুপ হিসেবে পেশ করে থাকে, গার্গী তাতে অধিকাংশ দিনই মাথা ঘামায় না, কারণ ততক্ষণে হয়তো অ্যাসট্রনমি অথবা হাইড্রোস্ট্যাটিক্সের কোনও জটিল অঙ্ক নিয়ে সে আনাড়ির মতো গভীর জলে সাঁতরাচ্ছে। কিন্তু আজ একেবারে মার্ডার-কেস শুনে কান খাড়া করল ডাইনিঙের চত্বরে।

তার মা তখন উৎকণ্ঠিত হয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেনে নিচ্ছেন খুন-বৃত্তান্ত, হঠাৎ সুশোভন যেই বলেছে, ওই যে, কিঙ্কর বলে একটা ছেলে, আর্টিস্ট হিসেবে বেশ নাম করেছিল, তাকেই—

কিঙ্কর নামটা শুনে ধড়াস করে উঠল গার্গীর বুকের ভেতরটা, লাফিয়ে বাইরে এসে বলল, সে কী! কিঙ্করদা!

—হ্যাঁ...

গার্গীর মুখখানা কেমন নীল হয়ে গেল খুনের বীভৎসতায়, বিশেষ করে বেশ চেনা একটি মানুষ যদি ভয়ঙ্কর ভাবে খুন হয়ে যায় হঠাৎ, তা হলে সেই দুঃখ কল্পনা করে কয়েক মুহূর্ত তার হৃৎপিণ্ড স্তব্ধ হয়ে গেল যেন। কিঙ্করদা তার তেমন পরিচিত ছিল তা নয়। তার বোন ছন্দিতা গার্গীর সঙ্গে স্কুলে পড়েছিল বছর দুই, তারপর হায়ার সেকেন্ডারি পাশ করে এখন ভর্তি হয়েছে অন্য কলেজে। মাঝেমধ্যে পথেঘাটে দেখা হলে এক টুকরো হাসি ছুড়ে দিত একে অপরকে, তার বেশি পরিচয় ছিল না তখন। ছন্দিতার দাদা কিঙ্কর দত্তরায়কে সে অনেকবার দেখেছে এখানে-ওখানে, সে বার দুর্গাপুজোর প্যান্ডেলে তার আঁকা কিছু ছবি টাঙানো হয়েছিল 'নবীন শিল্পীর একক প্রদর্শনী' নামক একটি ক্যাপশন দিয়ে। আকাডেমি অব ফাইন আর্টসে তার দু-একবার প্রদর্শনী হয়ে গেছে, এমন শুনেওছে ছন্দিতার মুখে। তবে মাত্র কদিন আগে হঠাৎই প্রায় গায়ে পড়ে তার সঙ্গে আলাপ করতে হল গার্গীকে, এই স্যুভেনির প্রকাশের দায়িত্ব তার কাঁধে চাপাতেই। পি.পি.পি তাকে বলেইছিলেন, দেখো গার্গী, কভারের ছবিটা যেন দারুণ হয়। কভারে একটা আকর্ষণীয় ছবি থাকলে লোকে এমনিই স্যুভেনির হাতে তুলে নেবে।

ছন্দিতার সঙ্গে কিছুটা বন্ধুত্ব থাকার সুবাদেই গার্গী অতএব একদিন ঢুঁ মারল তাদের বাড়ি। কিঙ্করদার বয়েস ছাব্বিশ-সাতাশ, রোগা-পাতলা চেহারা, মুখের দাড়িও তার চেহারার মতো পাতলাই, তাতে তার ফর্সা রঙে বেশ শিল্পীসুলভ একটা নমনীয়তা। গার্গীর সঙ্গে আলাপ হতে, তার অভিপ্রায় শুনে সানন্দে রাজি হয়ে গিয়েছিল কভার আঁকতে, তারপর দিন দুই ঘোরাঘুরির পর ছবিটা কিঙ্করদা দিয়েছিল। এক কথায় সুপার্ব। পুরো কভারটিই চাইনিজ ইঙ্কে আঁকা, তাতে নিবের এমন অসাধারণ সূক্ষ্ম কারুকাজ! নিবিষ্ট হয়ে দেখার মতো। পি. পি. পি-কে দেখাতেই তিনি উচ্ছ্বসিত, বলেছিলেন, এই দ্যাখো, এই জন্যেই স্যুভেনির ছাপার দায়িত্ব আমি তোমার হাতে দিয়েছি। তোমার রুচি সবার থেকে আলাদা।

ভারী খুশি হয়েছিল গার্গী সে দিন কিঙ্করদার ওপর। একটা থ্যাঙ্কস জানিয়ে আসবে-আসবে এমন ভাবছিল গত দু-তিনদিন ধরে। সেই মুহূর্তে এ রকম ভয়ঙ্কর একটা সংবাদ সুশোভনের মুখে শুনে তার শরীরের ভেতরটায় একটা কাঁপ ধরে গেল। চেনা মানুষ খুন হয়ে গেলে হয়তো এ রকমই শিরশির করে ওঠে শরীরের ভেতরটা।

তৎক্ষণাৎ তার স্যুভেনিরের কাগজপত্র কোল্ডস্টোরেজে ঢুকিয়ে সালোয়ার কামিজ পরে নিল গার্গী। কোথায় যাচ্ছে, এই মুহূর্তে সেটি খোলসা করলে সে জানে বাড়িতে শুরু হয়ে যাবে তুমুল শোরগোল। অতএব, 'মা, একটু ইন্দ্রলেখাদের বাড়ি যাচ্ছি,' বলে কোনওক্রমে বেরিয়ে তাদের জুবিলি পার্ক থেকে শর্টকাট রাস্তায় ধরল গল্‌ফ্ ক্লাবের পথ। একটা ভীষণ কষ্টে কেমন চিনচিন করছে বুকের ভেতরটা। ছন্দিতার সঙ্গে অনেকদিন পর ক'বছর আগের বন্ধুত্ব একটু ঝালাই হয়ে ছিল বলে ওর কথা ভেবেও খুব মন খারাপ লাগছে। ওর বাবা সামান্য একটা চাকরি করেন, মা নেই, কিঙ্করদা আর্ট কলেজ থেকে পাশ করে বেরুবার পর আঁকাজোকায় বেশ নাম হতেই ইদানীং কিছু টাকাপয়সা আসছে ওদের বাড়িতে। ঠিক এহেন মুহূর্তে এমন একটি দুর্ঘটনা ওদের সংসারে প্রায় বজ্রপাতের মতো। ছন্দিতার সামনে এখন কীভাবে গিয়ে দাঁড়াবে ভাবতেই পারছিল না সে।

ছন্দিতাদের বাড়িটা গল্‌ফ্ ক্লাব রোডে, কিন্তু সে পথ না ধরে গার্গী প্রথমে চলে এল গল্‌ফ্ ক্লাবের বিশাল পাঁচিলটার সেই কোণে, যেখানে ভোর থেকে এলাকার মানুষজন ভিড় করে দেখতে আসছে কিঙ্করদাকে। বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করছিল গার্গীর। এ রকম বীভৎস দৃশ্যের মুখোমুখি হওয়াটা তার মোটেই পছন্দের নয়, কিন্তু কী এক অনিবার্য তাড়নায়, কৌতূহলে এগিয়ে গেল ভিড়ের দিকে। এর মধ্যে পুলিশের একটা জিপ এসে

দাঁড়িয়েছে, বেশ ক'জন পুলিশ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পাহারা দিচ্ছে দেহ। একজন জাঁদরেল চেহারার পুলিশ অফিসার কীসব নোট করে নিচ্ছেন তাঁর একটা ছোট্ট পকেট-ডায়েরিতে। ঝিলের ধার বরাবর আরও বহু লোক পিলপিল করে এ দিকে আসছে দেখে অফিসারটি তাঁর লেখা থামিয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন আপনারা সব বাড়ি চলে যান, বাড়ি চলে যান, এখানে ভিড় বাড়াবেন না অযথা।

কিন্তু তাঁর হুকুম তামিল করার মতো লোকজন তেমন নেই বোধহয়। কেউই বাড়ি ফেরার পথ ধরার উদ্যোগ করল না। তবে বেলা প্রায় আটটার মতো, অনেকেরই অফিসটফিস আছে বলে ভিড়ের ভেতর একবার উঁকি দিয়েই চলে আসছে তারা। গার্গীও পুলিশ অফিসারের দিকে বেশি না তাকিয়ে, উদাসীন ভঙ্গিতে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ মিশে গেল ভিড়ের ভেতর। কোনওক্রমে ঠেলেঠুলে যে দৃশ্য দেখল, তাতে মাথাটা ঘুরে গেল হঠাৎ।

কিঙ্করদার দিকে বেশিক্ষণ তাকিয়ে থাকতে পরল না গার্গী। শুধু দেখল কিঙ্করদার নেভি ব্লু রঙের প্যান্টের পকেটে উঁকি মারছে একগোছা টাকা। যতটা নজরে এল তার, তাতেই মনে হল নোটগুলো কড়কড়ে নতুন।

বাইরে বেরিয়ে আসতেই শুনল, একজন মাঝবয়সী লোক জিজ্ঞাসা করছেন পুলিশ অফিসারটিকে, কিছু জানতে পেরেছেন নাকি, কেন খুনটা হল।

পুলিশ অফিসার অতি অবহেলায় ঠোঁট ছুঁচলো করে বললেন, নিশ্চয়ই পলিটিক্যাল মার্ডার। এ বয়সের ছেলে তো এখন এ ভাবেই খুন হচ্ছে আকছার।

আর একজন পাজামা-পাঞ্জাবি পরা প্রৌঢ় তৎক্ষণাৎ

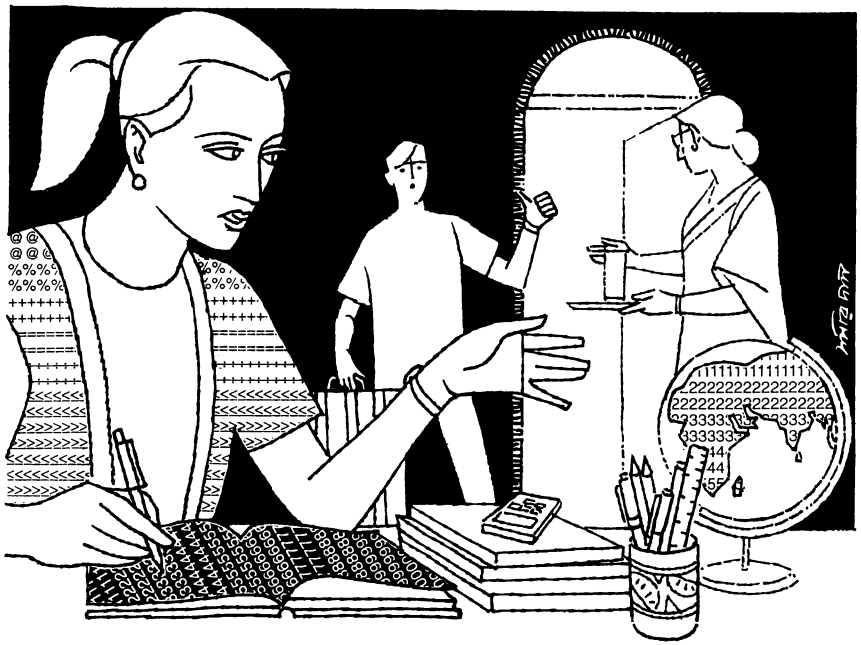

ঘাড় নেড়ে বললেন, না মশাই, এ ছেলে কখনও রাজনীতি-টিতি করত না। নিশ্চয়ই রাতের বেলা ফেরার পথে কোনও ছিনতাইবাজদের খপ্পরে পড়েছিল।

পুলিশ অফিসারটি সজোরে মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, আপনারা যদি সব বুঝে ফেলবেন, তা হলে আর আমাদের দরকার হত না। ছিনতাইবাজরা যদি এই খুনটা করত, তা হলে পকেটে অমন নোটের তাড়া রেখে চলে যেত না।

প্রৌঢ় বিন্দুমাত্র না দমে বললেন, এমনও তো হতে পারে, টাকাগুলো বার করে নেওয়ার আগেই পথে কোনও লোকজন এসে পড়েছিল, সে জন্য সরে পড়তে হয়েছিল ছিনতাইবাজদের। টাকাটা বার করে নেওয়ার সময়ই পায়নি।

পুলিশ অফিসারটি কিছু না বলে শুধু কটমট করে তাকালেন প্রৌঢ়ের দিকে।

চারদিকে আরও সব টুকরো-টুকরো কথা ভেসে আসছে, তাতে প্রত্যেকেই কিছু না কিছু উৎস অনুসন্ধান করার চেষ্টা করছে এহেন খুনটির। কিঙ্করদাকে অনেকেই চেনে এ তল্লাটে। দু-একজন রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বও চলে এসেছেন ভিড়ের কাছে। এলাকার দু-চারজন গণ্যমান্য লোকও। গার্গী বুঝে উঠতে পারছিল না কেনই বা কিঙ্করদার মতো একজন মার্জিত স্বভাবের যুবক হঠাৎ এ ভাবে বেঘোরে খুন হতে যাবে। কিঙ্করদার জীবনযাপনের বাস্তব দিক ঠিকঠাক যদিও জানা নেই তার, তবু তার কাছে কয়েকদিন যাতায়াত করার সুবাদে মনে হয়েছিল, একজন প্রকৃত শিল্পীর মতো তার ব্যবহার। শিল্পীরা যেমন তাঁদের সৃষ্টির ভেতর বুঁদ হয়ে থাকতে ভালবাসেন, কিঙ্করদাও তেমনই। ভিড়ের ভেতর নানান মন্তব্য শুনে অবশ্য একটুও আঁচ করা সম্ভব নয় খুনের সম্ভাব্য কারণ। আজকালকার পুলিশ অফিসাররাও হয়েছে তেমনি। কোনও রকম ইনভেস্টিগেশন শুরু করার আগেই খুনের কারণ সম্পর্কে এতটা স্বকল্পিত ধারণা পোষণ করতে শুরু করে যাতে খুনের আর কোনও মোটিভ থাকতে পারে কি না তা মগজেই ঢোকে না তাদের।

ততক্ষণে কিঙ্করদার বডি মর্গে পাঠানোর তোড়জোড় শুরু করেছে পুলিশ। অতএব ভিড়ের ভেতর থেকে বেড়িয়ে গার্গী হাঁটতে শুরু করল ছন্দিতাদের বাড়ির দিকে।

এমন একটি শোকাবহ বাড়িতে ঢুকতে অবশ্য একটুও পা উঠছিল না তার। কেন যেন একটা অদ্ভুত কষ্ট হচ্ছিল তার। ছন্দিতা মেয়েটা ভারী নরম। ওর মা বহুদিন আগেই কী একটা অসুখে ভুগে মারা গিয়েছেন। বাবা-দাদাকে নিয়েই তাদের ছোট্ট সংসার। কয়েকদিন আগেই চোখটা ছলোছলো করে বলছিল, দাদা রোজগার করতে শুরু করার পর থেকে সংসারের অভাবটা একটু কমেছে। এ সময় মা বেঁচে থাকলে কী ভালই না লাগত। পয়সার অভাবে তখন ভাল করে চিকিৎসাই করা গেল না মায়ের—

ছন্দিতাদের বাড়িতেও তখন অনেক লোকজন ভিড় করে রয়েছে। ছন্দিতার বাবা একেবারে পাথরের মতো চুপচাপ। মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই তাঁদের পরিবারের ওপর দিয়ে একটা প্রবল ঝড় বয়ে গেছে, তাতে থমথম করছে গোটা বাড়ি। প্রতিবেশীদের টুকরো টুকরো প্রশ্ন। তার জবাবে থেমে থেমে বলছিলেন তার বাবা, কতদিন ধরে বলছি, এত রাত করে বাড়ি ফিরিসনে। দিনকাল খারাপ। রাস্তাঘাটে কত বিপদ, কিন্তু আমার কথা তো কানেই নেয় না কোনওদিন।

গার্গীকে দেখে ঝরঝর করে আর একবার কেঁদে ফেলল ছন্দিতা। তাকে ঘিরে আশপাশের বাড়ির কয়েকজন মেয়ে-বউ। সবাই-ই স্তব্ধ হয়ে বসে আছে, যেন কী কথা বলে সান্ত্বনা দেবে তা কেউ বুঝে উঠতে পারছিল না। গার্গীও এমন ভীষণ নৈঃশব্দের ভেতর ঢুকে থম হয়ে রইল কিছুক্ষণ। এ বাড়ির সবখানেই কিঙ্করদার একটা প্রবল উপস্থিতি। তার আঁকা নানান ধরনের সব ছবির মাধ্যমেই। ঘরে, বারান্দার দেওয়ালগুলিতে কত রকমের ছবি টাঙানো রয়েছে, সেগুলো সত্যিই রঙের কারুকাজে, বিষয় বৈচিত্রে মুগ্ধ হওয়ার মতো। এর আগেও গার্গী যে ক'বার এসেছে ঘুরে ঘুরে চমৎকৃত হয়ে দেখত ছবিগুলো। আজ অবশ্য তাকে দেখতে হচ্ছে না, ছবিগুলোই যেন ক্রমশ বড় হতে হতে এমন ভাবে দেওয়ালগুলো ভরে ফেলেছে যে বারবার তারাই দেখছে

গার্গীকে।

ঘণ্টাখানেক এহেন অসহনীয় পরিস্থিতির ভেতর বসে থেকে, ছন্দিতার সঙ্গে টুকরো টুকরো কিছু কথা বলে বাড়িতে ফিরে এল গার্গী। সে দিন গোটা দুয়েক ক্লাস ছিল তার। ক্লাস শেষ করে বিকেলে বাড়ি ফেরার পথে হঠাৎ ইচ্ছে হল, আর একবার ছন্দিতাদের বাড়ি ঘুরে যাওয়ার। গিয়ে শুনল, পুলিশ এর মধ্যে দু-দুবার ঘুরে গেছে তাদের বাড়িতে। অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেছে ছন্দিতা আর তার বাবাকে। কিঙ্করদার ঘরে ঢুকে দেখে গেছে তার ছোট্ট স্টুডিওটা। উল্টেপাল্টে দেখেছে ছবিগুলো, আর নাকি ঠোঁট উল্টে বলেছে, এ সব কী ছবি? কিছু বোঝা যায় না। তারপর কিঙ্করদা কোথায় কোথায় যেত, কাদের সঙ্গে মিশত, সে সম্পর্কে সব জেনেটেনে নিয়ে তার দুই বন্ধুকে থানায় ডেকে নিয়ে গেছে আরও জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।

দুই বন্ধুর একজন প্রমিত জোয়ারদার, ইলেকট্রনিক্স্ ইঞ্জিনিয়ার, আই. আই. টি থেকে পাশ করে একখানা দুর্দান্ত চাকরি জোগাড় করেছে মস্ত বড় একটা টি. ভি. কোম্পানিতে। ছাত্র হিসেবে বরাবরই ব্রিলিয়ান্ট ছিল প্রমিত। এখন ভাল মাইনে। প্রচুর পার্কস্ নিয়ে অন্য চাকুরেদের কাছে রীতিমত ঈর্ষনীয়। একটা গাড়িও কিনেছে মাস তিনেক হল। অন্য বন্ধু সুনীল পোদ্দার, কমপিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়েছে। আগে একটা ছোট্ট লেটার-প্রেস ছিল তাদের। সুনীল কমপিউটার সায়েন্স পাশ করার পর পি. টি. এস. সংক্রান্ত যাবতীয় মেসিন-টেসিন কিনে এখন বিশাল ছাপাখানা করে ফেলেছে বাড়িতে। দু-তিন বছরের মধ্যেই তাদের ছোট্ট একতলা বাড়ির ডালপালা গজিয়ে প্রথমে দোতলা, তারপর মাসখানেক হল তিনতলাও উঠে গেল লিফ্টের মতো হু-হু করে। একটি গাড়িও কিনেছে মাসখানেক আগে। সুনীলের মা-ই প্রেসটার যাবতীয় কাজকর্ম তদারকি করেন। তার বাবা কী একটা বিদেশি কোম্পানিতে এক্সপোর্ট-ইম্পোর্টের কাজ দেখেন। মাস দুয়েক আগে তারা সপরিবারে ঘুরে এল গোটা ইউরোপ। হঠাৎ কী যে বড়লোক হয়ে গেল ছাপাখানা করে, ভাবাই যায় না।

তিনবন্ধুর মধ্যে কিঙ্করদাই যা একটু গরিব। অবশ্য তাদের ভেতর কে গরিব কে বড়লোক তার তুল্যমূল্য বিচার ছিল না কখনও। কিঙ্করদা নাকি ইদানীং বলত ছন্দিতাকে, আমার ছবির যা বাজার হচ্ছে, তাতে আমিও ছ'মাসের মধ্যে বিশাল বাড়ি হাঁকিয়ে ফেলব, দেখিস। ওদের দু'জনের মতো গাড়িও একটা—

ইদানীং তাদের বন্ধুত্বের ভেতর কোনও চিড় ধরেছিল কি না তাও বলা যাবে না এই কারণে যে, তাদের যার যার প্রফেশনের শত ব্যস্ততার মধ্যেও তিনজনে ফুরসত পেলেই একসঙ্গে আড্ডা মারতে বসত। সেটা অবশ্য কোনও রেস্তোরাঁ বা মাঠে নয়, তিনজনের বাড়িতেই বসত তাদের আসর। এক-একদিন এক-একজনের ঘরে। যে দিন প্রমিত আর সুনীল কিঙ্করদার বাড়ি আসত, ছন্দিতাকে ঘন্টায় ঘন্টায় চা করতে হত তার দাদা আর দাদার বন্ধুদের ফরমায়েস অনুযায়ী। তবে ইদানীং আড্ডাটা বেশি বসত সুনীলের বাড়িতেই। তাদের বাড়িতে অনেক জায়গা, পুরো তিনতলাটা সুনীলের নিজেরই, সেখানে হইচই করতে অনেক বেশি স্বাধীনতা।

ছন্দিতার কাছ থেকে এত সব কথা শুনতে শুনতে গার্গী জিজ্ঞাসা করল, হঠাৎ কেন এ রকম একটা সাংঘাতিক ঘটনা ঘটল, তার কারণ কি কিছু আঁচ করতে পারিস, ছন্দিতা?

ছন্দিতা বিস্মিত হয়ে বলল, কী করে করব?— ওদের বন্ধুদের ভেতর কোনও বিষয়ে সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল কি না—

ছন্দিতা জোরে জোরে ঘাড় নাড়ল, দ্বিমত হওয়ার কোনও প্রশ্নই আসে না। দাদার দুই বন্ধুই এত আড্ডাবাজ, এত প্রাণবন্ত যে, ওদের মধ্যে কোনও গোলমাল হওয়ার কোনও সুযোগ নেই। বরং ওরা দু'জনে মিলে ঠিক করেছিল, দাদার একটা একক প্রদর্শনী করবে অকাডেমি অব ফাইন আর্টসে, যাতে দাদার ছবির বাজার বাড়ে। কালও নাকি সেই ব্যাপারেই একটা মিটিং ছিল সুনীলদাদের বাড়ি। কাল রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত দাদা বাড়ি ফেরেনি দেখেও তাই তেমন চিন্তা করিনি। রাত বারোটা বেজে গেলে তখন বাবা বলল, এত রাত তো কখনও করে না তোর দাদা!

— তারপর!

— তখন পাশের বাড়ি থেকে সুনীলদাদের বাড়ি ফোন করলাম। তাতে সুনীলদা ফোন ধরে বলল, কিঙ্কর তো আজ এখানে আসেনি, ছন্দিতা। প্রমিত এতক্ষণ বসে ছিল ওর জন্যে।

— তাই! কিন্তু কিঙ্করদার তো ওদের বাড়িতেই মিটিং ছিল বললি?

— বাড়ি থেকে বেরুবার সময় তাই-ই তো বলে গিয়েছিল।

— কখন বেরিয়েছিল বাড়ি থেকে?

— রোজই তো বারোটা সাড়ে-বারোটা নাগাদ খেয়েদেয়ে বেরিয়ে যায়। কালও সে রকমই বেরিয়ে ছিল। আমাকে সকালবেলা বলেছিল, অকাডেমি অব ফাইন আর্টসে যাব। সেখান থেকে সুনীলদের বাড়ি হয়ে ফিরব।

— তাই! আচ্ছা, কিঙ্করদা কি রোজই এ রকম দেরি করে বাড়ি ফিরত? সাধারণত দশটা সাড়ে-দশটার মধ্যেই ফিরত রোজ। তবে আঁকার চাপটা হাতে থাকলে সাড়ে ছটা-সাতটার মধ্যেই ফিরত। মাঝখানে দিন পনেরো কুড়ি তো রোজই সন্ধে-সন্ধে বাড়ি ফিরত। বলেছিল, একটা বড় কাজ পেয়েছে কোথা থেকে। এটা শেষ করতে পারলে অনেক টাকা পাবে।

— কতদিন আগেকার কথা সেটা?

— মাস ছয়েক আগের কথা।

— পেয়েছে টাকাগুলো?

— বলেছিল তিনটে লটে কাজগুলো করতে হবে। তার একটা লট শেষ করে কিছু টাকা হাতে এসেছে। আরও পাবে আস্তে আস্তে। তবে বাকি লট দুটো শেষ করলে বাড়ি গাড়ি সব—

গার্গী ভুরু কুঁচকে ভাবল কিছুক্ষণ, কোত্থেকে অর্ডারটা পেয়েছিল তা জানিস?

— না রে, দাদার এই সব আঁকাজোকা নিয়ে তো কক্ষনও তেমন ভাবে মাথা ঘামাইনি। ক'দিন তো সারারাত ধরে আঁকল ছবিগুলো।

— ও, গার্গী ভাবতে ভাবতে সহসা এক গভীর অন্ধকারে পড়ে হাবুডুবু খেল কিছুক্ষণ। একজন প্রায় অপরিচিত মানুষের সম্পর্কে জানতে গিয়ে অন্ধকার থেকে আরেক গাঢ় কুয়াশায় নেমে যেতে হয় এ'সব ক্ষেত্রে। ছবি আঁকিয়ে কিঙ্করদা এ দিক-ও দিক থেকে অর্ডার পেয়ে যেই পয়সা পেতে শুরু করেছে, তখনই এহেন একটি অঘটন ভাবিয়ে তোলার মতো। খুনটা রাজনৈতিক কারণে নয়, তাও জেনে গেছে সে, কোনও ছিনতাইবাজদের কাজ কি না সেটাও খতিয়ে দেখা দরকার। সকালে ভিড়ের নানান মন্তব্য শুনতে শুনতে একবার মনে হয়েছিল, যদি ছিনতাইবাজদের কাজ হয়ে থাকবে, তা হলে তার পকেটে নোটের গোছা পাওয়া যাবে কেন! খুনের পর লোকজন আসতে দেখে ছিনতাইবাজরা টাকা না নিয়ে পালিয়ে যাবে, এমন আহাম্মক আজকালকার ছিনতাইবাজরা নয়। দরকার হলে পথচারীদের গায়ে একটা বোমা-টোমা ছুড়ে দিতেও পিছপা হবে না তারা। তা হলে খুনটা হলই বা কেন! ছন্দিতার কাছ থেকে একটু আগে যে কথাটা শুনল, সেই মোটা টাকার অর্ডার কোত্থেকে পেয়েছিল কিঙ্করদা। সেটা জানতে পারলে কোনও ক্লু পাওয়া যেত কি না কে জানে!

কিছুক্ষণ ইতস্তত করে গার্গী হঠাৎ বলল, কিঙ্করদার স্টুডিওটা আমাকে একটু দেখতে দিবি?

ছন্দিতা বেশ অবাক হল, কেন রে? পুলিশ তো তন্ন তন্ন করে দেখে গেল সর।

গার্গী অপ্রস্তুত হয়ে বলল, আমি তো পুলিশ নই। কিন্তু সমস্ত ব্যাপারটা ভারী আশ্চর্যজনক লাগছে আমার। মাত্র ক'দিন আমার কথাবার্তা হয়েছে কিঙ্করদার সঙ্গে, তাতে মনে হয়েছে, আর্টিস্ট হিসেবে খুব ব্রিলিয়ান্ট ছিল। এ রকম একটা প্রতিভার এ ভাবে অপমৃত্যু হল ভাবতে ভীষণ কষ্ট হচ্ছে। একবার যদি স্টুডিওটা দেখতে দিস।

ছন্দিতা ঘরটা খুলে দিতেই গার্গী ভারী বিষণ্ণ হয়ে গেল। এর আগে বার তিনেক কিঙ্করদার সঙ্গে এ ঘরে বসে কথা বলেছে গার্গী। সারা ঘরে অসংখ্য ছবিতে ভর্তি। কিছু বাঁধিয়ে দেওয়ালে টাঙানো, কিছু এমনি পড়ে আছে ঘরের মেঝেয়, কিছু টেবিলের ওপরে, বড় একটা আলমারির কাচের আড়াল থেকে উঁকিও মারছে কয়েকখানা।

অনেকক্ষণ স্টুডিওর ভেতরটা ঘুরে ঘুরে দেখে গার্গী তেমন কোনও উত্তর পেল না তার ভেতরে জমে ওঠা অজস্র প্রশ্নের। আলমারির ভেতর থেকে দুখানা বড় খাতা আবিষ্কার করল, যার পাতায় পাতায় অসংখ্য স্কেচ। চাইনিজ ইঙ্কে আঁকা। বেশ কিছু ল্যান্ডস্কেপ, কিছু ক্ষুধার্ত মানুষের ছবি, কিছু কলকাতার পুরনো বাড়ির স্কেচ। কয়েকটা বিভিন্ন ধরনের শিলালিপির ছবিও। তার সঙ্গে সে যুগের ক'টা মুদ্রার স্কেচও। শিলালিপির অক্ষরগুলো গার্গীর কাছে রোমান বা গ্রিকের মতোই দুর্বোধ্য। তাতে কোনও বার্তা বহন করেছে কি না ঈশ্বর জানেন।

খুঁজতে খুঁজতে একটা জলরঙের স্কেচের খাতাও আবিষ্কৃত হল আলমারির ভেতর থেকে। তাতেও ল্যান্ডস্কেপ, কয়েকটা মেয়ের মুখ, কিছু হাতি-ঘোড়, বাঘ ইত্যাদি জীবজন্তুর ছবি। এর মধ্যে যে বিশেষ ছবিগুলোর সন্ধান করছিল গার্গী, সেগুলো আছে কি না তা বুঝতে পারল না। কিছুক্ষণ পর এও ভাবল, এত বড় একটা মার্ডার কেসের ক্লু পাওয়া, তার রহস্য সমাধান করা এতই কি সোজা! সবে থার্ড ইয়ারে পড়ছে গার্গী। গোয়েন্দা কাহিনী পড়ে পড়ে নেহাত মাথাটা খারাপ হয়ে গেছে বলেই এ রকম একটা জটিল ব্যাপার তার মাথায় ঘোরাফেরা করছে। নইলে তার তো মাথা ঘামানোর কথাই না এ সব ঘটনায়। দেখতে দেখতে খাতার মধ্যে হঠাৎ একটা একশো টাকার নোট পেতে হঠাৎ কী মনে হল গার্গীর। চট করে নোটটা ঢুকিয়ে নিল তার ব্যাগের

ভেতর। প্রায় চোরের মতোই। ছন্দিতাদের বাড়িতে বসেই সন্ধের দিকে খবর এল, কিঙ্করদার যে দুজন বন্ধুকে পুলিশ জেরা করার জন্য থানায় নিয়ে গিয়েছিল, দুজনকেই ছেড়ে দিয়েছে কোনও ক্লু না পেয়ে। জানা গেছে, কিঙ্করদার সে দিন সুনীল পোদ্দারদের বাড়ি আসার কথা থাকলেও কোনও কারণে আসেনি। তাদের অন্য বন্ধু প্রমিত জোয়ারদার জানিয়েছে, কিঙ্করদা তাকে বলেছিল ঠিক বিকেল চারটে নাগাদ রবীন্দ্র সদনের সামনে দাঁড়াতে, যাতে তারা দুজনে একসঙ্গে চলে আসতে পারে সুনীলদের বাড়ি। প্রমিত নাকি বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত দাঁড়িয়েও কিঙ্করের দেখা না পেয়ে হাঁটতে হাঁটতে খোঁজ নিতে গিয়েছিল আকাডেমি অব ফাইন আর্টসের গ্যালারিতে। সেখান থেকে জানতে পেরেছিল, কিঙ্কর অনেক আগেই বাড়ি চলে গেছে কী সব জরুরি কাজ আছে বলে।

থানার খবরে আরও জানা গেছে, কিঙ্করদার পকেটে পাওয়া গেছে খানতিরিশেক পঞ্চাশ টাকার কড়কড়ে নোট। টাকাটা কার কাছ থেকে পেয়েছিল কিঙ্করদা, তা জানা যায়নি।

খুবই দুশ্চিন্তা নিয়ে সে দিন বাড়ি ফিরে এল গার্গী। সুনীল আর প্রমিত দুজনেই বলেছে, কিঙ্করের সঙ্গে তাদের মিটিং হয়নি। অথচ কিঙ্করদা খুন হয়েছে সুনীলদের বাড়ির কাছেই। যাইহোক, তার মাথায় অবশ্য অ্যানুয়াল সোশাল ফাংশনের হাজারও ভাবনা। তার বিপুল চাপে পড়ে কোথায় পুট করে মিলিয়ে গেল কিঙ্করদার হত্যা রহস্যের জট। কয়েকদিন ধরেই কোথায় স্যুভেনিরটা ছাপতে দেবে এমন ভেবে জেরবার হচ্ছিল গার্গী। হঠাৎ মনে হল, তাই তো, তাদের বাড়ির কাছেই এমন চমৎকার একটা প্রেস রয়েছে, সেখানেই কেন ছাপতে দিচ্ছে না বইটা! তা হলে তো তার প্রুফ দেখতেও সুবিধে।

সঙ্গে সঙ্গে তার স্যুভেনিরের লেখা আর বিজ্ঞাপনের ম্যাটার হাতে করে সে গিয়ে হাজির হল মস্ত তিনতলা বাড়িটার গেটে। দারুণ ঝকঝকে বাড়িটা। তার বাহারি গেট পেরিয়ে সরাসরি দেখা করল সুনীলের মা অলকা পোদ্দারের সঙ্গে।

অলকা পোদ্দার বেশ গম্ভীর ধরনের মহিলা। তবে গার্গী শুনেছে, ইনি অনেক নামীদামি সংস্থার কাজকর্মের সঙ্গে জড়িত। সমাজসেবিকা হিসেবে বেশ নামটামও হয়েছে তাঁর। গার্গীর কাছে সব শুনেটুনে ছাপা, বাঁধাই, কাগজ ইত্যাদির রেটগুলো বললেন, তাতে গার্গীর মনে হল, অন্য সব প্রেসের তুলনায় বেশ সস্তাই। কথায় কথায় অলকাদেবী বললেনও, রেট একটু কমের দিকেই রাখি বলে সারা বছর কাজ পেতে কোনও অভাব হয় না আমাদের।

ভদ্রমহিলার ব্যবসায়িক বুদ্ধি বেশ তারিফ করার মতো। সকাল দশটা থেকে রাত আটটা পর্যন্ত খোলা থাকে প্রেস। কাজও হচ্ছে সারাক্ষণ। কাস্টমারদের ভিড়ও কম নয়। প্রতিদিন কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে প্রেসে ঢুকে প্রুফ দেখতে হয় গার্গীকে। এ বছর প্রচুর বিজ্ঞাপন পাচ্ছে তাদের কলেজ, তাতে প্রুফ দেখার ঝামেলাও বাড়ছে রোজ। একদিন কয়েকটা ছাপা ম্যাটার কলেজে নিয়ে গিয়ে পি. পি. পি-কে দেখাতেই তিনি উচ্ছ্বসিত, 'বাহ্, ফাইন, এত কম রেটে কাজ করাতে পারছ! এই জন্যেই তো তোমাকে আমি —'

প্রেসের নিয়মকানুন এত চমৎকার যে, গার্গী এসে পৌঁছনো মাত্র তার সামনে প্রুফের বাণ্ডিল রেখে যায় প্রেসের কর্মচারীরা। রোজ ছ'টা, সাড়ে ছ'টা। কোনও কোনও দিন সাতটা পর্যন্ত প্রুফ দেখে সে। তাতেও যেন শেষ হচ্ছে না কাজ। এর মধ্যে কয়েকটা ইনস্টলমেন্টে প্রেসের টাকাও পেমেন্ট করেছে সে, কিন্তু খেয়াল করেছে রোজই বেশ চকচকে নোট ব্যালান্স হিসেবে ফেরত দেন অলকাদেবী। কড়কড়ে নোট হাতে পাওয়ার মজাই আলাদা। কিন্তু প্রেসের কাজ ক্রমে ক্রমে এত বেড়ে গেল যে, বেগতিক দেখে গার্গী একদিন তাদের ক্লাসের কপিশকে ধরল। অ্যাই, তুই আমাকে প্রেসের ব্যাপারে একটু হেল্প কর তো। একা এত বড় স্যুভেনিরের প্রুফ দেখা যায় না।

কপিশ জুবিলি পার্কের কাছেই থাকে, তৎক্ষণাৎ তার মাথা থেকে যেন একটা অদৃশ্য টুপি খুলছে, এমন ভঙ্গি করে মাথা ঝুঁকিয়ে বলল, যো হুকুম, কাল থেকে তোর

সঙ্গে প্রেসে যাচ্ছি আমি।

আসলে, ফাংশনের দিন যত এগিয়ে আসছে ততই দ্রুত স্যুভেনির প্রকাশ করার চাপ বাড়ছে তার ওপর। ইতিমধ্যে অলকাদেবী, তাঁর ছেলে সুনীল, এমনকি প্রেসের কর্মচারীদের সঙ্গে বেশ চেনা জানা হয়ে গেছে গার্গীর। সুনীল পোদ্দার একদিন গার্গীকে বলল, দেখবে, তোমার ছবিটা এঁকে ফেলব কমপিউটারের স্ক্রিনে?

গার্গী মুচকি হেসে চলে এসেছে। ইতিমধ্যে পুলিশ সুনীলকে আরও একদিন ডেকে নিয়ে গিয়েছিল থানায়, জিজ্ঞাসা করেছিল কিঙ্কর দত্তরায়, কোথা থেকে বড় অর্ডারটা পেয়েছিল, সেটা কী অর্ডার, কাদের অর্ডার, সে সম্পর্কে সুনীল কিছু জানে কি না। সুনীল উত্তর দিয়েছিল, আসামের কোনও একটা সংস্থা থেকে অর্ডারটা পেয়েছিল কিঙ্কর, শুধু এইটুকুই জানে সুনীল। সম্ভবত, টেম্পল বুকের ছবি আঁকার। 'আসাম' শুনে স্থানীয় পুলিশও আর বেশিদূর এগোয়নি তাদের তদন্তের কাজে।

একদিন প্রুফ দেখতে দেখতে রাত আটটা বেজে যেতেই অলকাদেবী নেমে এলেন ওপর থেকে, গার্গীকে দেখে অবাক হয়ে বললেন, কী হল, তুমি এখনও বাড়ি যাওনি?

গার্গী, কপিশ দুজনেই খুব লজ্জা পেয়ে গেল। বলল, আসলে, হঠাৎ আজ অনেকগুলো ম্যাটার এসে গেল, তাই-ই। আর আধঘণ্টার মধ্যেই শেষ হয়ে যাবে, অনিলদা কম্পোজ করছেন —

অলকাদেবী গম্ভীর হয়ে বললেন, আজ বরং এ পর্যন্তই থাক। আবার কাল এসো। রোজ আটটার মধ্যেই প্রেস বন্ধ হয়ে যায়। আটটা এক মিনিট হলেই এরা দু'ঘণ্টার ওভারটাইম চাইবে, তা জানো?

— তাই নাকি! গার্গী আর কপিশ দুজনেই ধড়মড় করে উঠে পড়ল তাদের কাগজপত্তর নিয়ে। বাইরে বেরিয়েই কপিশ ঠোঁটে একটা বিচিত্রভঙ্গি করে বলল, বেশ সাংঘাতিক মহিলা, কী বল্? পাছে কর্মচারীদের একটু বেশি টাকা দিতে হয়—

গার্গী হেসে বলল, সব ব্যবসায়ীই এ সব ব্যাপারে সজাগ। না হলে এত বড় বাড়ি করবেই বা কী করে বল!

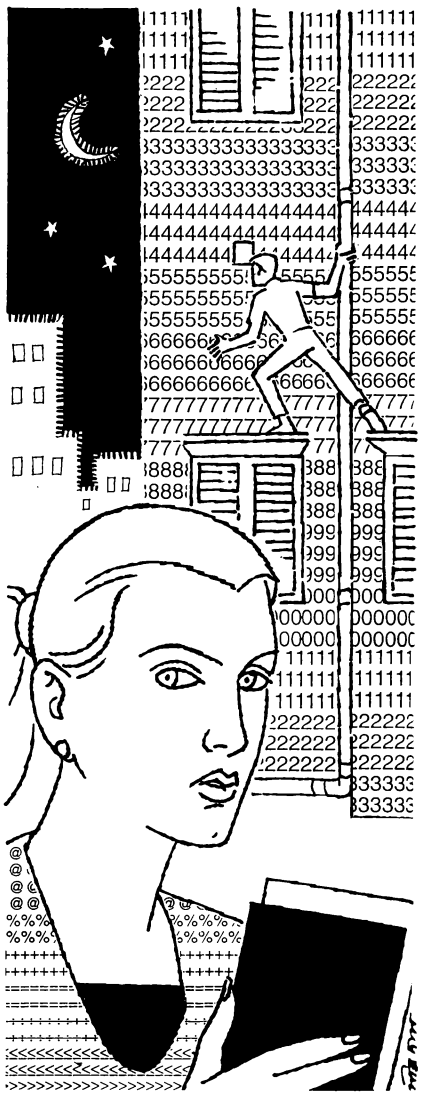

যাক গে, তুই বরং এখন আমার বাড়ি চল, কাগজগুলো পর পর সাজিয়ে ফেলি আজ। কাল কলেজ যাওয়ার পথে প্রেসে দিয়ে গেলে বিকেলে অনিলদা এগুলোকে কম্পোজ করে রাখবে।

কাগজপত্র প্রস্তুত করে কপিশ যখন গার্গীদের বাড়ি থেকে বেরুল, তখন রাত প্রায় সাড়ে দশটা। গার্গী বলল, অনেক রাত হয়ে গেল, তাই না? তবে কপিশের তাতে ভ্রূক্ষেপ নেই। বলল, কুছ পরোয়া নেই। আমার প্রায়ই এগারোটা হয়ে যায় ফিরতে।

পরের দিন কলেজে কপিশ অবাক করে দিল গার্গীকে, আরে কাল তো প্রেসের সেই ভদ্রমহিলা আমাদের আটটার মধ্যে ঠেলে বার করে দিল প্রেস থেকে। ফেরার পথে দেখি, তখনও মেসিন চলছে ভেতরে।

— তাই! প্রেস তখনও খোলা?

— খোলা ঠিক নয়। মানে, বাইরে কোলাপসিব্‌ল গেট বন্ধ, একেবারে তিন-তিনখানা বাঘা সাইজের তালা লাগানো। কিন্তু প্রেসের ভেতর শব্দ হচ্ছে, আলোও জ্বলছে মনে হল। আমার হঠাৎ কী খেয়াল হল, রেন-পাইপ বেয়ে উঠে উঁকি দিলাম ভেন্টিলেটরের ভেতর দিয়ে।

গার্গী আঁতকে উঠল, বলিস কী! কী দেখলি ভেতরে?

— ভেতরটায় আলো জ্বালানো দেখি, মা আর ছেলেই রয়েছে ঘরে, আর কেউ নেই। কিছু একটা ছাপছে।

গার্গীর ভেতরে সিনেমার ছবির মতো অনেকগুলো দৃশ্য দ্রুত সরে গেল যেন। এক লহমায় উত্তেজিত হয়ে উঠে বলল, ঠিক বলছিস?

— ওহ, সিওর। কিন্তু তুই হঠাৎ এমন এক্সাইটেড হয়ে পড়লি কেন?

দাঁড়া, দাঁড়া, মনে হচ্ছে একটা অঙ্ক সল্‌ভ্ করে ফেলেছি।

— অঙ্ক! এর মধ্যে আবার অঙ্ক পেলি কোত্থেকে তুই? ম্যাথসে অনার্স পড়িস বলে প্রেসেও অঙ্ক খুঁজে পাচ্ছিস!

—অঙ্ক না রে, মিস্ট্রি। বলে গার্গী কপিশকে একটা বিশাল মিস্ট্রির ভেতর ডুবিয়ে বলল, আজ রাতে তা হলে একটা অভিযান করব আমরা দুজনে।

কপিশকে সত্যি সত্যি বাকি দিনটা দারুণ ভাবনায় রেখে সে দিনও প্রুফ দেখতে রাত আটটা বাজিয়ে ফেলল গার্গী। যথারীতি অলকাদেবী তাদের দুজনকে তাড়া দিয়ে বাড়ি চলে যেতে বললেন। গার্গী বাইরে বেরিয়েই কপিশকে বলল, আজ কিন্তু আর বাড়ি ফিরব না আমরা। একটু দূরেই অন্ধকারে ওয়েট করব।

কপিশ হতভম্ব হয়ে গেল, কেন রে! কোনও ফিশি ব্যাপার আছে নাকি! ইলিশ, না চিংড়ি?

—ওয়েট অ্যান্ড সি, ফ্রেন্ড।

গার্গীরা বেরিয়ে আসার একটু পরেই প্রেসের লোকজন তাদের কাজ শেষ করে রওনা দিল যে যার ঘরমুখো। পরক্ষণে ভারী ভারী তালা পড়ে বন্ধ হয়ে গেল প্রেসের কোলাপসিব্‌ল গেট। আলোগুলোও নিভে গেল। তারপর আরও আধঘণ্টা পরে জ্বলে উঠল মেসিনঘরের আলো। একমাত্র ভেন্টিলেটার দিয়েই কয়েকটা আলোর টুকরো দেখা যাচ্ছে।

গার্গী ফিসফিস করে বলল, দ্যাখ তো কপিশ কাল যে দৃশ্য দেখেছিলি, সেটাই দেখছিস কি না আজ!

কপিশ মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই তার রেন-পাইপ অপারেশন শেষ করে নেমে এল, হ্যাঁ রে, সেই একই দৃশ্য।

—তা হলে চল, থানায় একটা ফোন করি। কাছেই একটা পাবলিক বুথ আছে।

থানার ফোন নম্বরটা আজ কলেজের টেলিফোন ডিরেক্টরি থেকে নোট করে নিয়ে এসেছে গার্গী। ফোন পেয়ে পুলিশ অফিসার অবশ্য ইতস্তত করছিলেন প্রথমে। পরে যেই গার্গী বলল, 'এলে কিন্তু কিঙ্কর হত্যা রহস্যের সমাধান পেয়ে যাবেন, ইনস্পেক্টরসাহেব', অমনি মিনিট দশেকের মধ্যে পুলিশের জিপ এসে হাজির।

আধঘণ্টার মধ্যে অতবড় বাড়িটা ঘিরে তল্লাশি করতেই ধরা পড়ল অলকা পোদ্দারের জাল নোট তৈরির বিশাল ফ্যাক্টরি। রাতের অন্ধকারে বন্ধ প্রেসের ভেতর আলো জ্বালিয়ে এ ভাবেই রোজ পঞ্চাশ টাকার জাল নোট রাশি রাশি ছাপায় মা আর ছেলে মিলে।

গার্গী আর কপিশ অপেক্ষা করছিল বাইরে। ইনস্পেক্টর

অমলেশ দত্তকে দেখেই গার্গী বলে উঠল, কিঙ্কর হত্যা রহস্যের মূলে কিন্তু এই জাল নোট তৈরির কারখানা। ইনস্পেক্টর তখনও ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না ঘটনাটা। বললেন, জাল নোটটা যে এখানেই তৈরি হয়, তোমরা জানলে কী করে। মাত্র কালই ফরেনসিক দপ্তরের রিপোর্ট এসেছে, কিঙ্কর দত্তরায়ের পকেটের পঞ্চাশ টাকার নোটগুলো সবই জাল। আমি ভেবেছিলাম, ছিনতাইবাজরা নোটগুলো জাল বুঝতে পেরেই সেগুলো না নিয়ে খুন করেছিল কিঙ্করকে।

— আসলে কি জানেন, ইনস্পেক্টরসাহেব, ক'দিন ধরেই আমার মনে হচ্ছিল, কিঙ্করদার খুন হওয়ার সঙ্গে তার ছবি আঁকার একটা সম্পর্ক আছে। বিশেষ করে যখন শুনলাম, একটা বড় অর্ডার পেয়েছে কোথা থেকে, তাতে ভাল পয়সা আসতে শুরু করেছে কিঙ্করদার, তখনই কোথাকার অর্ডার, কার অর্ডার তা খুঁজে বার করতে চেষ্টা করছিলাম। সে সময় কিঙ্করদার খাতার ভেতর থেকে একটা একশো টাকার নোট দেখে চুরি করে ফেললাম ক'দিন আগে। কারণ নোটটা দেখে আমার কেন যেন মনে হল এটা আসল নোট নয়, নোট জাল করার জন্য আঁকা হয়েছে ওটা। অলকাদেবীদের ওপর কেন জানি না সন্দেহ হয়েছিল সে সময়। বিশেষ করে কেন এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড়লোক হয়ে গেল তারা। তবে তাঁর ছেলে সুনীল পোদ্দার আপনাদের বলে এসেছিলেন, কিঙ্করদা অর্ডারটা পেয়েছিলেন আসাম থেকে, তাতেই কিছুটা সময় বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। পরে কপিশই. আমাকে হেল্প করল রহস্যটার সমাধানে। কিঙ্করদা পঞ্চাশ টাকার নোটটা নিখুঁত ভাবে এঁকে দিয়েছিল সুনীলকে। সুনীল আর প্রমিত তাদের কমপিউটারের ব্রেন প্রয়োগ করে তার নেগেটিভ তৈরি করে। কিন্তু এ ভাবে নোট জাল করার দরুন যত টাকা ভাগের ভাগ পাওয়ার কথা ছিল, কিঙ্করদা তা পায়নি। বারবার তাগিদ দিয়েও না পাওয়ায় হয়তো থ্রেট করেছিল পুলিশের কাছে সব ফাঁস করে দেবে বলে। তাতেই সুনীল আর প্রমিতের হাতে খুন হতে হল তাকে। একশো টাকার নোটটাও আঁকা হয়ে গিয়েছিল, আগের হিস্যা না মেটায় এটা নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিল কিঙ্করদা। আর জাল টাকা সম্ভবত সুনীল পোদ্দারের বাবার মাধ্যমে পাচার হয়ে যায়, কারণ ওঁর বাবা একটা এক্সপোর্ট-ইম্‌পোর্ট কোম্পানির ম্যানেজার। অনেক বিদেশি ওঁর কাছে আসে রোজ। হয়তো তাদেরই ঠকাতেন উনি। কারণ বিদেশিরা চট করে বুঝে উঠতে পারবে না কোন নোটটা আসল, কোনটা নকল। এ ভাবে প্রচুর ডলার রোজগার করাতে বিদেশে ঘুরে আসতেও সুবিধে হয়ে যাচ্ছে ওদের। যা মনে হচ্ছে, অলকাদেবীর প্ররোচনাতেই সে দিন সুনীলদের বাড়ি মিটিং করে বাড়ি ফেরার পথে সুনীল আর প্রমিত দুজনে মিলে—

রজার উইকল্যাণ্ডার স্মৃতি প্রতিযোগিতা

শ্রীমতী দময়ন্তী গুপ্ত-উইকল্যাণ্ডার তাঁর প্রয়াত স্বামী শ্রী রজার উইকল্যাণ্ডারের স্মৃতি রক্ষার্থে একটি ২০০ টাকা পুরস্কারের প্রতিযোগিতা আহ্বান করেছেন। বিজ্ঞান ও গণিতের শিক্ষক শ্রী উইকল্যাণ্ডার ছিলেন অনেক গুণের অধিকারী। তাঁর জীবনও ছিল বিচিত্র। জ্যোতির্বিজ্ঞানে আগ্রহী শ্রী উইকল্যাণ্ডার একজন সঙ্গীতজ্ঞ ও নানা বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শী ছিলেন। কৃষি, কাষ্ঠশিল্প, রন্ধনশিল্প সবেতেই ছিল তাঁর দক্ষতা। তিনি সমাজসেবী, আদর্শ শিক্ষক ও ধর্মপ্রাণ মানুষ ছিলেন। খ্রীষ্টধর্মের মূল আদর্শে অবিচল থেকেও তিনি হিন্দু ও ব্রাহ্মধর্মের আধ্যাত্মিকতায় আকৃষ্ট ও ব্রতী হন। ১৯৯১ সালে মাত্র ৪৯ বৎসর বয়সে তাঁর আকস্মিক মৃত্যু হয়।

জাদুমন্ত্র প্রতিযোগিতা

তুমি তাসের প্যাকেট থেকে জোড়ায় জোড়ায় দশ জোড়া তাস চিৎ করে সামনে পেতে দিলে। তোমার দু'তিন জন বন্ধু সামনে বসে। তাদের বল, প্রত্যেকে নিজের মতো এক জোড়া তাস যেন মনে করে রাখে। তুমি ওদের দিকে না তাকিয়ে পেছন ফিরে থাকবে। যখন তারা বলবে, তারা মনে করে রেখেছে, তখন তুমি জোড়ায় জোড়ায় তাসগুলো একের ওপর আরেক জোড়া এইভাবে হাতে তুলে নাও। এবার বন্ধুদের বলো যে, তুমি তাসগুলোকে এলোমেলোভাবে রেখে চারটে সারি তৈরি করছ, প্রত্যেক সারিতে পাঁচখানা তাস দিয়ে। তাই করলে। এবার প্রথম বন্ধুকে জিজ্ঞেস করো তার তাস দুটো কোন কোন সারিতে আছে। মনে করো, সে বলল, প্রথম সারিতেই দুটো আছে। তুমি দু'নম্বর আর চার নম্বর তাস দেখিয়ে দিলে। দ্বিতীয় বন্ধু বলল, তার জোড়া তাস দ্বিতীয় সারিতে একটা, চতুর্থ সারিতে একটা তুমি দুই সারিরই চার নম্বর তাস দেখিয়ে দিলে। সবাই আবার হয়ে যাবে। তারা তো জানে না যে, তুমি একটা জাদুমন্ত্র জানো। সেটা হল—*মিউটাস ড্যাডিট নোম্যান ককিস*। তাসগুলোকে এইভাবে সাজাতে হবে—

M	U	T	U	S
D	A	D	I	T
N	O	M	A	N
C	O	C '	I	S

A, C, D, I, M, N, O, S, T, আর U দশটি অক্ষর হল দশ রকম তাস — মন্ত্রের মধ্যে প্রতিটি অক্ষরই ঠিক দু'বার করে আছে, অথচ প্রতি জোড়ারই অবস্থান আলাদা সারিতে। এক কথার মধ্যে বা দুই সারিতে যেখানে এক অক্ষর দু'বার করে আছে সেই সেই জায়গায় জোড়া তাসগুলোকে রাখবে। লাইন আর স্থানগুলো কিন্তু মনে মনে আন্দাজ করে নেবে প্রথমে।

ম্যাজিকটা তো শিখে নিলে। কিন্তু মন্ত্রটা বাংলায় হলেই ভালো হত না? তোমরা একটা বাংলা মন্ত্র তৈরি কর তো। প্রত্যেক লাইনের অর্থ থাকলেও সব মিলে অর্থহীন হিজিবিজি হলে চলবে। তাহলেই বরং মন্তর মনে হবে। দেখি, কার মন্ত্র সবচেয়ে ভালো হয়।

অরিজিৎ সেনগুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল

তোমাদের হল কী বলত? ষণ্ড-কাণ্ড প্রতিযোগিতায় তোমাদের কাণ্ড দেখে বড়ই হতাশ হচ্ছি— এত কম প্রতিযোগী কেন? নাকি প্রতিযোগিতার সেই ষণ্ডের তাড়া খেয়ে পাকপাড়া ছাড়িয়ে আরও দূরে পৌঁছে গেছ? সে যাক, এ বার ফলাফলে আসি। দুই বিভাগে প্রথম স্থানাধিকারীদের নাম :

'ক' বিভাগ : ২২২৭ কৌস্তুভ দত্ত

'খ' বিভাগ : ১৪১৭ দীপাঞ্জন রায়

এ ছাড়াও এদের ছবিও ভাল হয়েছে— জ্যোতির্ময় দালাল (৪০২), পিয়া চক্রবর্তী (গ্রাহক নয়), কৃষ্ণ অন্তনা দেব (২৪৬), সুমিত সুরাই (৩০৮১), শুভায়ু রায়চৌধুরী (১৩২৪), সঞ্জীব মিত্র (গ্রাহক নয়)।

বুলবুল গুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতার ফলাফল

(কম লেখা এসেছে। বেশির ভাগ লেখাতে ছন্দ ঠিক নেই। এটা গান বাজনার তালের মতো নয়, মনের কানে শুনে ঠিক করতে হয়। একজনের গদ্যকবিতায় শোকগ্রস্ত মনের ভাবনাই প্রকাশ পেয়েছে, ঝলমলে বাচ্চাটির ছবি তো ফুটে ওঠেনি। তা ছাড়া 'প্রতিযোগীতা', 'যথারিতী,' 'পাওয়ার পড়ে' অনেকের লেখায় এ সব বানান দেখে বুনো রামনাথ বলেছেন, এটা 'খ' বিভাগের সন্দেশীদের অন্তত মানায় না।)

'ক' বিভাগ :

প্রথম পুরস্কার—অস্মিতা সরকার (২২০২)

'খ' বিভাগ :

প্রথম পুরস্কার—রাকা দাশগুপ্ত (১৩৩৪)

দ্বিতীয় পুরস্কার—বর্ণা সাহা (১৯৪৪)

ছোট্ট সে বুলবুল

অস্মিতা সরকার

২২০২, ১১ বছর ৭ মাস

সেই মেয়েটা একাই যেন
হাজার চাঁদের আলো,
রাত্রি বেলার আকাশ- মতো
চোখটি যে তার কালো।
আধো আধো কথা মুখে
টলোমলো পা.
পুতুল হাতে কাটিয়ে সে দেয়
চব্বিশ ঘণ্টা।
বয়স তো নয় এমন কিছু
এক কিম্‌বা দেড়,
এই বয়সেই শিখে গেছে
আধো কথা ঢের,
দুষ্টুমিতে মিষ্টি মেয়ের
জুড়ি মেলাই ভার,
দেখলে পরে মনটা জুড়োয়
কচি সে মুখ তার।
সেই মেয়েটা হাসলে পরে
ফোটে হাজার ফুল,
সবারই সে প্রাণেরই ধন
ছোট্ট সে বুলবুল।

সুপ্রভা গুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতা

এত কম প্রতিযোগী কেন?

কী হল? প্রতিযোগিতার সংখ্যার সঙ্গে তাল রাখতে পারছ না? একজন পদ্যে লিখলেও যেহেতু গদ্যেই লিখতে হবে এমন উল্লেখ ছিল না, তাই এটিকেও গণ্য করা হয়েছে।

ক-বিভাগ

প্রথম পুরস্কার— কৌস্তুভ দত্ত (২২২৭। ৯ বছর)

দ্বিতীয় পুরস্কার— অনিন্দ বসু (২৫২৯। ৮ বছর ২ মাস)

খ-বিভাগ

প্রথম পুরস্কার— জ্যোতির্ময় দালাল (৪০২। ১৬ বছর ৯ মাস)

দ্বিতীয় পুরস্কার— সুমিত সুরাই (৩০৮১। ১৪ বছর)

কৌস্তুভ দত্ত

গ্রাহক নং ২২২৭। বয়স ৯ বছর

কোন দেশেতে যাওয়ার আগে জিভের থেকে জল ঝরে
কোন দেশেতে পৌঁছে গেলে সবার আগে মন ভরে
কোথায় গেলে ফেলুদাকে হাতের কাছে যায় পাওয়া?
সন্দেশেরই পাতার মাঝে চোখ দিয়ে যা যায় যাওয়া।

কোথায় গেলে কলম নিয়ে হাতটি পাকে সহজে?
ধাঁধার রাজ্যে পৌঁছে গেলে বুদ্ধি গজায় মগজে?
কোন প্রকৃতির পাঠক হলে মাঠে ঘাটে যাওয়া যায়?
সন্দেশেরই পাতার মাঝে মন দিয়ে তা পাওয়া যায়।।

কোথায় গেলে 'ঝালাপালা' 'আবোল তাবোল' লেখা যায়?
অমাবস্যার রাতে কোথায় পূর্ণিমার চাঁদ দেখা যায়—
মনের সুখে 'গুপী'র মতো বেসুরো গান গাওয়া যায়
সন্দেশেরই পাতার মাঝে মন দিয়ে স্বাদ পাওয়া যায়।

জ্যোতির্ময় দালাল

গ্রাহক নং ৪০২। বয়স ১৬ বছর ৯ মাস

উপেন্দ্রকিশোর থেকে আরম্ভ করে সুকুমার সুবিনয় সত্যজিতের সম্পাদনার মধ্য দিয়ে 'সন্দেশ' আজ যে জায়গায় এসে পৌঁছেছে তা প্রশংসনীয়। বহু বাধাবিঘ্ন থাকা সত্ত্বেও 'সন্দেশ' নিঃসন্দেহে আজকের কিশোর কিশোরীদের মন ভরাতে একমেবদ্বিতীয়ম্। বহুল প্রচারিত অপরাপর পত্র-পত্রিকা থেকে ব্যতিক্রমই এর মুখ্য কারণ। বহুবর্ণ চিত্রের বাহুল্যবর্জিত, অহেতুক আত্মপ্রচারের চটকবর্জিত পত্রিকাটি অতি সহজেই তাই আমাদের সব বয়সের পাঠকের মনোরঞ্জনে সমর্থ হয়েছে। পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের সংস্কৃতি, খেলাধুলা, বিজ্ঞান, সাহিত্যজগতের রকমারি 'সন্দেশ'-এর ডালি সাজিয়ে আনে পত্রিকাটি কৌতূহলী পাঠকবর্গের উদ্দেশ্যে। সত্যিই— 'সন্দেশ মাসে মাসে পাবার মতো মজা আর নেই'!

প্রতিটি সংখ্যায় 'সন্দেশ'-এর পাতায় বহু অখ্যাত ও প্রখ্যাত সাহিত্যিকের গল্প কবিতা প্রবন্ধ উপন্যাস, নবীন প্রবীণ নির্বিশেষে আমাদের সব পাঠকেরই অবসর বিনোদনের মাধ্যম হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাশাপাশি, একান্তভাবেই 'খুদে সন্দেশী'দের জন্য বিভাগ— 'হাত পাকাবার আসরটি অনবদ্য। শিশুমনের কল্পযোড়ার বল্গাহীন দৌড়কে রাশ টেনে সুনিয়ন্ত্রিত পথে চালিত করে নতুন নতুন সৃষ্টির পথকে করেছে উন্মুক্ত। হোক না কচি হাতের কাঁচা কাজ, হাত পাকিয়ে নেবার জন্যই তো এই আসর! কত নতুন সম্ভাবনার জন্ম দিয়েছে এই বিভাগটি।

'ধাঁধা ও প্রতিযোগিতা' নামক বিভাগটিরও আকর্ষণ কম নয়। নতুন নতুন রকমারি ধাঁধার জট ছাড়াতে ছাড়াতে অজান্তেই পাঠকের বুদ্ধিচর্চা হয়ে যায়—আবার, অবসর মুহূর্তগুলিও ভরে ওঠে রহস্যভেদের উৎসাহে। বৈচিত্রপূর্ণ নানা বিষয়নির্ভর প্রতিযোগিতা আমাদের ভাবতে শেখায়, গড়ে তোলে সুস্থ প্রতিযোগিতামূলক মানসিকতা।

প্রসঙ্গত প্রশ্ন উঠতে পারে বিভাগগুলি কি আর কোনও পত্রিকায় নেই? নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু তা এমন সরস বৈচিত্রে পূর্ণ কি? বিশেষত 'প্রকৃতি পড়ুয়ার দপ্তর' নামক প্রকৃতি বিষয়ক শিক্ষাদানের অভিনব বিভাগটির অস্তিত্ব মেলে কেবল সন্দেশের পৃষ্ঠাতেই। বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ আজ যেখানে প্রকৃতিকে নির্বিচারে ঠেলে দিচ্ছে ধ্বংসের মুখে সেখানে নতুন দৃষ্টি নিয়ে প্রকৃতি, আর তার অন্তর্বর্তী পশুপক্ষী উদ্ভিজ্জগৎকে জানার প্রয়োজন আছে বৈকি! বিভাগটির উদ্দেশ্যও ঠিক তাই।

কাজেই, এতরকম বৈচিত্রে ভরপুর যে পত্রিকা— যার নামটি পর্যন্ত জিভে জল এনে দেয়, তা যে আমাদের প্রিয় হবে — তাতে আশ্চর্য কী?

অসিতকুমার গুপ্ত স্মৃতি প্রতিযোগিতা

এটাতেও সাড়া নৈরাশ্যজনক।

অনেকে কাগজের দু'পিঠেই লিখেছ। লেখা সব সময়ে কাগজের এক পিঠে লিখতে হয়।

ক-বিভাগ

প্রথম পুরস্কার— নির্মাল্য বিশ্বাস (১৮৯৭।১১ বছর)
দ্বিতীয় পুরস্কার— অস্মিতা সরকার (২২০২।১১ বছর ৯ মাস)

খ-বিভাগ

প্রথম পুরস্কার— সুমিত সুরাই (৩০৮১।১৪ বছর)
দ্বিতীয় পুরস্কার— দীপাঞ্জন রায় (১৪১৭।১৪ বছর)

ঋণশোধ

নির্মাল্য বিশ্বাস

গ্রাহক নং ১৮৯৭। বয়স ১১ বছর

জ্যোতির্ময় সেন তাঁর বাড়ির বারান্দায় বসে 'সায়েন্স' পত্রিকার পাতা উল্টোচ্ছিলেন। তিনি একজন প্রকৃতিবিজ্ঞানী। শহরের কোলাহল থেকে মুক্তির জন্য তিনি ঝাড়গ্রামে তাঁর বাড়ি তৈরি করেছেন।

বিয়ে করেননি। তাঁর সব সম্পত্তি তার সেক্রেটারি মোহিত দাশ দেখাশোনা করেন। জ্যোতির্ময় সেন বৃদ্ধ হয়েছেন। তিনি দিনরাত বিজ্ঞান গবেষণা নিয়েই থাকেন। দেশবিদেশের প্রখ্যাত বৈজ্ঞানিকরা তাঁকে চেনেন। তিনি খুব পশুপাখি ভালবাসেন। তার বাড়িতে দুটো ম্যাকাও পাখি আছে। বর্তমানে তিনি পরিবেশ দূষণ নিয়ে গবেষণা করছেন।

পলিথিন পরিবেশ দূষণের একটি প্রধান মাধ্যম। পলিথিন মাটির উর্বরতা কাটিয়ে ভূ-প্রকৃতিকে বিনষ্ট করছে। এ সব ভাবতে ভাবতে তিনি মনে করলেন যে পলিথিনের বিরুদ্ধে কার্যকর হতে হবে। পলিথিনকে ধ্বংস করে পৃথিবীর নির্মলরূপ ফিরিয়ে আনতে হবে। এমন কোনও বস্তু আবিষ্কার করতে হবে যা প্লাস্টিক বা পলিথিনকে নিরাপদে নির্মূল করে দেয়। হঠাৎ আপনমনে তিনি বলে উঠলেন, 'হে ভগবান! তুমি কি এই প্রকৃতিতেই তার চাবিকাঠি লুকিয়ে রেখেছ?'

জ্যোতির্ময়বাবু রোজ প্রাতঃভ্রমণে বেরোন। সেদিন সকালে ঘুরতে ঘুরতে তিনি একটা অদ্ভুত ধরনের গাছের সন্ধান পেলেন। পাতাগুলো নীলচে লাল রঙের। খাঁজকাটা দেহ, ফুলের রং কমলা। এই গাছ তিনি কখনও দেখেননি। বাড়ি ফিরে গাছ ও ফুল সম্পর্কে দুটো বই পড়েও তিনি কোনও সন্ধান পেলেন না সেই গাছের। হয়তো এমন কোনও উদ্ভিদ যার অস্তিত্ব কেউ জানে না। পরদিন সকালে তিনি সেই গাছটা এনে তার বাগানে পুঁতে পরিচর্যা শুরু করলেন। স্থির করলেন এই গাছটার উপরেই তার গবেষণা চালাবেন।

এই ঘটনার পর দু'মাস কেটে গেছে। জ্যোতির্ময়বাবু নভেম্বর মাসের সকালে বসে এমন একটি তরল পদার্থ আবিষ্কার করলেন, যা পলিথিনকে সম্পূর্ণভাবে নির্মূল করে দেবে। তিনি আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন কারণ তিনি প্রকৃতির এক বড় সমস্যাকে দূর করেছেন।

সে দিনই তিনি 'সায়েন্স' পত্রিকায় এ বিষয়ে একটি প্রবন্ধ ও সাথে সেই অজ্ঞাত গাছটি থেকে গবেষণা করে পাওয়া তরল পদার্থের একটি নমুনা পাঠালেন। তরলটির নাম তিনি রেখেছেন 'এনভায়রোসেভার'।

কদিন থেকেই তার শরীরটা ভাল যাচ্ছিল না। গবেষণায় ধকল সহ্য করতে না পেরে পরের দিন অসুস্থ হয়ে হসপিটালে ভর্তি হলেন।

হসপিটালে তাঁর কাছে বসেছিলেন মোহিতবাবু। তিনি বললেন, 'ডাক্তারবাবু বলেছেন আপনার নার্ভের উপর খুব চাপ পড়েছে। আপনাকে স্ট্রিক্টলি এক সপ্তাহ বিশ্রাম নিতে হবে ওকোনওরকম দুশ্চিন্তা করবেন না। আপনাকে পুরো এক সপ্তাহ স্যালাইনও নিতে হবে।

এমন সময় একজন নার্স এসে বলল, 'ফ্রাঙ্কফুর্ট শহর থেকে দুজন ভদ্রলোক জ্যোতির্ময়বাবুর সঙ্গে জরুরি দরকারে দেখা করতে এসেছেন।'

জ্যোতির্ময়বাবু একটু অবাক হয়ে বললেন— আচ্ছা, আপনি ওদের পাঠিয়ে দিন। আমি কথা বলব।'

মোহিতবাবু বিদায় নেবার সঙ্গে সঙ্গেই দরজা খুলে দুজন সাহেব ভেতরে ঢুকলেন। প্রথমজনের পরনে নীল স্যুট প্যান্ট, চোখে চশমা ও হাতে পাইপ। তিনি বললেন, 'আমি ফ্রাঙ্কফুর্ট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আসছি। আমার নাম ফ্রেডরিক হান। ওখানকার প্রকৃতি বিজ্ঞানের অধ্যাপক। গত নভেম্বরে 'সায়েন্স' পত্রিকায় আপনার লেখা পড়ে বিজ্ঞানী মহলে হইচই পড়ে গেছে। আপনার যুগান্তকারী এই আবিষ্কারের জন্য আমাদের সংস্থা আপনাকে ডক্টরেট উপাধিতে ভূষিত করবে। ইন্ডিয়াতে আমি ও আমার সহকারী পিটার লিস্ট্রি আপনার খোঁজে এসে দেখি আপনি অসুস্থ।'

'এই নিন আমাদের ইনভিটেশন কার্ড।' জ্যোতির্ময়-বাবু দেখলেন কার্ডে তাঁর নাম লেখা আছে। আবেগে তাঁর চোখে জল এল। তিনি উপলব্ধি করলেন, পুরস্কার বড় কথা নয়। তিনি যা করেছেন তা প্রকৃতির মানুষের প্রতি অবদানের সামান্য ঋণশোধ মাত্র।

গুপ্তধন

সুমিত সুরাই

গ্রাহক নং ৩০৮১ বয়স ১৪ বছর

হাইওয়ে দিয়ে দুরন্ত বেগে ছুটে চলেছে একটি আম্বাসাডর। গাড়ির পিছনের সিটে বসে আছেন কলকাতার নামী ব্যবসায়ী শ্রীধর গুপ্ত। আপাতত তাঁর মন যে খুব প্রসন্ন নয় তা তাঁর মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে।

কিন্তু আজ সকালে যখন তিনি বাড়ি থেকে বার হচ্ছিলেন তখনও তিনি যথেষ্ট হাসিখুশি ছিলেন এবং অফিসেও তার ব্যতিক্রম ঘটেনি। আসলে ঘটনাটা ঘটল যখন বিকালে অফিস থেকে বেরিয়ে আসছেন। হঠাৎই ফোন। ফোন ধরতেই ওধারে ওঁদের গ্রামের চাকর বাবুর

গলা পেলেন। খবর শুনেই চিন্তিত হয়ে ওঠেন শ্রীধরবাবু, গ্রামের বাড়িতে বাবার খুবই অসুখ। কিছুক্ষণ ভেবেই বাড়িতে স্ত্রীকে ফোন করে বলেন যে জরুরি কাজে আজ তিনি বাড়ি ফিরতে পারবেন না। অফিস থেকে বেরিয়েই ড্রাইভারকে তিনি হাওড়ায় দিকে চালাতে বললেন।

মাঝে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে পড়েছিলেন শ্রীধরবাবু। ধড়ফড় করে উঠে দেখলেন গাড়ি তাঁদের বাড়ির গেট পার হয়ে যাচ্ছে। গাড়ি থামতেই চটপট বেরিয়ে পড়েন শ্রীধরবাবু। দুটো করে সিঁড়ি টপকে টপকে উঠতে থাকেন। দোতলায় উঠেই কোণের ঘরের দিকে ছুটে যান তিনি। ঘরে দেওয়ালের ধারে একটা খাটে এক বৃদ্ধ মুমূর্ষ অবস্থায় পড়ে আছেন। শ্রীধরবাবুকে দেখে একটু হাসেন বৃদ্ধ। একটু এগিয়ে খাটের পাশের টেবিলের দিকে নজর পড়ে শ্রীধরবাবুর। টেবিলে প্রেসক্রিপশন ছাড়া আর কিছুই নেই, আশ্চর্য। ডাক্তার এসেছিল ঠিকই, কিন্তু ওষুধ?

এমন সময় বাবু এসে ঢুকল ঘরে। বাবুকে দেখেই চেঁচিয়ে ওঠেন শ্রীধরবাবু 'কী করিসটা কী সারাদিন। ওষুধ আনিসনি কেন?

মনিবের ধমক শুনে মুহূর্তে চুপসে যায় বাবু, আস্তে আস্তে বলে, 'এজ্ঞে আমার ভাই চপাকে দিয়ে কাল দুপুরেই তো ওষুধ আনতে পাঠিয়েছিলাম।'

বাঃ, তা হলে তোমার ভাইয়ের আশা ছেড়ে দাও— ও আর আসবে না!' তারপর পকেট থেকে টাকা বের করে বাবুকে দেন শ্রীধরবাবু। আমার গাড়ি নিয়ে যাও, যে করেই ডাক্তার নিয়ে এস।

বাবু বেরিয়ে যেতেই তিনি ঘুরে দেখেন বৃদ্ধ একদৃষ্টে চেয়ে আছেন তাঁর দিকে।

'ডাক্তার আনতে পাঠালি?'

'হ্যাঁ, শরীর কেমন এখন?'

'সে বলা তো ডাক্তারের কাজ। তার চেয়ে বরং তুই এখানে এসে বস। শ্রীধরবাবু বৃদ্ধের পাশে বসতেই, বৃদ্ধ বলতে থাকেন, 'তুই নিশ্চয়ই জানিস যে আমাদের পূর্বপুরুষেরা ছিল ডাকাতের বংশ। খাগুোয়া গ্রামের কাছে যখন পুলিশের গুলিতে আমার দাদু মারা যান, তাঁর লুণ্ঠিত বিশাল সম্পত্তির খোঁজ আর পাওয়া যায়নি। লোকে যাই বলুক, সেই গুপ্তধনের হদিস কিন্তু এই বাড়িতেই লুকানো ছিল। আমিই প্রথম তা আবিষ্কার করি। তুই ওই পাশের ড্রেসিং-টেবিলে দ্যাখ একটা লম্বাটে ও গোল কাঠের বল আছে। ওটা আন।'

শ্রীধরবাবু বলটা নিয়ে এসে দাঁড়ান বাবার খাটের পাশে। 'ওতেই আছে', বৃদ্ধ বলেন।

এমন সময়, দরজায় ডাক্তারের দেখা পাওয়া যায়। কাঠের বলটা পকেটে ঢুকিয়ে সরে দাঁড়ান শ্রীধরবাবু। ডাক্তার এসে পরীক্ষা করতে থাকেন। কিছুক্ষণ পরে বলেন, 'এনাকে তো মনে হয় কোনওওষুধই খাওয়ান হয়নি। আমি আবার লিখে দিচ্ছি, এক্ষুনি আনাবার ব্যবস্থা করুন।'

ডাক্তারের কথা শুনে সঙ্গে সঙ্গেই নীচে নেমে যান শ্রীধরবাবু। বাবুকে বলেন, 'ডাক্তারবাবু লিখে দিচ্ছেন, এক্ষুনি ডাক্তারখানা থেকে নিয়ে আয় ওষুধ।' কিন্তু দোতলায় উঠতেই দেখলেন ঘর থেকে বেরিয়ে আসছেন ডাক্তারবাবু।

শ্রীধরবাবুকে দেখে তিনি বললেন, 'আই অ্যাম্ সরি— আমার সত্যিই কিছু করবার ছিল না।'

গত কয়েকদিন ধরেই কাজের চাপ যাচ্ছে শ্রীধরবাবুর ওপর। এতদিনে কাঠের বলটার কথা একেবারেই ভুলে গিয়েছিলেন শ্রীধরবাবু। আজ হঠাতই আলমারি খুলতে গিয়ে বলটা মাটিতে পড়ে গেল। তুলতে গিয়ে দেখেন বলটা ভেঙে দু-টুকরো হয়ে গেছে। ভিতরে একটা সাদা কাগজ দেখা যাচ্ছে। কাগজটা নিয়ে বিছানায় বসে পড়ে শ্রীধরবাবু। গুপ্তধনের হদিসই বটে।

সে দিন রাতেই একা একা বাবার ঘরে চলে এলেন শ্রীধরবাবু। ড্রেসিং টেবিলের ড্রয়ারটা ঠেলতেই উল্টে গেল পুরো ড্রেসিং টেবিলটা। নীচে একটা সিঁড়ি— এই সিঁড়ি দিয়ে নীচে যে ঘরটায় শ্রীধরবাবু পৌঁছলেন তাকে যে কেউ ব্যাঙ্কের ভল্ট বলে ভুল করতেই পারে।

পরদিন সকাল হতেই টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়েন শ্রীধরবাবু। এই টাকা তিনি সরকারের হাতে তুলে দেবেন। যে গরিবের কাছ থেকে লুট করা হয়েছিল, তাদের জিনিস, তাদেরই ফিরিয়ে দেবেন তিনি।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

এমন কী দূর!

শৈলেনকুমার দত্ত

মুকুন্দপুর এমন কী দূর!
পাশের গ্রামের গাঁ ঘেঁষে
দাও না হাঁটা ওই তো গাঁ-টা
বুঝবে কি তা না এসে!
একটু গেলে বাগান মেলে
বাঁ-দিক ঘুরে পোস্টাপিস
সেখান থেকে একটু বেঁকে
হাট না-পেলে দোষটা দিস!
ডানদিকে গাছ ঘরের কানাচ
মাঝখানে যে লম্বা পথ
ওইটা ঘুরে দু'ক্রোশ দুরে
পড়বে ডাঙা, কয় বিঘৎ!
দশটা বাড়ি গাছের সারি
মাইল সাতেক পার হলে
মুকুন্দপুর এমন কী দূর!
ওই দেখা যায় যাও চলে।

ঘাসফুল

রমিতা সেনগুপ্ত

আপন মনে পা ছড়িয়ে একলা ধুলোর পরে
পথের শিশু পথের ধারে ধুলোর প্রাসাদ গড়ে
পদাতিকের ব্যস্ত চলার বে-দম পায়ের ঘায়
ধুলোয় গাঁথা স্বপ্নপুরী নিত্য ভেঙে যায়;
তবুও জাগে ধুলোর পরে সজীব সতেজ প্রাণ!
রুক্ষ মাটির শাসন ভাঙা শ্যামল জয়গান!

কঠিন পৃথিবীকে তারই স্বপ্নে কোমল করে,
একলা শিশু শূণ্যে মনের রঙ দিয়েছে ভরে
তার চোখে মা রুক্ষ্ম কেশে জীর্ণ বেশেও রাণী,
শীর্ণ মুঠির দুই মুঠো ভাত অমৃত দেয় আনি।

রুক্ষ্ম পথের ধূসর ধূলায় ঘৃণার তলে বাস,
তবুও প্রাণের কোন যাদুতে স্বপ্ন দেখে ঘাস?
গন্ধহারা স্বপ্নে ফোটে নামহারা তার ফুল!
বাস্তবতার ধূলার ধরায় এ কোন ভীষণ ভুল!

রাতের তারায় আকাশ সাজায় আলোর অভয় বাণী
ধুলার শিশু গড়ে চলে স্বপনসৌধখানি।
ভালবাসার নীরব ভাষায় ভরা বুকের কাছে
টেনে তাকে, মা বলে, তার আলোয় দাবী আছে।

ছবি : শিবশঙ্কর ভট্টাচার্য

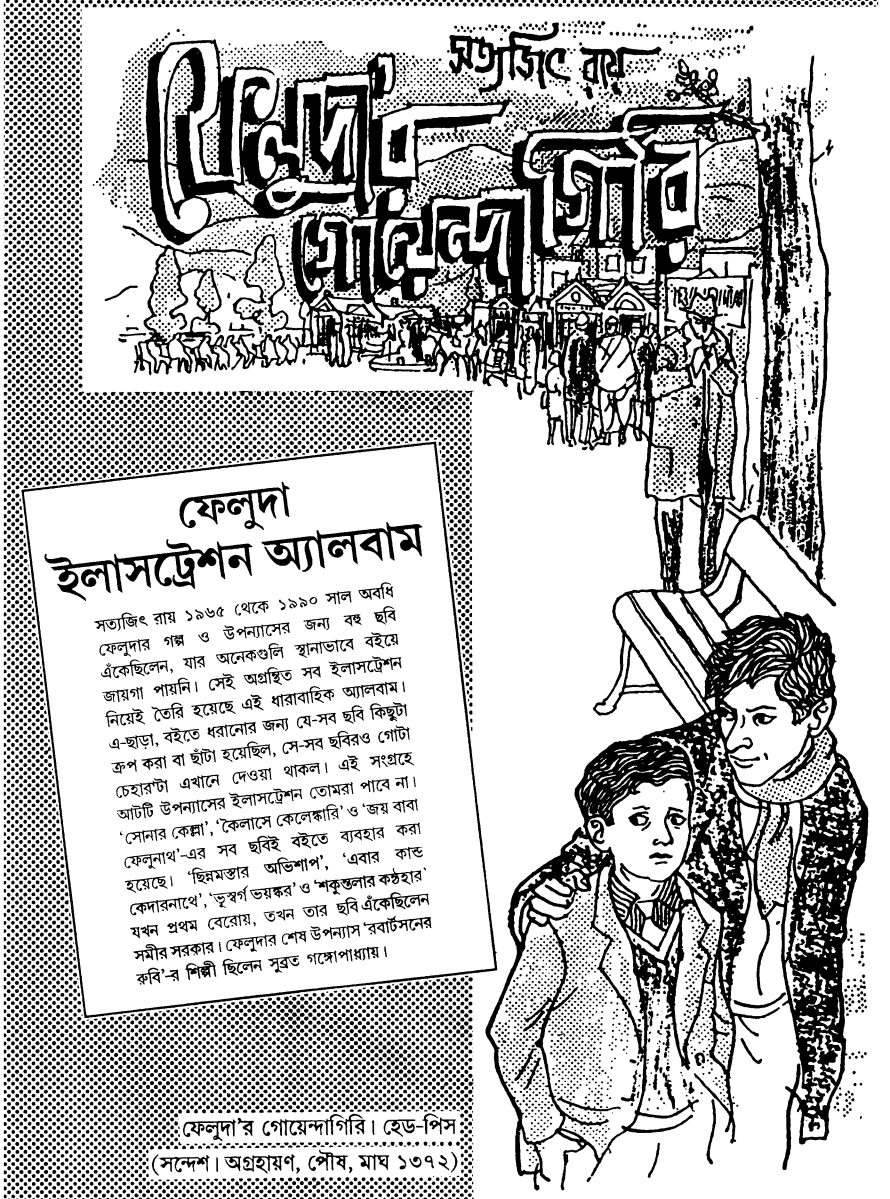

ফেলুদা ইলাসট্রেশন অ্যালবাম

সত্যজিৎ রায় ১৯৬৫ থেকে ১৯৯০ সাল অবধি ফেলুদার গল্প ও উপন্যাসের জন্য বহু ছবি এঁকেছিলেন, যার অনেকগুলি স্থানাভাবে বইয়ে জায়গা পায়নি। সেই অগ্রন্থিত সব ইলাসট্রেশন নিয়েই তৈরি হয়েছে এই ধারাবাহিক অ্যালবাম। এ-ছাড়া, বইতে ধরানোর জন্য যে-সব ছবি কিছুটা ক্রপ করা বা ছাঁটা হয়েছিল, সে-সব ছবিরও গোটা চেহারা'টা এখানে দেওয়া থাকল। এই সংগ্রহে আটটি উপন্যাসের ইলাসট্রেশন তোমরা পাবে না। 'সোনার কেল্লা', 'কৈলাসে কেলেঙ্কারি' ও 'জয় বাবা ফেলুনাথ'-এর সব ছবিই বইতে ব্যবহার করা হয়েছে। 'ছিন্নমস্তার অভিশাপ', 'এবার কান্ড কেদারনাথে', 'ভূস্বর্গ ভয়ঙ্কর' ও 'শকুন্তলার কণ্ঠহার' যখন প্রথম বেরোয়, তখন তার ছবি এঁকেছিলেন সমীর সরকার। ফেলুদার শেষ উপন্যাস 'রবার্টসনের রুবি'-র শিল্পী ছিলেন সুব্রত গঙ্গোপাধ্যায়।

ফেলুদা'র গোয়েন্দাগিরি। হেড-পিস
(সন্দেশ। অগ্রহায়ণ, পৌষ, মাঘ ১৩৭২)

সত্যজিৎ রায়

বাক্স-রহস্য

বাক্স-রহস্য। হেড-পিস (দেশ। শারদীয়া ১৩৭৯)

সমাদ্দারের চাবি। হেড-পিস (সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৮০)

সমাদ্দারের চাবি। (সন্দেশ। শারদীয়া ১৩৮০)

সমাদ্দারের চাবি। (সন্দেশ : শারদীয়া ১৩৮০)

রয়েল বেঙ্গল রহস্য

গোয়েন্দা ফেলুদার
রহস্য অ্যাডভেঞ্চার

সত্যজিৎ রায়

রয়াল বেঙ্গল রহস্য। হেড-পিস (দেশ। শারদীয়া ১৩৮১)
বইতে বানান বদলে 'রয়েল বেঙ্গল রহস্য'।

রয়াল বেঙ্গল রহস্য। (দেশ। শারদীয়া ১৩৮১)

রকেট অন্তর্ঘাত রহস্য

অমিতানন্দ দাশ

নাইট শো-তে সিনেমা দেখার জন্য বাস-স্টপে পৌঁছেছিল অঞ্জন, কিন্তু বাদ সাধল পকেটের পেজারের 'ক্যাঁ-ক্যাঁ' চিৎকার। ক্যালকুলেটরের মতো যন্ত্রটা সর্বদা পকেটেই থাকে অঞ্জনের, এখন তার স্ক্রিনে ফুটে উঠেছে ; 'আরজেন্ট মেসেজ ফ্রম ডাইরেক্টর—রিসিভ কল্ ইন্ অফিস'। দিল্লি থেকে তলব, অফিসে ফিরতে হল ওকে।

পড়াশোনা, খেলাধুলো দুয়েতেই এলেম ছিল অঞ্জনের। পদার্থবিদ্যায় এম.এসসি ও কয়েকবছর গবেষণার পর ডক্টরেট দুরস্ত দেখে, চাকরি খুঁজতে শুরু করে সে। এই চাকরিটা পায় বছরখানেক আগে, এক গুপ্তচর-বিরোধী বিভাগে গোয়েন্দার কাজ। প্রযুক্তিবিদ্যা সংক্রান্ত গোয়েন্দাগিরির জন্য গবেষণার অভিজ্ঞতা-সম্পন্ন বুদ্ধিমান অথচ তাগড়াই ছেলে-ছোকরা খুঁজছিল ওরা।

বছরখানেক বিচিত্র প্রশিক্ষণ। আঙুলের ছাপ, মানুষের মুখ-দাঁত-হাড়-শরীরের গঠন, ছদ্মবেশ...গোয়েন্দার শিক্ষা। গুলি-ছোড়া, অন্যান্য অস্ত্র, কারাতে। পি.টি, দৌড়, বনে-পাহাড়ে দিনে-রাতে বিস্তর হাঁটাহাটি। গোয়েন্দাসুলভ ক্যামেরা, রেডিও, রেকর্ডার ইত্যাদি যন্ত্রপাতি ব্যবহার...।

মাসখানেক আগে পার্ক স্ট্রিটের দক্ষিণে পুরনো একটা সাহেবি বাড়ির চারতলায় কলকাতার নতুন অফিসে যোগ দিয়েছে অঞ্জন। আজ বন্ধুদের সঙ্গে সিনেমা দেখার কথা, কিন্তু এখন স্বয়ং ডাইরেক্টরের ট্রাঙ্ককলে নির্দেশ—জরুরি অনুসন্ধানে বেরবার জন্য রাত ন'টায় এয়ারপোর্ট হোটেলে হাজিরা দিতে হবে। একটা ছোট সুটকেসে কাজে বেরবার জিনিস অফিসেই রাখা ছিল। সিনেমা জলাঞ্জলি দিয়ে, বাড়িতে ফোন করে, ট্যাক্সি ধরল অঞ্জন।

...সায়েন্স সিটি... বাইপাস... স্টেডিয়াম... উল্টোডাঙা... লেকটাউন—অঞ্জন এ বার জেম্‌স্ বন্ড হবে, ভাবতে ও হাসি পেল ওর।

এয়ারপোর্ট হোটেল পাঁচতারা নয়, তবু এ রকম ঝকমকে হোটেলে বিশেষ ঢোকেনি অঞ্জন। রেস্তোরাঁতে স্যুট পরা এক ছোকরা দুজনের টেবিলে বসাল ওকে, হাতে ধরিয়ে দিল বড়সড় বাঁধানো অ্যাটলাসের মতো চকমকে মেনু। কথা মতো একারই খাবারের অর্ডার দিল অঞ্জন।

বিচিত্র দেশি-বিদেশি মানুষের সমাবেশ। ড্রাইনে দূরে জনাকয়েক জিন্‌স ও রংচঙে শার্ট পরা বুড়োবুড়ি, বোধহয় মার্কিন ট্যুরিস্ট। সামনে নীল পিনস্ট্রাইপ স্যুট-পরা তিনজন নাকচ্যাপ্টা ব্যবসাদার, তাদের বড়বড় চামড়ার ব্রিফকেসে চকচকে গোল্ডপ্লেটেড লক। বাঁ দিকে এক সর্দারজি-পরিবার হই-হুল্লোড় করছে, বোধহয় বিদেশ থেকে ছেলে-বৌ এসেছে।

'হ্যালো! মিস্টার দত্ত!' টেবিলের সামনে এক বেঁটে কালো দক্ষিণ ভারতীয় ভদ্রলোক। অঞ্জন দাঁড়িয়ে উঠে করমর্দনের পর উনি বসে পড়ে বললেন, 'আমি ডেপুটি ডাইরেক্টর রঙ্গারাজু। আজ রাতে এই হোটেলেই থাকবেন। কাল ভোর পাঁচটায় বেরতে হবে। সকালে আপনাকে অনুসন্ধানের বিষয়ে বুঝিয়ে দেব।'

শুধু স্যান্ডউইচ খেলেন উনি। উঠবার আগে বললেন, 'কংগ্রাচুলেশন্‌স্ মিস্টার দত্ত, কাল আপনার নতুন পেশাতে হাতেখড়ি হবে।'

রিসেপশনের বিশাল কাউন্টারে নাম বলতেই অঞ্জন পৌঁছে গেল দেশি মতে চারতলার ৩০৬ নম্বর ঘরে, রংচঙে উর্দি পরা বেয়ারা ওর সুটকেস রেখে সেলাম ঠুকল।

ভোররাতে টেলিফোনের আর্তনাদ! আঁতকে

লাফিয়ে উঠতেই, 'ইয়োর ওয়েক-আপ কল, মিস্টার দত্ত! উইল ইউ অর্ডার ব্রেকফাস্ট স্যর?'

মুখ ধুয়ে, গায়ে জল ছিটিয়ে, টোস্ট-অমলেট-চা—রিসেপশনে চাবি জমা দিতেই, পাশে এক বিমানবাহিনীর উর্দি পরা এন.সি.ও.। হোটেলের সামনেই জিপ, সোজা পৌঁছে দিল দমদমের রানওয়েতে, খয়েরিটে সবুজ রঙের হেলিকপ্টারের পাশে।

রঙ্গারাজু হেসে করমর্দন করে বললেন, 'ইয়োর ডে অব রেকনিং, মিস্টার দত্ত! হাতেনাতে এই কাজে প্রথম মাঠে নামবেন আজকেই।'

হেলিকপ্টারে চড়ে বসে বললেন, 'জামশেদপুরের কাছে গালুডি জানেন?'

সম্মতিসূচক মাথা নাড়ল অঞ্জন।

'এখন হেলিকপ্টারে গালুডি যাব। কতক্ষণ সময় লাগবে?'

সামনের কক্‌পিট থেকে মুখ বাড়িয়েছেন বিমানবাহিনীর পাইলট, দ্বিতীয় কথাটা তারই উদ্দেশ্যে।

পাইলট বললেন, 'পঞ্চাশ মিনিট। আমরা প্রথমে যাব হুগলি নদী ধরে, তারপর রেললাইন বরাবর, আবার মাঝে কিছুটা জাতীয় সড়ক ও কংসাবতী নদী ধরে।'

'দত্ত কখনও হেলিকপ্টারে চড়েনি।' বলে রঙ্গারাজু অঞ্জনকে বোঝালেন, 'মেঘ-কুয়াশা না-থাকলে শুধু হেলিকপ্টার নয়, সব প্লেনের পাইলটই সাধারণত নদী, রাস্তা, রেলরাইন, উপকূল, শহর ইত্যাদি দেখেই প্লেন চালায়। তো শুনুন—যা বলছিলাম, গালুডিতে সামরিক রকেট গবেষণাগারেই আমাদের কাজ। ওড়িশা উপকূলের চাঁদিপুর থেকে যে সব পরীক্ষামূলক সামরিক রকেট উৎক্ষেপিত হয়, অধিকাংশেরই অ্যাসেমব্লি হয় গালুডিতে। ওখান থেকে—'

হেলিকপ্টারের ইঞ্জিন গর্জে উঠল, কথা বলা অসম্ভব! দুঃখসূচক মাথা নেড়ে অঞ্জনের দিকে ফাইলটা এগিয়ে দিলেন রঙ্গারাজু। অঞ্জন পড়তে শুরু করল—ত্রিভান্দ্রম থেকে আমেদাবাদ, বিভিন্ন জায়গা থেকে যন্ত্র ও যন্ত্রাংশ এসে জোড়া লাগানো হয় গালুডিতে। সম্পূর্ণ রকেট যায় চাঁদিপুরে, সেখানে শুধু নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারকে নির্দেশ দেওয়া হয়। বালেশ্বর অবধি রকেট যায় ট্রেনে, তারপর ট্রাকে—

'ঘড়-ঘড়-ঘড়-ঘড়' রোটরের শব্দ তীব্র হয়ে শূন্যে উঠল হেলিকপ্টার। হাতের ফাইল থেকে অঞ্জনের চোখ চলে গেল বাইরে। খুদে, আরও খুদে হয়ে আসছে শহরের বাড়িগুলো, লিলিপুটদের একটা ঘিঞ্জি শহর...হাজার মিটার উচ্চতায় যাচ্ছে ওরা। দমদম স্টেশন...বি.টি রোড...কাশীপুর তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র... ঘণ্টায় আড়াইশো কিলোমিটার বেগে। এ বার সামনে হাওড়া ব্রিজের বিশাল কাঠামো...বাঁয়ে অফিসপাড়া, ময়দান—দ্বিতীয় সেতু...বাঁয়ে বন্দরের ডক, ডাইনে বটানিক্‌স্‌।...কিছু পরে বাঁয়ে বজবজের শ'-খানেক বিশাল গোল গোল তেলের ট্যাঙ্কি... নদী ছেড়ে ডাইনে রেললাইন বরাবর...কোলাঘাটের তিন সেতু... বাঁয়ে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র... ডাইনে বম্বে রোড বরাবর গ্রামের দৃশ্য!

ফাইলে চোখ দিল অঞ্জন। রকেট চালান যাচ্ছে বক্স প্যাকিং কেসে, ঘিরে আর্মড গার্ড। কিন্তু রকেট চাঁদিপুরে পৌঁছল বিকল হয়ে, নিয়ন্ত্রণের কিছু গুরুত্বপূর্ণ যন্ত্রাংশ রহস্যময় ভাবে উধাও হয়ে গেছে মাঝপথে। পরপর তিনবার ঘটে এই রহস্য, সামরিক গোয়েন্দা বিভাগ অনুসন্ধান করেও রহস্যের সমাধান করতে পারেনি।

কংসাবতী বরাবর মেদিনীপুর ছাড়িয়ে লালমাটির দেশ। নদী ছেড়ে বাঁয়ে...শালবনের পর শালবন... জামশেদপুরের রেললাইনকে ওরা ধরল গিডনির পরে, ডাইনে দূরে পাহাড়, বাঁয়ে সুবর্ণরেখা কাছে এল, পাশে ৩৩ নম্বর জাতীয় সড়ক...ধলভূমগড়—এ বার বাঁয়ে নদী, ডাইনে সড়ক, মাঝে লাইন—প্রায় সমান্তরাল...ঘাটশিলা টাউন, মৌভাণ্ডারের কারখানা...ডাইনে রুক্ষ লালমাটির এবড়ো-খেবড়ো জমি, বাঁয়ে টানা সবুজ ধানখেত নদী অবধি। ইঞ্জিনের শব্দ পাল্টে গেল, নীচে নামছে। বড় বড় কয়েকটা সাদা-ছাই বাড়ি, শেড—পৌঁছে গেছে ওরা।

গালুডি রেলস্টেশনের পশ্চিমে সুবর্ণরেখা নদীতে বাঁধ। লাইনের দক্ষিণে কয়েকটা হোটেল, ট্যুরিস্ট স্পট। স্টেশনের উত্তর-পশ্চিমে লাইন ও রাস্তার মধ্যে বিরাট এলাকা জুড়ে কাঁটাতারে ঘেরা এই গবেষণাগার। বাইরের লোকের প্রবেশ নিষেধ, কর্মচারীরা থাকেন লাগোয়া কোয়ার্টারে।

॥ ২ ॥

রোটর ঘোরার বেগ কমতেই মাঠে নেমে পড়ল ওরা। গাড়ির পাশে দাঁড়িয়ে চিফ সিকিউরিটি অফিসার মহম্মদ রফিক। প্রায় ছ'ফুট লম্বা, আনুপাতিক চওড়া কাঁধ। ফর্সা, মিলিটারি চেহারা, বড়সড় গোঁফ, গায়ে কালচে-সবুজ উর্দি। বললেন, 'গেস্ট হাউসে প্রাতরাশ করবেন। চলুন, ওখানেই কথা হবে।'

ডাইনিং রুমে চারজনের কাঁটাচামচ সাজানো চেবিলে বসে রঙ্গারাজু বললেন, 'বুঝলে দত্ত, রফিক সাহেবের পরিবার এককালে পাঠান হলেও, এখন ওনাকে বাঙালিই বলা চলে।'

রফিক বাংলায় বললেন, 'জিয়াগঞ্জে আমাদের বাস তিনশো বছরের বেশি।'

'রফিকজি, পরিস্থিতির কোনও পরিবর্তন হয়েছে?' প্রশ্ন করলেন রঙ্গারাজু।

'না। কোনও কিছুই সমাধান হয়নি। ও দিকে দুটো রকেট পাঠাতে হবে চাঁদিপুরে।'

যোগ দিলেন প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার মুকুন্দ যোশী। বয়স চল্লিশের কাছাকাছি, রোগা-পাতলা চেহারা, চোখে চশমা। এখন চোখ-মুখে উৎকণ্ঠার ছাপ, তাড়াহুড়োয় ভাল করে দাড়ি কামানো হয়নি। বললেন, 'সমাধান না হলে এ বার ভারতীয় রকেট প্রযুক্তিবিদ্যা বিশেষভাবে বিঘ্নিত হবে। এই প্রোজেক্ট—'চক্র'—যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহারের একশো কিলোমিটার পাল্লার রকেট। ভবিষ্যতের যুদ্ধে দূরপাল্লার কামানের বদলে এই ধরনের রকেট ব্যবহার হবে অনেক বেশি।'

'চক্রের বিষয়ে আমাদের সংক্ষেপে বুঝিয়ে বলুন।' বললেন রঙ্গারাজু।

'চক্র তিন মিটার লম্বা। তলায় মিটার-দুয়েক রকেট ইঞ্জিন ও কঠিন জ্বালানি। উপরের এক মিটার 'পে-লোড', অর্থাৎ যুদ্ধের সময়ে বিস্ফোরক থাকবে ওখানে। আপাতত পরীক্ষামূলক রকেটে নিয়ন্ত্রণ কম্পিউটারের সঙ্গে ওখানে থাকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিভিন্ন সরঞ্জাম। এই ধরনের রকেটের প্রযুক্তিবিদ্যায় অন্তত ছ'টি দেশ আমাদের চেয়ে এগিয়ে আছে। সামরিক বাহিনীর তাড়াতাড়ি রকেট দরকার। প্রোজেক্টের দেরি হলে দু-তিন হাজার কোটি টাকা বাড়তি খরচ করে বিদেশি রকেট কিনতে হবে সামরিক বাহিনীকে'!

'কবে পাঠাবেন রকেট?' প্রশ্ন করলেন রঙ্গারাজু।

'পরশুই পাঠাতে পারি, আপনারা বলুন।'

'সাড়ে সাতটা বাজে, ডাইরেক্টরের ঘরে যাওয়া যাক এই বিষয়েই ডেকেছেন।' বললেন রফিক, 'তবে হ্যাঁ, বিশেষত দত্তবাবুকে আগে বলে রাখি। ডাইরেক্টরের সামনে কিন্তু ভুলেও হিন্দিতে কোনও কথা বলবেন না। প্রেমনাথন হিন্দিভাষী উত্তর-ভারতীয়দের পছন্দ করেন না!'

অ্যাডমিনিস্ট্রেশন বিল্ডিং-এর দোতলার কোনার বড় ঘরের বিরাট টেবিলের উল্টো দিকে, চারটে গদি-আঁটা প্রায় সোফার মতো চেয়ার। ডাইরেক্টর প্রেমনাথনের ফর্সা, লম্বা, কাঠখোট্টা চেহারা অধিকাংশ দক্ষিণ-ভারতীয়ের মতো নয়। পরিচয়ের পর বললেন, 'রফিক সাহেব, দত্তবাবুকে সংক্ষেপে বলুন আগের অনুসন্ধানে যা জানা গেছে।'

'স্থানীয় কয়েকজন প্রভাব-প্রতিপত্তিশালী লোককে সন্দেহ হচ্ছে।' বললেন রফিক, 'প্রথমত ভি পি. নাগরমল। এনাকে পুলিশ কয়েকবার বিভিন্ন চোরাকারবারে জড়িত বলে সন্দেহ করেছে, কিন্তু প্রমাণের অভাবে কখনওই ধরতে পারেনি। তারপর দিগম্বর সিঙের গুণ্ডাবাহিনী তো জামশেদপুর থেকে যদুগোড়ার মধ্যে সব রকম কুকর্মে—'

'কে কে বিদেশে যাতায়াত করে বলুন।' বাধা দিলেন রঙ্গারাজু।

'নাগরমল যায়, দিগম্বর যায় না। এর গুরুত্ব আছে কী?'

'আমরা খবর পেয়েছি একটি বিদেশি রকেট নির্মাতা কোম্পানিকে কোনও ভারতীয় জানায় যে দশ লাখ ডলারের বিনিময়ে সে এই প্রোজেক্টকে অন্তত এক বছর দেরি করিয়ে দিতে পারে। এই কোম্পানি টাকা দেয়নি, কিন্তু আরও তিনটে কোম্পানির স্বার্থ আছে রকেট বেচতে। তা ছাড়া ভারতের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন কোনও দেশের সরকারও এই কাজ করাতে পারে। যে বা যারা এই স্যাবোটেজ করছে, তাদের বড় দল, বিস্তর পয়সা, প্রচুর স্থানীয় প্রতিপত্তি ও বিদেশে যাতায়াত আছে।'

রফিক বললেন, 'বিদেশের ব্যাপারটা যোগ করলে, তিনজনকে প্রধানত সন্দেহ হয়। নাগরমলের কলকাতার প্লাইউড কারখানার জন্য বোর্নিও-সুমাত্রা থেকে গাছের গুঁড়ি আমদানি হয়। স্থানীয় জমিদার তেজেন্দ্র সিং লাক্ষা রপ্তানি করতে বিদেশে যাতায়াত করেন। এন. আর. আই অরূপরতন চক্রবর্তী বহু বছর বিদেশে বহু পয়সা কামিয়ে, এবার দেশে ফিরে গালুডিতে একটা হোটেল খুলেছেন। প্রচুর জমি কিনছেন নতুন কোনও প্রোজেক্টের জন্য।'

'এরা সবাই কোটিপতি?'

'বিলক্ষণ! বহু কোটির মালিক প্রত্যেকে!'

'দলবল লোকলস্কর আছে?'

'কিছু আছে। আর দরকার পড়লে এখানে গুণ্ডার দল ভাড়া করা তো জলভাত ব্যাপার!'

'তা হলে সাস্‌পেক্টের তালিকার উপরে রইলেন এই তিনজন। এঁদের বিষয়ে তথ্য রফিক সাহেবের কাছে আছে নিশ্চয়?'

মাথা নেড়ে তিনটে পাতলা ফাইল বের করে রঙ্গারাজুর হাতে দিলেন রফিক।

'কিন্তু এই গবেষণাগারের ভিতরের কিছু লোকও নিশ্চয়ই ওই দলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে।

'এখানে একদম আটকে গেছি!' মাথা নাড়লেন রফিক।

'রঙ্গারাজু আর দত্ত গবেষণাগারটা একবার ঘুরে

দেখে নিন।' বললেন প্রেমনাথন।

বিস্তীর্ণ গবেষণাগারে একটা চক্কর মেরে, শেষে সবচেয়ে গোপনীয় এলাকার দরজা খুলতে, যোশী নিজের হাতের তেলো ঠেকালেন দরজার গায়ে আটকানো একটি সবুজ রঙের পাতের গায়ে। ভেসে এল কম্পিউটারের কণ্ঠস্বর: 'হাতের ছাপ মিলেছে, প্রিন্সিপাল ইঞ্জিনিয়ার সি. আর. যোশী।'

ঢুকতেই, তৎক্ষণাৎ আপনা-আপনি বন্ধ হয়ে গেল দরজা।

রঙ্গারাজু অঞ্জনকে বললেন, 'হাত ঠেকাও। ওর থতমত ভাব দেখে বললেন, 'তোমার হাতের ছাপ আজ সকালেই এই কম্পিউটারে লোড করা হয়েছে।'

হাত ঠেকাতেই কম্পিউটার বলল, 'হাতের ছাপ মিলেছে, সিনিয়র টেকনিক্যাল অফিসার এ.কে.দত্ত।'

ঘরে কর্মরত তিনজনের পরিচয় দিলেন যোশী, 'এঁরা সিনিয়র ইঞ্জিনিয়ার অশোক ভার্গভ, কুহেলি সেনগুপ্ত আর উইলিয়াম ম্যাথিউস্'।

ঘরের মাঝখানে রাখা রকেটের সামনের ছুঁচালো অংশের কাঠামোর মধ্যে ঠাসা হাজার হাজার যন্ত্রাংশ, বিশ রকম রঙের শয়ে শয়ে তার দিয়ে জোড়া। ঘর ঠাসা যন্ত্রপাতি, কত কোটি টাকা দামের কে জানে—সবই বিভিন্ন তার দিয়ে জোড়া রকেটের সঙ্গে।

'রকেটের পরীক্ষা চলছে।' বোঝালেন যোশী।

পরের ঘরে কোনও লোক নেই। শুধু ট্রলিতে শোয়ানো দেড় মানুষের বেশি লম্বা—এই নাটকের নায়ক—'চক্র'। পাশে দোতলা হাইটের শেডে রকেটকে বাক্সবন্দি করে চালান দেওয়া হয়।

'গত চার মাস ধরে এই বিভাগের রকেট অ্যাসেম্ব্লির শেষ পর্যায়ের কাজ আমি ব্যক্তিগত ভাবে দেখছি।' বললেন যোশী, 'মোট ছ'জন এই বিভাগে, সকলেই খুব বিশ্বস্ত। কেউ এর মধ্যে একদিনও গবেষণাগার চত্বরের বাইরে যাইনি। আর সকলের উপরেই কড়া নজর রাখছেন রফিকের লোকেরা। তা সত্ত্বেও—'

দুপুরে গবেষণাগার থেকে বেরিয়ে, রঙ্গারাজু আর অঞ্জন জাতীয় সড়ক ধরে এগোলেন ঘাটশিলার দিকে। লোকালয় ছাড়িয়ে রাস্তার ধারে একটা টিপি দেখিয়ে রঙ্গারাজু বললেন, 'ওখানে বসা যাক।'

দুটো পাথরে মুখোমুখি বসার পর বললেন, 'গবেষণাগারের কাউকেই পুরো বিশ্বাস করবে না, বুঝলে?'

'রফিক, যোশী—কাউকে না?'

'দেওয়ালেরও কান আছে, তাই না? যেখানে স্পাই আছে জানো, রক্তমাংসের কান তো আছেই, উপরন্তু যান্ত্রিক কানও থাকতে পারে।'

'এত কথা বললাম যে ওখানে বসে?'

'ওর অধিকাংশ পুরনো কথা, জানা কথা। এরপর কী করবে সে কথা জানাজানি হলে, আগের মতোই অনুসন্ধান ব্যর্থ হবে। এটা তোমার প্রথম অনুসন্ধান—কোন পথে এগোবে চিন্তা করেছ?'

'রকেট বাক্সে ঢোকা থেকে চাঁদিপুর পৌঁছনো অবধি—কোথায় কী ঘটছে, জানা দরকার। ভাবছি, রকেটের পাশে দ্বিতীয় আরেকটা প্যাকিং কেস চাপিয়ে, তার ভেতরে আমি থাকব।'

'ভাল প্রস্তাব, ব্যবস্থা করছি। তবে সর্বদা মনে রাখবে, গবেষণাগারের এক বিভাগের একজনের সঙ্গে কোনও গোপন কাজ করলে, অন্য কেউ যেন কিছু জানতে না-পারে। ওই তিনজন সাস্পেক্টের উপরেও চোখ রাখা শুরু করো। আর হ্যাঁ, গবেষণাগারের বাইরে যথাসম্ভব ছদ্মবেশে চলাফেরা করবে।'

'এই তিনজনের বাইরে অনুসন্ধানের দরকার নেই?'

'মনে হয়না। এদের একজন দলের মাথা না হলেও অন্তত ডান হাত হবেই। এদের সব টেলিফোন 'ট্যাপ' করে কথা রেকর্ড করার ব্যবস্থা করছি।'

'সবাই তো স্থানীয় বাসিন্দা?'

'নাগরমলের বাড়ি ঘাটশিলা টাউনে, স্টেশনের কাছেই। তেজেন্দ্র সিঙের গালুডির বাড়ি—ওই যে, রেললাইনের ও পারে পাঁচিল-ঘেরা বাগানের মধ্যে। চক্রবর্তীর বাড়ি'—ডান দিকে হাত তুলে দেখালেন, 'স্টেশনের পশ্চিমে টিপির ওপর ওই আধুনিক বাংলোটা।'

॥ ৩ ॥

লোকটার পরনে ময়লা হাতকাটা গেঞ্জি আর ছেঁড়া সবুজ লুঙ্গি। পায়ে পুরনো চপ্পল, মাথায় উস্কোখুস্কো চুলে ময়লা গামছা জড়ানো। এ রকম চাষাভুষো লোককে একবার আড়চোখে দেখে, দ্বিতীয়বার তাকিয়ে দেখবে না কেউ। গালুডি স্টেশন থেকে লাইন ধরে পশ্চিমে আধ কিলোমিটার-টাক গিয়ে ডাইনে মেঠো পথ ধরল লোকটা। একটু এগিয়ে বাঁ দিকে একটা কাঁটাঝোপের ভিতর গুঁড়ি মেরে ঢুকে গেল সে। তার পুঁটুলি থেকে এ বার কিন্তু বেরল একটা শক্তিশালী বাইনোকুলার। ওটা দিয়ে টিলার উপর চক্রবর্তী-ভিলাকে পর্যবেক্ষণ করতে লাগল ছদ্মবেশী অঞ্জন।

ছ-সাত বিঘা বাগানের মধ্যে এয়ার-কন্ডিশান্ড দোতলা বাংলো। চারদিকে উঁচু কাঁটাতারের বেড়া। টিলাকে চক্কর মেরে মাথায় উঠেছে কাঁকর-রাবিশ-ফেলা রাস্তা। দুটো গ্যারেজ। বাগানে অসংখ্য বাহারে ফুলগাছে নানারঙা হাজার হাজার ফুল জ্বলজ্বল করছে বিকেলের রোদে।

একজন—মালি বোধহয়—কাজ করছে।... আধ ঘণ্টা-টাক বাদে বাগানের শেড থেকে বেরল দুজন। জিন্‌স্ আর চেকশার্ট পরে একজন —মহিলা—চক্রবর্তীর মেয়ে? নীল বুশশার্ট আর কালো ট্রাউজার্স পরে একজন—ফর্সা, মাথায় কদম ছাঁট, দাড়ি। হাত নেড়ে উত্তেজিত ভাবে কিছু বলছে। বাড়ির ভেতরে ঢুকে গেল দুজনে।... রোদ পড়ে গেল, অন্ধকার হয়ে আসছে।... একটা সিয়েরা গাড়ি চক্কর মেরে উঠল, মালি গেট খুলে দিল। নামলেন, গায়ে স্যুট, বোধহয় চক্রবর্তী স্বয়ং। দুজন বাড়ি থেকে বেরিয়ে গাড়ির কাছেই দাঁড়িয়ে কিছু কথা হল, তারপর বাড়িতে ঢুকে গেলেন সবাই।...

পাশের গাছের ডালে একটা খুদে যন্ত্র লাগিয়ে রেখে উঠে পড়ল অঞ্জন।

লাইন পার হয়ে বিশ মিনিটেই সে পৌঁছে গেল তেজেন্দ্র সিঙের বাড়ি 'মোতি বিলাস'-এর সদর দরজায়। পাশের নির্জন গলি ধরে এগিয়ে একটা আমগাছে চড়ল। একটা জুতসই ডালে পা ঝুলিয়ে বসে, আবার চোখে বাইনোকুলার লাগাল।... দোতলা বাড়ির প্রায় অর্ধেক জানলায় আলো। পিছনের একটা ঘরে, একতলায়, কয়েকটা খাটিয়া—সাত-আটজন লোক ধুতি-গেঞ্জি বা প্যান্ট-গেঞ্জি পরে বিশ্রাম করছে...

ধরা পড়লে প্রাণ বিপন্ন হবে। প্রায় আধঘণ্টা লক্ষ্য রেখে অঞ্জন নিশ্চিত হল বাগানে কোথাও কোনও পাহারা নেই। ডালটা ধরে একটু এগিয়ে, দু'হাত ধরে ঝুলে পড়ে, টুক্ করে লাফিয়ে সে নামল বাগানের ভিতর।

গেটে পাহারা, ঘর ভর্তি লোক—কিন্তু সারা বাগান ঝিঁঝির ডাক ছাড়া নিঝুম, নিঃশব্দ। ঝোপের আড়ালে আড়ালে বাড়ির কাছাকাছি পৌঁছল অঞ্জন। সামনে বৈঠকখানার জানলা। সাফারি স্যুট পরা লম্বা, কালো, গুঁফো লোকটা বোধহয় সিংজি স্বয়ং। ও পাশে পাজামা-পাঞ্জাবি পরা একটা বিশাল তাগড়াই লোক, তার বিরাট পাকানো গোঁফ। তৃতীয় লোকটির পরনে স্যুট-টাই, চোখে গোল্ডপ্লেটেড চশমা।

ভাঙাভাঙা কথা শোনা যাচ্ছে: 'চক্রবর্তী ভি দেঙ্গে, ঘাবড়াও মাৎ... লেকিন আগ্‌লি হপ্তেমে আস্‌লি কাম হোনা চাহিয়ে... নেহি, দো খোকা...ঠিক হ্যায়, আজ শো যাইয়ে, লেকিন সোচিয়ে...'

বাইরে থেকে গাড়ির শব্দ, গেট খুলল, ঝোপের মধ্যে একটা ছোট যন্ত্র লাগিয়ে সাবধানে পিছু হটল অঞ্জন। স্যুট-টাই পরা লোকটি বেরিয়ে গাড়িতে উঠল, বৈঠকখানার আলো নিবে গেল।

আবার গাছে চড়ে দেওয়াল টপকে বেরিয়ে গেল অঞ্জন।

পরদিন সকালে গালুডি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল এক ছোকরা। ঝাঁকড়া চুল, চোখে সানগ্লাস, কালো ট্রাউজার্স, রংচঙে শার্ট, তেরঙা জুতো। খড়্গপুরগামী ট্রেনে চড়ল, ঘাটশিলায় নেমে বাজার পার হয়ে সুবর্ণরেখার দিকে একটা সরু গলি ধরল সে। ঘিঞ্জি এলাকা ছাড়িয়ে বিঘা-দুয়েক জমির উপর নাগরমলের প্রাসাদোপম বাড়ি।

ছোকরা 'নাগরমল হাউস'-এর দারোয়ানের সঙ্গে আলাপ জমাল। তাকে সিগারেট খাইয়ে জিজ্ঞেস করল—বেদপ্রকাশজির সঙ্গে মোলাকাত করিয়ে দিতে পারবে কি না। বলল, সে স্থানীয় বেকার গ্র্যাজুয়েট, শুনেছে বেদপ্রকাশজির ব্যবসায় কিছু লোক নেওয়া হবে। দারোয়ানের খাটিয়ায় বসে কথা বলতে বলতে সিগারেট ও খৈনির বিনিময় হয়ে গেল কয়েকবার। পরস্পরের দেশ, খেত-খামার, গরু-ছাগলের কথা হতে হতে প্রায় আধঘণ্টা কেটে গেল। অর্থাৎ কিনা বহু কথা বানিয়ে বলতে হল শহুরে ছেলে অঞ্জনকে। ইতিমধ্যে এক এক করে ঢুকল অফিসের দশ-বারোজন কর্মচারী।

একটা অ্যামবাসাডর এসে দাঁড়াল, সবুজ ডোরা বুশশার্ট ও কালো ট্রাউশার্স পরা—আরে, এ যে গতকাল 'চক্রবর্তী ভিলা'র সেই লোকটি! দারোয়ান বলল, উনি আগরওয়ালজি, ঘাটশিলা অফিসের ম্যানেজার।

॥ ৪ ॥

গালুডিতে ফিরে নিজের বেশে যোশীর বিভাগে হাজির হল অঞ্জন। পরদিন রকেট চালান যাবে, আজই বাক্সবন্দি হবে ওটা।

বারোটায় কলকাতা থেকে ফোন নাগরমল হাউসে— 'পরশুদিন ব্যাঙ্কক থেকে এসে পৌঁছবে। সামনের হপ্তার মধ্যে কাজটা সেরে ফেলতে হবে। এ বার কেল্লা ফতে হবে বলে মনে হয়।...'

রঙ্গারাজুর সঙ্গে গোপন বৈঠক দুপুরে গবেষণাগারের অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ বিল্ডিঙের বিরাট খোলা ছাদে, এখানে কারও আড়িপাতার সুযোগ নেই। অঞ্জনের প্রশ্ন—চক্রবর্তী, তেজেন্দ্র, নাগরমল—কোনও-না-কোনও সূত্রে জোড়া সবাই। তা হলে কি সবাই একসঙ্গে চক্রান্ত করছে? যথেষ্ট তথ্য নেই, খবর সংগ্রহ করতে হবে।

'রাতের কাজের জন্য প্রস্তুত?' প্রশ্ন করলেন রঙ্গারাজু।

'যন্ত্রপাতি তৈরি আছে?'

'বাক্সে জোড়া হচ্ছে।'

দুপুর তিনটে। অরূপ চক্রবর্তী মুম্বইয়ে ফোন করলেন, 'আমরা তৈরি আছি। প্রোজেক্টের প্ল্যান রেডি। ও দিক থেকে পয়সাকড়ি যেন সময় মতো এসে পৌঁছয়, দেখো।'

বিকেলে বাক্সবন্দি হল অঞ্জন, দশ ঘণ্টা বন্ধ ঘরেই বাক্সবন্দি হয়ে থাকতে হবে। তিন দিকের ফুটোয় ক্যামেরা বসানো। এক-একটি ক্যামেরায় স্বয়ংক্রিয় ভাবে, দশ মিনিট অন্তর অন্তর, বাহাত্তরটি করে ছবি উঠবে। বোতাম টিপে কিছু বাড়তি ছবিও তোলা যাবে। উঁচুতে চতুর্থ ফুটোতে পেরিস্কোপ লাগানো—এই যন্ত্রটাকে কিছুটা ঘোরাবার ব্যবস্থা আছে।

অপেক্ষা, অপেক্ষা... রাত আটটা...নড়াচড়ার জায়গা নেই...ন'টা... ক্যামেরাগুলো কিছুক্ষণ বাদে বাদে খুট...খুট...দশটা...চব্বিশ ঘণ্টা এ ভাবে বসে থাকতে হবে...বারোটা...হাত-পা ব্যথা এর মধ্যেই...একটা...ঝিম্ আসছে...দুটো...

হঠাৎ! ওটা কী? একটা লোক, আবছা আলোতেও বোঝা যাচ্ছে গায়ে সিকিউরিটির উর্দি। টর্চ জ্বালিয়ে, যন্ত্রপাতি নিয়ে...বাক্স খুলে ফেলেছে, রকেটের প্যানেল খুলছে—কয়েকটা বাড়তি ছবি তুলল অঞ্জন। গায়ে কনস্টেবলের উর্দি, কিন্তু যথেষ্ট দক্ষতা আছে লোকটির, চটপট রকেটের কয়েকটি যন্ত্রাংশ খুলে ফেলল সে। রকেটের প্যানেল ফের জোড়া লাগাল, বাক্স বন্ধ করল।

যন্ত্রাংশগুলি থলিতে ভরে রকেটের বাক্সের উপরেই রেখে দিল। বেরিয়ে গেল।...তিনটে...বিশেষ কাজ-জানা গুপ্তচরকে সিকিউরিটিতে ঢুকিয়ে তাকে বিশেষ সময় বিশেষ ডিউটি দেওয়া হয়েছে...চারটে...

তেজেন্দ্র সিং হংকং-এ ফোন করছে, 'সামনের হপ্তায় পুরো রিপোর্ট নিয়ে দেখা করব। টপ ক্লাস জিনিস পাবেন আমাদের কাছে...'

পাঁচটা...জানলা দিয়ে আবছা আলো। ঘড়-ঘড়-ঘড় রোলিং শাটার খুলে গেল। ফর্ক-লিফ্ট ট্রাক, প্রথমে রকেটের বাক্সটাকে নিয়ে গেল। তারপর অঞ্জনের বাক্সকে। দুলছে, ডাইনে-বাঁয়ে, ধাক্কা—উঠছে, এগোচ্ছে। থামল, সামনেই রেললাইনে ফ্ল্যাট-ওয়াগন—কুলিরা হেঁইয়ো করে, লাফিয়ে, ধাক্কা খেয়ে, শেষে ওয়াগনে বসল বাক্স, নাইলনের মোটা কাছি দিয়ে বাঁধল। জনাদশেক আমর্ড গার্ড। ইঞ্জিন ধাক্কা মারল...পৌঁছল গালুডি স্টেশনের ইয়ার্ডে।

অপেক্ষা... ক্যামেরাতে ফিল্ম পরাল।... ছ'টা... এগোচ্ছে, পিছোচ্ছে, জোড়া লাগল মালগাড়িতে।...সাতটা...রওনা হল...থলিটা প্যাকিং কেসের উপরেই। রক্ষীরা দেখতে পাচ্ছে না ওটাকে, কারণ দেড় মানুষ উঁচু প্যাকিং কেস।

ঘাটশিলা পেরিয়ে একটা ব্রিজ, দু'পাশ থেকে গাছ ঝুঁকে পড়েছে লাইনের উপর। গাছের ছায়ায় আলো-আঁধারিতে সাঁৎ করে কী একটা নড়ে গেল উপর দিয়ে —থলিটা নেই—ছবি তুলল, শুধু জায়গাটা চিনবার জন্য। যা হবার হয়ে গেছে মুহূর্তে, এ বার শুধুই অপেক্ষা...ধলভূমগড়, আটটা... গিডনি...

ন'টা। কলকাতা থেকে নিউ ইয়র্কে ফোন, 'তোমাদের সঙ্গেই কাজ করব। তাড়াতাড়ি ফ্যাক্স করে জানাও, এ দিকের কাজের জন্য ফাইনান্সের ব্যবস্থা করতে হবে।...' বলল নাগরমল।

ঝাড়গ্রাম...দশটা...খড়্গপুর ইয়ার্ড, ঘুমিয়ে পড়ল অঞ্জন।... ঘুম ভাঙল, বিকেল পাঁচটা। গায়ে-হাতে ব্যথা। রূপসা, অন্ধকার হয়ে আসছে...সাতটা...বালেশ্বর, ইয়ার্ডে থামল...আটটা, বাক্স নড়ছে—ট্রাকে উঠল, চলল... ন'টা ...চাঁদিপুর—খুলে গেল, চিচিং ফাঁক, সামনেই রঙ্গারাজু। হাত তুলল অঞ্জন।

॥ ৫ ॥

তাড়াতাড়ি ফিল্ম ডেভেলাপের ব্যবস্থা। রঙ্গারাজুর সঙ্গে ছোট্ট বৈঠক। ঘুম!

রাত এগারোটা। অরূপ চক্রবর্তী টোকিওতে ফোন করছেন, 'আপনাদের লোকেরা এসে আমার হোটেলেই থাকবেন। সামনের মাসে দিন ঠিক করুন। এর মধ্যে একটা বড় টাকা এসে যাবে, তারপর আসল প্রোজেক্টটা চালু করব।'

ভোরে রওনা। বালেশ্বর ছাড়িয়ে বারিপাদার পথে রঙ্গারাজু বললেন, 'যোশীর বিভাগের ইঞ্জিনিয়াররা সম্ভবত বিশ্বাসী। তাই তোমাকে বাক্সে ভরার খবর পায়নি ওরা।'

'সিকিউরিটির লোক জড়িত, তা হলে রফিক কী?'

'হতে পারে, মাথায় রাখতে হবে। কিন্তু গালুডি-ঘাটশিলা অঞ্চলেই যখন সব ঘটছে, ওই তিনজনের উপর চোখ রাখা খুবই জরুরি।'

মাদ্রাজ যাবার পাঁচ নম্বর জাতীয় সড়ক, সুন্দর রাস্তা। বারিপাদার আধঘণ্টা পর ডাইনে ঘুরল ছ'নম্বর সড়কে, বম্বে রোডে।... বিহার-সীমান্ত, সুবর্ণরেখার ব্রিজ, বাহারাগোড়ায় বাঁয়ে তেত্রিশ নম্বর সড়ক—ট্র্যাফিক এ বার কম, হু-হু করে ছুটেছে ওরা... ধলভূমগড়ের ফ্লাই-ওভার ... বাঁয়ে ঘাটশিলা ... আড়াই ঘণ্টায় পৌঁছে গেল গবেষণাগারের ফটকে।

বাপ্ রে! মালগাড়িতে যেতে বারো ঘণ্টা লেগেছিল কাল।

রঙ্গারাজুর আর অঞ্জনের দুপুরে ছাদে বৈঠক। ছবিতে সিকিউরিটির লোকের মুখ চেনা যাচ্ছে না, পাতলা নাইলনের মুখোস পরা। উচ্চতা, দেহের গড়ন আন্দাজ করে সন্দেহ হল তিনজনকে। এদের বিষয়ে

অনুসন্ধান করতে হবে। কিন্তু সাবধানে, প্রতিপক্ষ খুবই বুদ্ধিমান ও শক্তিশালী।

খবর এসেছে তেজেন্দ্র সিঙের একশো বিঘা জমি কিনতে চান চক্রবর্তী, দরাদরি চলছে। নাগরমলের ম্যানেজার চক্রবর্তীর হোটেলে ঘর বুকিং করতে গেছিলেন, নাগরমলের অতিথিরা ওখানে থাকেন নিয়মিত। চক্রবর্তীর মেয়েই হোটেলের দৈনন্দিন কাজ দেখাশোনা করেন। জাকার্তার এক ব্যবসায়ী পরদিন আসছেন, নাগরমলকে সুমাত্রা থেকে গাছের গুঁড়ি চালান দেন ইনি।

দুপুর দুটো। তেজেন্দ্রর গাড়ি তেত্রিশ নম্বর সড়কের সুবর্ণরেখা সেতুর মাঝামাঝি দাঁড়াল। পাঁচ মিনিট পর বাইক চালিয়ে এসে দাঁড়াল একজন। প্রায় আধঘণ্টা থামা গাড়িতে বসে কথা হল দুজনের।

বিকেলে সেই ঝাঁকড়া-চুল ছোকরা ঘাটশিলা মেইন রোড ধরে টাউন পেরিয়ে পুব দিকে হাঁটা দিল। বাঁয়ে রেললাইন, ডাইনে কিছু দূরে সুবর্ণরেখা। ছোট ছোট নদীর উপর রাস্তা ও রেললাইনের পাথরের থামওয়ালা সেতু।

একটা সেতু প্রায় পঞ্চাশ মিটার চওড়া। কিন্তু নদীতে বালির বিস্তারের মাঝে শুধু সরু এক চিলতে জলের স্রোত। বাঁয়ে রেললাইনের দিকে গেছে গরুরগাড়ির কাঁচা পথ। সন্ধে হয়ে আসছে, চারদিকে মাঝে মাঝে খেত, কয়েকটা রুক্ষ পাথুরে ঢিপি, চৌহদ্দির মধ্যে লোকালয় নেই। নির্জন রেলসেতুর কাছে-পিঠে জনমানুষ নেই। গাছগুলোর নীচে, লাইনের উপর বেশ অন্ধকার। গাছের ডালে টর্চ মারল অঞ্জন। নদীর দিকে শেষ গাছটা বেয়ে উঠল, লাইনের উপর ঝুঁকে পড়েছে ডাল। ডাল বেয়ে এগোতেই সামনে নাইলনের দড়ি, লাইনের ইলেকট্রিক তারের উপর। দড়ির এক মাথা ডালে বাঁধা, অন্য দিকে দড়ির ফাঁস, আর একটা লোহার আংটা। এটা দিয়ে চলমান রেলগাড়ি থেকে থলিটাকে তুলে লাইনের ধারে ফেলা হয়েছিল নিশ্চয়ই।

রাত দশটা। চক্রবর্তী ভিলার বাগানে অ্যালুমিনিয়ামের ফোল্ডিং চেয়ারে বসে চক্রবর্তী আর এক জাপানি ব্যবসাদার, পাশের টেবিলে পানীয়ের গ্লাস।

'এ বার তোমার কপাল খুলে যাবে—'

রাত করেই লুঙ্গি-গেঞ্জি পরে বেরল অঞ্জন, তার উপর জড়ানো একটা ছেঁড়া, ময়লা, রং-ওঠা সবুজ চাদর। 'চক্রবর্তী ভিলা' আর 'মোতি বিলাস' থেকে গুপ্তচর- ক্যামেরাগুলো সংগ্রহ করে নিল সে। তেজেন্দ্রর বৈঠকখানার ধারের খোপ থেকে দেশলাই বাক্সের চেয়ে ছোট মাপের টেপ-রেকর্ডারটাও ফেরত আনল।

সকালে যোশী ও রফিকের সঙ্গে আলাদা করে বিস্তারিত ব্যবস্থা করলেন রঙ্গারাজু। যোশী ও ইঞ্জিনিয়ারেরা জোরকদমে কাজে লেগে গেলেন। মালগাড়ি ছাড়বে মাঝরাতে, বিকেল চারটের মধ্যে কাজ শেষ করতে হবে।

দুপুর একটা। থাই এয়ারলাইন্সের ৩১৩ নম্বর ফ্লাইট থেকে দমদম বিমানবন্দরে নামলেন আদম সুদোমো। হাতে ব্রিফকেস ছাড়া কোনও মাল নেই, গ্রিন চ্যানেল দিয়ে বেরিয়ে এসে নাগরমলের সঙ্গে হ্যান্ডশেক। নাগরমলের কন্টেসা ওদের নিয়ে গেল তাজ বেঙ্গল হোটেলে।

ছ'টার মধ্যে রকেট বাক্সবন্দি, যোশীর বিভাগে দোতলার ঘরের জানলা দিয়ে নীচের শেডে বাক্সের দিকে চোখ রাখছে অঞ্জন।

আটটা। তেজেন্দ্র সিং অধৈর্য হয়ে পায়চারি করছেন বৈঠকখানায়। বাড়ির সামনে একটা ম্যাটাডর, দুটো গাড়ি, পাঁচটা বাইক।

ন'টা। গবেষণাগারের মধ্যেই ঝোপে-ঝাড়ে লুকিয়ে আছেন রঙ্গারাজু আর তিনজন দিল্লি থেকে আগত গোয়েন্দা অফিসার।

দশটা ... অঞ্জন জানে এই রাতটা ওর জীবনে স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এগারোটা। নাগরমলের কন্টেসা বম্বে রোড ধরে খড়্গপুর বেলদা ছাড়িয়ে তীরবেগে ছুটে চলেছে বাহারাগোড়ার দিকে।

বারোটা। ... অঞ্জন সতর্ক রয়েছে, সময় ঘনিয়ে আসছে, এই ব্রহ্মমুহূর্ত ... শেডে ঢুকল একজন, বাক্স খুলছে—আজ অঞ্জনের কাজ শুধু চোখ রাখা। খুলল, যন্ত্রাংশগুলো থলিতে ভরল। বাক্স বন্ধ, থলি উপরে, নিঃশব্দে বেরিয়ে গেল।

রঙ্গারাজুর হাতের নির্দেশে দুজন গোয়েন্দা চুপিসারে পিছু নিল লোকটির। ধরার চেষ্টা করবে না এখনও।

রাত দেড়টা। ঘড়-ঘড়-ঘড় করে রাত কাঁপিয়ে রোলিং শাটারটা চিচিং ফাঁক। ফর্ক লিফ্ট্, রেলের ওয়াগন, আর্মড গার্ড ... ইঞ্জিন শান্টিং করছে ... 'চক্রবর্তী ভিলা'র বাগানের পিছন থেকে একজোড়া বাইনোকুলার তাকিয়ে আছে শান্টিং-রত ওয়াগনের দিকে।

রঙ্গারাজু ডাকলেন অঞ্জনকে। গবেষণাগারের মধ্যে নিদ্রারত ভার্গভ ও ম্যাথিউসের ঘুম ভাঙাল ওরা। চাঁদিপুর থেকে ফেরত দ্বিতীয় বিকল রকেটটাও আজ তৈরি আছে। চারজনে রকেটটাকে নামিয়ে নিয়ে গিয়ে আর-একটা বাক্সে পুরলেন।

তিনটে। ম্যাজিকের মতো হাজির হল একটা বিরাট ট্রাক।

॥ ৬ ॥

নাগরমল ফোন করলেন।

তেজেন্দ্রের বাড়িতে শেষরাতে শোরগোল।

চক্রবর্তী ভিলার বৈঠকখানায় আলো জ্বলছে।

মালগাড়ি ঘাটশিলার দিকে এগোচ্ছে।

ট্রাকে উঠছে দ্বিতীয় রকেটের বাক্স।

ঘাটশিলার পুবে নাম-না-জানা নদীর ব্রিজের ধারে গাছের ডালে বসে দুজন। কিছু দূরেই ঝোপের আড়ালে আর চারজন।

ট্রাক-ড্রাইভারের পাশে অঞ্জন আর কমান্ডো লেফ্টানান্ট চৌহান। আগে-পরে দু' ট্রাক ব্ল্যাক ক্যাট, তাদের সঙ্গে রঙ্গারাজু। সামনে বাইকে পাইলট, মাঝে ও পিছনে আরও দুই বাইক।

মালগাড়ি ঘাটশিলা পার হল।

ট্রাক ছুটেছে লাইনের সমান্তরাল তেত্রিশ নম্বর সড়ক ধরে। নিঝুম নিশুতি রাতে একফালি চাঁদ মেঘহীন আকাশে, আর সুবর্ণরেখা উপত্যকার দিকে আকাশ থেকে জ্বলজ্বল করে চেয়ে দেখছে হাজার ছয়েক তারা। মৌভাণ্ডারের তামা-নিষ্কাশন কারখানার নাইট-শিফ্টের গুম্ গুম্ শব্দ, নদীর ও পারে নিস্তব্ধ আধা অন্ধকারে ইউরেনিয়াম নিষ্কাশনের কারখানাটা ঘাপ্টি মেরে বসে আছে ওত-পাতা দৈত্যের মতো।

হাইওয়ে দিয়ে ছুটে চলেছে তিনটে ট্রাক, তিনটে বাইক, চৌত্রিশজন মানুষ, কারও মুখে কথা নেই। পূর্ব আকাশে আবছা আলোর রেশ। ঘাটশিলা পেরিয়ে ধলভূমগড়ের দিকে এগোচ্ছে ওরা।

মাঝপথে দু'পাশে দুটো ঢিপি, পেরিয়ে শালবন। পাইলট বাইক বনের মুখে এসেই হর্ন বাজিয়ে রেখে রাস্তা ছেড়ে বাঁয়ে ঝোপের মধ্যে ঢুকে গেল।... ট্রাক গুলো গতি কমাল, ব্রেক কষল।... সামনেরটা থামবার আগেই ধাক্কা খেল রাস্তার উপরে ফেলা গাছের গুঁড়িটাতে। দুম - দুম- দুম - র‍্যাট - ট্যাট ট্যাট

দুই ঢিপির উপর থেকে গুলির ঝড়। লাফিয়ে নেমে গড়িয়ে রাস্তায় শুয়ে পাল্টা গুলি চালাচ্ছে প্রথম ট্রাকের দশজন ব্ল্যাক ক্যাট।... দ্বিতীয় ট্রাকে অঞ্জনের পাশে নেতিয়ে পড়ল ড্রাইভারের শরীর। চৌহান. ইশারা করল অঞ্জনকে, লাফিয়ে নেমে গড়িয়ে ট্রাকের নীচে চলে গেল ওরা দুজনে।

এক মিনিটের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে ওদের সবাই, যতজন সুযোগ পেয়েছে। ব্ল্যাক ক্যাটদের বন্দুক সমানে জবাব দিচ্ছে। চৌহান ও আরও ক'জন কমান্ডো নিঃশব্দে বিনাবাক্যব্যয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আড়ালে দক্ষিণের ঢিপির পাশ কাটিয়ে এগিয়ে গেল।... পিছন থেকে আক্রমণ, দক্ষিণের ঢিপিতে জোর লড়াই। দু'মিনিটেই রণে ভঙ্গ দিল ও দিকের

গুণ্ডারা, রাস্তা পেরিয়ে উল্টোদিকের ঢিপিতে পালাল, পথেও জখম হল চার-ছ'জন।

অ্যাম্বুশের শুরু থেকে পাঁচ মিনিটের মাথায় দক্ষিণের ঢিপি কমান্ডোদের দখলে, এ বার কতকটা সমানে সমানে লড়াই। কিন্তু উত্তরের ঢিপিতে গুণ্ডাদের একটা মেশিনগান আছে। অঞ্জন, রঙ্গারাজু আর কয়েকজন কমান্ডো রাস্তার দক্ষিণের শুকনো নালার মধ্যে আশ্রয় নিয়ে গুলি চালাচ্ছে। ওরা আহত সাত-আটজনকেও টেনে এনেছে নালার আশ্রয়ে, একজন কমান্ডো তাদের ফার্স্ট-এইড দিচ্ছে লড়াইয়ের মধ্যেই।

সমানে গুলি চলছে প্রায় দশ মিনিট, ভোর হতে শুরু করেছে।

কমান্ডোদের প্রধান দল দক্ষিণের ঢিপিতে, নিশ্চয়ই কিছু পরিকল্পনা করেছে এতক্ষণে। গুণ্ডারা লড়াইতে জিততে না-পারলেও 'চক্র'কে ধ্বংস করলেই তো পরোক্ষ ভাবে জিতে যাবে। তবে কমান্ডোদের গুলির ঝড়ে 'চক্র'র কাছে পৌঁছতে পারছে না ওরা।

উত্তরের ঢিপিতে হঠাৎ শোরগোল, ঢিপির পিছন থেকে একনাগাড়ে গুলির শব্দ! ... রাস্তার দিকে গুলি-চলা থেমে গেল।... নালা থেকে রাস্তায় উঠে অটোমেটিক রাইফেলের গুলি চালাতে চালাতে উত্তরের ঢিপির উপর ছুটে উঠল তিনজন কমান্ডো।

রঙ্গারাজু বোঝালেন, 'কমান্ডোরা পশ্চিম দিকে ঘুরে রাস্তা পেরিয়ে, ওদের পিছন থেকে আক্রমণ

করেছে। মেশিনগান তো এ পাশে ফেরানো ছিল। বাকি চারজন কমান্ডো এ বার দক্ষিণের ঢিপি ছেড়ে হাতে বন্দুক বাগিয়ে ছুটে রাস্তা পার হয়ে উত্তরের ঢিপির উপর উঠে গেল।... লড়াইয়ের মোড় ঘুরে গেছে সহজেই বোঝা যাচ্ছে এ বার। সমানে গুলির শব্দ, আর্তনাদ, শোরগোল ঢিপির পিছন থেকে , রাস্তার দিকটা চুপচাপ।

রঙ্গারাজু ও অঞ্জন আহতদের ও চিকিৎসককে পিছনে ফেলে হাতে রিভলবার নিয়ে সাবধানে উত্তরের ঢিপিতে উঠল।

ঢিপির উপর মেশিনগানটা উল্টে পড়ে রয়েছে, তার উপর একটা মৃতদেহ। আক্রমণের মুখে ওটাকে উল্টোদিকে ঘোরাবার চেষ্টা করেছিল সে, সময় পায়নি। আশেপাশে কয়েকজন হতাহত গুণ্ডা, আহত গুণ্ডাদের কাছ থেকে অস্ত্র কেড়ে নিচ্ছে দুজন কমান্ডো। উত্তরের জঙ্গলের ঝোপ, গাছের আড়ালে গুণ্ডাদের প্রধান দল এ দিকে গুলি ছুড়তে ছুড়তে পালাচ্ছে, ধাওয়া করে যাচ্ছে কমান্ডোদের বেশির ভাগেরা।

যে কোনও সেনানায়কদের কাছে যুদ্ধ একটা এস্পার-ওস্পার বুদ্ধির খেলা, প্রাণ নিয়ে 'খেলা'! বুদ্ধি, সাহস, প্রশিক্ষণ, অস্ত্র—সব কিছু নিয়ে 'প্রাণপণ' খেলা! গুণ্ডারা সংখ্যায় বেশি ছিল, অস্ত্র বেশি ছিল ওদের, উপরন্তু অ্যাম্বুশের চমকে আর দু'দিকের ঢিপির আড়াল থেকে গুলি ছুড়ে প্রথমে ভাল মতো এগিয়ে ছিল ওরা। কিন্তু কমান্ডোদের প্রশিক্ষণ, শৃঙ্খলা ও নেতৃত্বের জোরে এই বুদ্ধির লড়াইতে হেরে গেল গুণ্ডার দল।

'দত্ত, এ দিকে এসো।' রাস্তা থেকে ডাক দিল চৌহান। রঙ্গারাজু হাতের ইঙ্গিতে বাইক চালিয়ে ঢিপির উপর উঠে এল। অঞ্জন বসল পিছনে। হুড়মুড় করে ঢাল বেয়ে পাগলের মতো লাফিয়ে ছুটল শক্তিশালী বাইক।

আরেকটা বাইক স্টার্টের আওয়াজ!

চৌহান চালাচ্ছে খ্যাপার মতো, এবড়ো-খেবড়ো জমিতে টগবগে ঘোড়ার মতো লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটছে বাইক, ডাইনে-বাঁয়ে বেঁকে পাথর কাটিয়ে, কোনও ক্রমে ঝুলে আছে অঞ্জন!

দুটো বাইকে পালাচ্ছে চারজন গুণ্ডা। ধাওয়া করছে চৌহান, কিছু পিছনে আরেকটা বাইকে আরও দুজন কমান্ডো।

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু নদী, ধারে আঁকাবাঁকা উঁচুনিচু পাথুরে কাঁচা রাস্তা। নির্জন উপত্যকা কাঁপিয়ে জঙ্গলের ভোরের পাখিদের চমকিয়ে, বিকট গর্জনে ছুটে চলেছে বাইকগুলো—পর পর প্রাণপণে ছুটছে চারটে বাইক, আটজন লোক!

দুম্ দুম্! রিভলবার ছুড়ছে আগের বাইক থেকে। বন্ধুর রাস্তায় ছুটন্ত বাইক থেকে লক্ষ্যভেদ প্রায় অসম্ভব। তিরিশ-চল্লিশ মিটার দূরত্বে পিছিয়ে ওদের পিছনে সেঁটে রয়েছে চৌহান, আর কাছে এগোবার চেষ্টা করছে না। প্রাণপণে ছুটছে চারটে বাইক, আটজন লোক!

একটা ঢিপির উপর মিটার পঞ্চাশেক উঁচুতে উঠেছে রাস্তা। গোঁ-গোঁ করে পার হয়ে গেল প্রথম বাইকটা ... দ্বিতীয়টা ... ঢিপির উপরটা অপেক্ষাকৃত সমান। উপরে পৌঁছবার ঠিক আগে চৌহান চেঁচাল — 'রিভলবার!'

অঞ্জন বের করতেই, ঢালু পথের মুখে ব্রেক কষে বলল, 'মারো এ বার—'

আগের বাইকটা নামছে হুড়মুড় দুদ্দাড়— তাক করল অঞ্জন, ছুড়ল— নাঃ, তক্ষুনি লাফিয়ে উঠল ওই বাইকটা! ... দ্বিতীয়বার ছুড়ল, লাগল না। রেঞ্জের বাইরে যাবার আগে শেষ সুযোগ ... সাবধানে — দুম্! টায়ার!

ডাইনে গোঁত্তা খেয়ে ঢালু জমিতে ডিগবাজি খেল বাইকটা — পিছনের লোকটি লাফাল, বাইকটা ড্রাইভার-সহ তিন লাফের পর দ্বিতীয় ডিগবাজি খেয়ে গাছে ধাক্কা খেল মিটার পঞ্চাশেক দূরে।

'স্টার্ট!' বলতে বলতেই কিক্ মেরে ঢালু পথে প্রচণ্ড জোরে ছুটল চৌহান। লাফিয়ে পড়া লোকটি ইতিমধ্যে দু'বার গড়িয়ে ঝোপের পিছনে শুয়ে পড়ে রিভলবার বের করেছে। চৌহান ছুটছে শতাধিক

কিলোমিটার বেগে, ডাইনে রাস্তার ধারে কাছ থেকেই তাক করছে লোকটি — অঞ্জন দেখতে পাচ্ছে, কিন্তু এত জোরে ছুটবার, লাফাবার মধ্যে কিছু করার নেই ওর। অঞ্জনের দিকেই চেয়ে রয়েছে রিভলবারের নল, গুলি ছুড়ল লোকটা। পাথরে ধাক্কা মেরে মাটি থেকে কয়েক মিটার উঁচুতে বাইককে লাফিয়ে তুলল চৌহান, সার্কাসের খেলার মতো— বেঁচে গেল ওরা!

পিছনের বাইকের দুজন কমান্ডো পিছনের টিপির ওপর এসে, অবস্থা বুঝে বাইক থেকে নেমে গুড়ি মেরে এগিয়ে যাচ্ছে ওই লোকটির দিকে।

চৌহান আর অঞ্জন সর্বোচ্চ গতিতে পাথর থেকে পাথরে লাফিয়ে যাচ্ছে প্রথম বাইকটাকে তাড়া করে। প্রাণপণে ছুটছে দুটো বাইক, চারজন লোক।

উপত্যকা ক্রমশ সরু, আরও সরু। মাঝখানে পাথরে পাথরে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে একফালি ঝর্না। রাস্তা সটান খাড়া নেমে গেছে ঝর্নার দিকে,আবার খাড়া উঠেছে ও পারের পাহাড়ে। আগের বাইকটা গড়গড় করে নেমে, ঝর্না পেরিয়ে উঠছে ও পার বেয়ে, ওরা নামছে খাড়া পথে। প্রাণপণে ছুটছে দুটো বাইক, চারজন লোক।

পাথরের উপর দিয়ে ঝর্না স্রোত, জলে নেমেছে ওরা। পার হওবার সময় আস্তে চালাতেই হবে। দুম - দুম— ওদের টায়ার ফাটল গুলিতে, বাইক উল্টে জলে হুমড়ি খেয়ে পড়ল দুজনে। জলের মধ্যে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে প্রাণ বাঁচাল ওরা। তারপর দুজনে একসঙ্গে রিভলবার তাক করল উপরে ওঠা বাইরের দিকে। বাইকের চাকা ঝোপঝাড়ের আড়ালে, কিন্তু রেঞ্জের বাইরে চলে যাবে, এই শেষ সুযোগ। মারল দুজনে — পিছনের যাত্রীর হাতে লাগল। পড়ল সে রাস্তার ধারে। বাইকচালক একবার পিছন ফিরে, ঝক্কি না নিয়ে, সহযাত্রীকে ফেলেই চালিয়েগেল বাইক। প্রাণপণে ছুটছে একটা বাইক, একজন লোক— ওদের রেঞ্জের বাইরে। পগার পার!

॥ ৭ ॥

গুণ্ডারা সবাই ধরা পড়ল, ওই একজন বাদে। রঙ্গারাজুর গোয়েন্দাদের জিপ চৌহান-অঞ্জনকে নিয়ে জাতীয় সড়কে যখন ফিরে গেল, তখনও সাতটা বাজেনি।

শিউ প্রসাদের কুখ্যাত গুণ্ডাদলের লোক ওরা। কিন্তু বাইকে চম্পট দিয়েছে শিউ প্রসাদ নিজে, বাকিরা জানে না কার হয়ে লড়ছিল ওরা। পয়সার জন্য লড়ছিল বটেই, কিন্তু কার কাছ থেকে পয়সা আসছে, তাও দলপতি ছাড়া কেউ জানে না।

ওরা ফিরল গালুডিতে গবেষণাগারে। 'চক্র' জখম হয়েছে, কিন্তু গুরুতর নয়, মেরামত করা যাবে।

দশ মিনিটের জন্য ছাদে শেষ পরামর্শ সেরে নিল রঙ্গারাজু ও অঞ্জন। রেললাইনের ধারে ধরা পড়া লোক দুটির কাছ থেকে মোক্ষম তথ্য পাওয়া গেছে, জামশিদপুর থেকে ফোর্স আসছে আসল চাঁইকে পাকড়াতে।

এগারোটায় ডাইরেক্টর প্রেমনাথনের ঘরে বৈঠক। উপস্থিত যোশী, রফিক, রঙ্গারাজু, অঞ্জন, চৌহান, আরও কয়েকজন।

রফিকের প্রশ্ন, 'শিউ প্রসাদকে নিয়োগ করেছিল কে?'

রঙ্গারাজু বললেন, 'দত্ত প্রধান কাজটা করেছে, ওই বলবে।'

'চক্রবর্তীর নতুন প্রোজেক্ট হল হাজার বিঘা জমিতে গল্‌ফ কোর্স আর তিন তারার হোটেল।' বলল অঞ্জন, 'রাজগীর - নালন্দা - সারনাথ দেখতে যে বিদেশি বৌদ্ধ ট্যুরিস্টরা আসে তাদেরকে টার্গেট করেই ওঁর জাপানিদের সঙ্গে এই জয়েন্ট ভেঞ্চার। উনি কয়েক কোটি টাকা ঢালবেন প্রোজেক্টে, তাই চেষ্টা করছেন আশেপাশের সব কিছুর খবর রাখতে। উনি তা হলে বাদ গেলেন তালিকা থেকে।'

'বাকি রইল —'

'দ্বিতীয়ত নাগরমল। ইনি বাঁকা লোক এবং বে-আইনী ভাবে জঙ্গলের গাছ কেটে প্রচুর জাতীয় সম্পত্তি ধ্বংস করেছেন। কিন্তু এগুলো আমাদের বিভাগের আওতায় পড়ে না। গত বছর জেল-খাটা

থেকে কোনওরকমে রেহাই পেয়ে নাগরমলের টনক নড়েছে যে ওই পথে বেশি দূর এগোনো যাবে না। এখন এক ইন্দোনেশীয় ব্যবসায়ীর সঙ্গে ওঁর পরিকল্পনা — সুমাত্রা দ্বীপে সেগুন গাছের উৎপাদন বাড়ানো, যাতে সস্তায় ভাল কাঠ আমদানি করে, আধুনিক যন্ত্রপাতি বসিয়ে, প্লাইউড ও ফার্নিচারের উৎপাদন বাড়াতে পারেন। সুতরাং ইনিও বাদ।'

'তা হলে আমাদের প্রতিপক্ষ?'

'হ্যাঁ — তেজেন্দ্র সিং!'

'পালাবে না তো?'

'না। সুযোগ পাবে না।' ঘড়ি দেখে অঞ্জন বলল, 'মিনিট পনেরো আগেই বাড়ি ঘেরাও হয়ে গেছে। যেকোনও মুহূর্তে ওকে গ্রেপ্তার করবে আমাদের গোয়েন্দারা, সামরিকবাহিনীর সহায়তায়।'

'উপযুক্ত প্রমাণ আছে?'

'প্রথম দিনেই কথাটা শুনেছিলাম ওর বৈঠকখানায় আড়িপেতে। পরে রেকর্ড চালিয়ে মানে বুঝে সন্দেহ ঘনীভূত হয়। কথাটা হল 'দুই খোকা' — ব্যবসায়ীদের ভাষায় এর মানে নগদ দু'কোটি টাকা ব্ল্যাক মানি। খবর নিয়ে আমরা নিশ্চিত তেজেন্দ্রের কোনও ব্যবসায়িক লেনদেনে একসঙ্গে এত কালো টাকা আসতে পারে না। আর আজ ভোরে রেলসেতুর পাশে গাছের উপর থেকে যে দুজন গ্রেপ্তার হয়েছে, তারাও তেজেন্দ্রের লোক।'

'তা হলে রহস্যের সমাধান হয়েছে?'

'হয়েছে! কিন্তু তেজেন্দ্র খবর পেল কী করে যে গোপনে ট্রাকে করে একটা রকেট পাঠানো হচ্ছে?'

চৌহান আর রঙ্গারাজুর রিভলবার খাপ থেকে বেরিয়ে এসেছে। দরজার পাশের কমান্ডোরা দেখাদেখি বন্দুক উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে গেছে। ঘরে বাকি সকলে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছেন।

'যখন দেখি সিকিউরিটির মধ্যে গুপ্তচর রয়েছে, তখন এটা নিশ্চিত যে গবেষণাগারের উপর-মহলে ষড়যন্ত্রের জাল ছড়িয়ে পড়েছে।'

যোশী, রফিক, প্রেমনাথন সকলের মুখ পাথরের মতো, কারও মুখে একটা কথা নেই।

'আজ সকালেই আমরা গ্রেপ্তার করেছি সিকিউরিটি অফিসার বিক্রম সিংকে। তেজেন্দ্রের ভাইপো গবেষণাগারে চাকরি নিয়েছিল এই ষড়যন্ত্র করার জন্যেই।'

উত্তেজিত ভাবে যোশী বললেন, 'বিক্রমকে ঢুকিয়ে ছিলেন তো রফিক!'

'বিক্রমের শিক্ষা ও অভিজ্ঞতার সার্টিফিকেটগুলি জাল!'

সকলের চোখ অঞ্জনের দিকে।

'এই জাল সার্টিফিকেটের কথাটা ইন্টারভিউ বোর্ডের একজনই জানতেন। বিক্রমকে ঢোকাবার আগেই এই চক্রান্তের হোতার মন ভারতীয় সরকার ও সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে বিষিয়ে তোলে তেজেন্দ্র। এবং এই ভদ্রলোককে বা ভদ্রবেশী দেশের শত্রুকে বিশ-চল্লিশ লাখ টাকা ঘুষ অফার করে তেজেন্দ্র — ইনি এই লোভ সামলাতে পারেননি!'

রঙ্গারাজু ও চৌহানের রিভলবারের নল তাক করেছে টেবিলের ও পাশে—একই লোকের দিকে!

'আপনার বিদেশের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে প্রথম কিস্তিতে একটা বড় অঙ্কের টাকা তো জমা পড়েছে তাই না? আপনার ব্যক্তিগত মানসিক অশান্তিকে কাজে লাগিয়ে আপনাকে কৌশলে কুপথে টেনে আনে তেজেন্দ্র। হ্যাঁ, আমরা জানি আপনার ভাই ও বোন ক' বছর আগে ভারতীয় সেনাবাহিনীর হাতে মারা যায় জাফনাতে, ঠিক তো?'

দু'হাতে মুখ ঢেকে মাথা নোয়ালেন ডাইরেক্টর প্রেমনাথন।

ছবি : দেবাশিস দেব

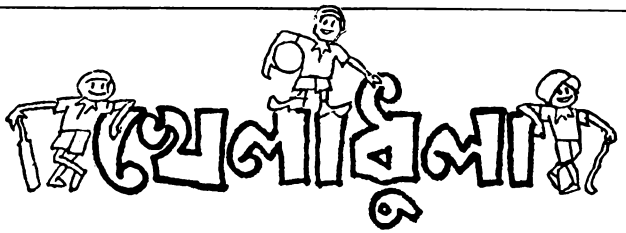

বিশ্বকাপের টুকরো খবর

প্রসাদরঞ্জন রায়

বাবা ও ছেলে বিশ্বকাপ খেলেছেন : পূর্ব অ্যাফ্রিকার ডন প্রিঙ্গল (১৯৭৫) ও ইংল্যান্ডের ডেরেক প্রিঙ্গল (১৯৮৭,১৯৯২)। নিউজিল্যান্ডের ল্যান্স কেয়ার্নস (১৯৭৫) ও ক্রিস কেয়ার্নস (১৯৯২)।

• তিনভাই একই ম্যাচে খেলেছেন নিউজিল্যান্ডের ব্যার, ডেল ও রিচার্ড হ্যাডলি (বনাম ইংল্যান্ড), ১৯৭৫। এ-ছাড়া তিন ভাই বিশ্বকাপ খেলেছেন অস্ট্রেলিয়ার ইয়ান (১৯৭৫), গ্রেগ (১৯৭৫) ও ট্রেভর (১৯৮৩) চ্যাপেল।

• দুইভাই বিশ্বকাপ খেলেছেন জিয়ফ ও হেডলি হাওয়ার্থ (নিউজিল্যান্ড), জেফ ও মার্টিন ক্রো (নিউজিল্যান্ড), ওয়াসিম ও রামিজ রাজা (পাকিস্তান), সিদাথ ও সুনীল ওয়েতিমুনি (শ্রীলঙ্কা), রবি ও রুমেশ রত্নায়েকে (শ্রীলঙ্কা), গ্রান্ট ও অ্যান্ডি ফ্লাওয়ার (জিম্বাবোয়ে), স্টিভ ও মার্ক ওয়াগ (অস্ট্রেলিয়া)।

• বিশ্বকাপের সেরা অধিনায়ক ক্লাইভ লয়েড। ১৮টা ম্যাচে তিনি ১৫ টা জিতেছেন, ২টি হার, ১টা পরিত্যক্ত। প্রসঙ্গত, দুটি হারই ভারতের বিরুদ্ধে (১৯৮৩)।

• লয়েডই একমাত্র অধিনায়ক—যিনি বিশ্বকাপ ফাইনালে 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' সম্মান লাভ করেন অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ১৯৭৫ সালে, ৮২ বলে ১০২ রান করে। বলের হিসেবে আজও এটা দ্রুততম শতরান।

• ১৯৭৫ সালের বিশ্বকাপে লয়েডের ওয়েস্ট ইন্ডিজ দল পাকিস্তানের ২৬৬-৭-এর উত্তরে করে ২০৩-৯। শেষ উইকেটে শ্বাসরোধী জয় এনে দেন ডেরিক মারে (৬১*) ও অ্যান্ডি রবার্টস (২৪*)।

ঐ বিশ্বকাপেই বৃহত্তম জয়ের রেকর্ড করেন ইংল্যান্ড ২০২ রানে ভারতকে হারিয়ে। এই কলঙ্কজনক পরাজয়ে ভারত ৬০ ওভারে মাত্র ১৩২-৩!

• ১৯৭৫ বিশ্বকাপে অস্ট্রেলিয়ার ৩২৮-৫-এর উত্তরে শ্রীলঙ্কা ২৭৬-৪ করে ম্যাচ হারে সসম্মানে। থমসনের বলে তাদের দুই সেরা ব্যাটসম্যান ওয়েতিমুনি ও মেন্দিস আহত হন, কিন্তু শ্রীলঙ্কা লড়াই ছাড়েনি।

• ১৯৭৫-এর সেমিফাইনালের 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' গেরি গিলমোর (৬-১৪) ইংল্যান্ডকে আউট করেন ৯৩ রানে। উত্তরে অস্ট্রেলিয়া যখন ৩৯-৬, ঐ গিলমোরই ২৮* করে ম্যাচ জেতান।

• গিলমোর বিশ্বকাপে মাত্র দুটি ম্যাচ খেলেন। ১৯৭৫-এর সেমিফাইনাল ও ফাইনাল। দুটা ম্যাচে তাঁর সংগ্রহ ১১ টা উইকেট।

• ১৯৭৫ সালে ওভালে অস্ট্রেলিয়া-ওয়েস্ট ইন্ডিজ ম্যাচে দ্রষ্টব্য ছিল কালিচরনের ব্যাটিং। লিলির ১০ বলে ৩৫ রান করেন কালিচরণ। শেষ পর্যন্ত তাঁর সংগ্রহ ৭৮:১৪ টা চার, একটা ছয়।

• ১৯৭৯ বিশ্বকাপে উল্লেখযোগ্য ওয়েস্ট ইন্ডিজ-শ্রীলঙ্কা পরিত্যক্ত ম্যাচ। এটা বিশ্বকাপের একমাত্র ম্যাচ, যাতে একটা বলও হয়নি।

• ঐ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ক্যানাডা করে ৪০.৩ ওভারে ৪৫। রানের গতি ১.১১!

• ১৯৭৯ বিশ্ব কাপে ইংল্যান্ড-পাকিস্তান ম্যাচে ইংল্যান্ড ১৬৫-৯ করেও ম্যাচ জিতে যায় মিক হেনড্রিকের বোলিং-এ। হেনড্রিক (৪-১৫) মজিদ, সাদিক, মুদস্সর ও হারুন রশিদকে আউট করে পাকিস্তানকে ৩৪/৬ করে দেন এবং ইংল্যান্ডের জেতার পথ সুগম করেন।

• ১৯৭৯ বিশ্বকাপ সেমিফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজের ২৯৩-৬-এর উত্তরে পাকিস্তান করে ১৭৬-১। মজিদ (৮১) আর জাহির (৯৩) ৩৬ ওভারে ১৬৬ রান করেন। তখনই ক্রফ্ট ১২ বলে মজিদ, জাহির ও জাভেদকে আউট করেন আর পাকিস্তানের শেষ ৯টা ইউকেট পড়ে যায় মাত্র ৭৪ রানে!

• ১৯৭৯ বিশ্বকাপ ফাইনালে ওয়েস্ট ইন্ডিজ ৩০ ওভারে ৯৯-৪—গ্রীনিজ, হেইন্স, কালিচরন আর রিচার্ডস আউট। শেষ স্বীকৃত জুটি কলিস কিং আর ভি রিচার্ডস ২১ ওভারে ৭৭ মিনিটে ১৩৯ রান করেন। কিং (৮৬) : ১০ টা চার, ৩টে ছয় ; রিচার্ডস (১৩৮*): ১১টা চার তিনটে ছয়। রাজসিক ব্যাটিং!

১৯৮৩ বিশ্বকাপে ইংল্যান্ড শুরু করে রাজকীয় ভঙ্গীতে—নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৬০ ওভারে ৩২২-৬, শেষ ১০ ওভারে ৯০ রান! মাইক স্লেডেন ১২ ওভারে ১০৫ রান দেন।

• ঐ বিশ্বকাপেই নটিংহামে অধিনায়ক ডানকান ফ্লেচারের অল-রাউন্ড কৃতিত্বে (৬৯* রান ও ৪-৪২) জিম্বাবোয়ে হারিয়ে দেয় শক্তিধর অস্ট্রেলিয়াকে।

• নিউজিল্যান্ডের রিচার্ড হ্যাডলি বলের বিক্রম দেখান পর পর ম্যাচে পাকিস্তানের সঙ্গে ৩-২০ শ্রীলঙ্কার সঙ্গে ৫-২৫ আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে ৩-৩২ নিয়ে।

• শ্রীলঙ্কার অশান্ত ডিমেলও পরপর ম্যাচে পাকিস্তানের সঙ্গে ৫-৩৯ আর ইংল্যান্ডের সঙ্গে ৫-৩২ নেন। গিলমোর ছাড়া আর-কেউ পর পর ম্যাচে পাঁচ ইউকেট নিতে পারেননি।

• টানব্রিজ ওয়েলসে কপিলের কীর্তি বহুআলোচিত। কপিল নামার সময়ে ভারত ১৭-৫। বিনির সঙ্গে ৬ষ্ঠ উইকেটে ৬০ রান জোড়ার পর, আবার পরপর দুই উইকেট হারিয়ে ৭৮-৭। সে-অবস্থায় মদনলালের সঙ্গে ৮ম উইকেটে ৬২ রান জুড়ে, আবার কিরমানির সঙ্গে ৯ম উইকেটে ১২৬*। কপিল ১৭৫*: ১৬×৪, ৬×৬!

• ১৯৮৩-র বিশ্বকাপে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে 'ম্যান অব্ দ্য ম্যাচ' মহীন্দর অমরনাথ। এর আগে বা পরে কখনও তা হয়নি।

• ১৯৮৩-র ফাইনালে সবচেয়ে কম রান (১৮৩) করেও ভারত জয়ী। এও এক ধরনের রেকর্ড।

• ১৯৮৭ বিশ্বকাপে মাদ্রাজে অস্ট্রেলিয়ার ২৭০-৬-এর প্রত্যুত্তরে ভারত এক বল থাকতে অল আউট হয় ২৬৯ রানে। ১ রানে পরাজয়!

• করাচিতে ওয়েস্ট ইন্ডিজ শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ৩৬০-৪ করে। রানের গড় ৭.২০। এই প্রথম দু'জন ব্যাটসম্যান সেঞ্চুরি করেন: হেইন্স (১০৫), রিচার্ডস (১৮১)। ডি মেল ১০ ওভারে ৯৭ রান দেন। রিচার্ডস (১৮১) : ১৬×৪, ৬×৬!

• লাহোরে শেষ বলে ওয়েস্ট ইন্ডিজের (২১৬) বিরুদ্ধে জয় পেলো পাকিস্তান (২১৭-৯)। শেষ ওভারে ১৪ রান করেন কাদির ও সেলিম জাফর। অবশ্য জাফরকে রান আউট করার সুযোগ পেয়েও ছেড়ে দেয় ওয়ালশ।

• ইন্দোরে বৃষ্টি-বিঘ্নিত ৩০ ওভারের ম্যাচে শেষ বলে পরাজিত হয় নিউজিল্যান্ড। অস্ট্রেলিয়া ১৯৯-৪, নিউজিল্যান্ড ১৯৬-৯। গড় রান-রেট ৬.৫৮।

নাগপুরে নিউজিল্যান্ডের ২২১-৯-এর উত্তরে ভারত ৩২.১ ওভারে ২২৪-১! গড় রান-রেট : ৬.৯৬! গাভাসকর (১০৩*) তাঁর একমাত্র সেঞ্চুরি করেন এই ম্যাচে—৮৮ বলে ১০৩*।

• ১৯৮৭ বিশ্বকাপেই প্রথম দুই গ্রুপেরই চ্যাম্পিয়ন—ভারত আর পাকিস্তান সেমিফাইনালে পরাজিত হয়।

• এই প্রথম ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া ফাইনাল। আর ওয়েস্ট ইন্ডিজ ফাইনালে কেন, সেমিফাইনালেও উঠতে পারেনি!

• ১৯৯২ বিশ্বকাপে একেবারে শেষ সময় দক্ষিণ আফ্রিকাকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই প্রথম ৯টা দলের মধ্যে লীগ প্রথায় খেলা হয়।

• ১৯৮৭-র বিশ্বকাপ চ্যাম্পিয়ন অস্ট্রেলিয়াকে ১৯৯২ তে প্রথম ম্যাচেই হারিয়ে দেয় নিউজিল্যান্ড। ঠিক যেমন ১৯৮৩ সালে প্রথম ম্যাচে ভারত ওয়েস্ট ইন্ডিজকে আর ১৯৮৭ সালে প্রথম ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে হারায়।

• নিউ প্লিমাথে নিউজিল্যান্ড-জিম্বাবোয়ের খেলাটাই একমাত্র ম্যাচ, যেখানে দুই দলই ৩০০ রানের বেশি করেছে। জিম্বাবোয়ে ৩১২-৪, নিউজিল্যান্ড৩১৩-৭ (চার বল থাকতে)। প্রথম ইনিংসে এত রান করে আর-কোনও দল ম্যাচ হারেনি।

• ঐ ম্যাচেই ফ্লাওয়ার হলেন সর্বকনিষ্ঠ খেলোয়াড়, যিনি বিশ্বকাপে সেঞ্চুরি করেছেন: বয়স ২৩ বছর ৩০১ দিন।

• মেলবোর্নেপাকিস্তানকে ১০ উইকেটে হারায় ওয়েস্ট ইন্ডিজ : পাকিস্তান২২০-২, ওয়েস্ট ইন্ডিজ ২২১-০। অবশ্য হেইন্স আর লারা১৭৫ রান করার পর লারা আহত হয়ে অবসর নেন। বাকি ৪৬ রান করেছেন হেইন্স ও রিচার্ডসন। টার্নার-ম্যাক্‌কস্কারের প্রথম উইকেটে ১৮২ রানের রেকর্ড অবিকৃত রয়ে গেল। এর আগেও অবশ্য ১০ উইকেটে জিতেছে পূর্ব আফ্রিকার বিরুদ্ধে ভারত (১৯৭৫) আর জিম্বাবোয়ের বিরুদ্ধে ওয়েস্ট ইন্ডিজ (১৯৮৩)।

• ইংল্যান্ড, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, ওয়েস্ট ইন্ডিজ আর জিম্বাবোয়ের পর বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচই জিতল দক্ষিণ আফ্রিকা অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে, সিডনিতে। দক্ষিণ আফ্রিকাই প্রথম দল, যারা নির্দিষ্ট সময়ে ৫০ ওভার বল করতে না-পারায় ফাইন দিতে বাধ্য হয়।

• ম্যাকেতে ভারত-শ্রীলঙ্কা খেলা দু'বল পরেই পরিত্যক্ত হয়।

• এডিলেডে পাকিস্তানকে ৭৪ রানে আউট করেও ইংল্যান্ড ম্যাচ জিততে পারেনি বৃষ্টির জন্য। পাকিস্তানের ইনিংসে প্রিঙ্গলের বোলিং : ৮.২-৫-৮-৩।

ব্রিসবেনে বৃষ্টির জন্য তিন ওভার কম হওয়ার ফলে ভারত আবার অস্ট্রেলিয়ার কাছে হারে ১ রানে।

• নেপিয়ারে নিউজিল্যান্ড-জিম্বাবোয়ে ম্যাচটা বৃষ্টির জন্য ১৮ ওভারের ম্যাচে পরিণত হয়।

• ভারত পাকিস্তানের বিরুদ্ধে বিশ্বকাপে প্রথম ম্যাচ খেলে জেতে সিডনিতে।

• মেরিক প্রিঙ্গলের বোলিং (৮-৪-১১-৪) দক্ষিণ আফ্রিকাকে জয় এনে দেয় ওয়েস্ট ইন্ডিজের বিরুদ্ধে ক্রাইস্টচার্চে।

• কানবেরাতে দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে জিম্বাবোয়ে করে ১৬৩। অতিরিক্ত ২৮ রান ছিল তাদের সর্বোচ্চ।

• নিউজিল্যান্ডের বোলিং নিয়মিত ওপেন করেছেন স্পিনার দীপক প্যাটেল। এরকম ঘটনা আগে ঘটেছে ১৯৭৫ সালে : পাত্র শ্রীলঙ্কার সোমচন্দ্র ডিসিলভা।

• নিউজিল্যান্ড ১৯৯২ বিশ্বকাপে অভূতপূর্ব পর পর ৭ টা ম্যাচ জেতে। শেষ দুটো ম্যাচে তাঁদের হারায় পাকিস্তান-একবার লীগে ও আবার সেমিফাইনালে।

• অন্যদিকে পাকিস্তান তিনটে ম্যাচ হেরে ও একটা ম্যাচ পরিত্যক্ত হবার পর, লীগের শেষ তিনটে ম্যাচ জিতে সেমিফাইনালে যায়। তার পরেও তারা জেতে সেমিফাইনাল ও ফাইনালে।

• প্রাক্তন চ্যাম্পিয়ন ওয়েস্ট ইন্ডিজ, অস্ট্রেলিয়া, ভারত কেউই সেমিফাইনালে উঠতে পারেনি।

• জিম্বাবোয়ে (১৩৪) তাদের শেষ ম্যাচে ইংল্যান্ডকে (১২৫) হারায় অ্যালবারিতে। এত কম রান করে ম্যাচ জেতার নজির আর নেই।

• ১৯৯২ বিশ্বকাপে বৃষ্টির জন্য কম ওভারের খেলা হয়েছে ৯ টা ম্যাচে। এক ওভার কম বল হয়েছে দুটো ম্যাচে। মাত্র ৯টা ম্যাচে দুটো দলই ৫০ ওভার ব্যাট করেছে।

পরবর্তী সংখ্যারূপে প্রকাশিত হবে
বি রা ট আ কা রে র
ফাল্গুন - চৈত্র যুগ্ম সংখ্যা
অনেক গল্প - কবিতা - প্রবন্ধ - উপন্যাস থাকছে এই সংখ্যায়

আমার প্রিয় ঋতু

শিঞ্জিনী দাশগুপ্ত
গ্রাহক সংখ্যা ১৬১৬। ১১ বছর ৭ মাস

ছটা ঋতুর মধ্যে শরৎকাল আর বসন্তকাল আমার ভাল লাগে। তার মধ্য বসন্তকালকে বেশি ভাল লাগে। শীতকাল চলে যাচ্ছে আর বসন্তকাল আসছে, আর কিছুদিন পরে বসন্তের দূত, কোকিল বসন্তের আগমন বার্তা জানাবার জন্য কুহু কুহু করে ডেকে উঠবে। গাছে গাছে সাজ সাজ রব পড়ে যাবে। শিরীষ, বকুল, গাছে গাছে ফুল ফোটাবে। তারা তাদের ফুলের ডালা দিয়ে বসন্তকে অভ্যর্থনা জানাবে। বসন্তের অঞ্জলি ফুলে ভরে যাবে। সে শীতকে চলে যাওয়ার জন্য তার হাতের ফুল ছুঁড়ে মারবে। শীত ভয়ে তার উত্তুরে হাওয়া ঝরাপাতা নিয়ে উড়ে কোথায় চলে যাবে কে জানে! বসন্ত তাই দেখে হাসবে।

বসন্ত এলে শুধু গাছে গাছে রব পড়ে যায় না, সব প্রাণীরাই সাজতে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। পলাশ গাছগুলোতে যেন আগুন ধরে যায়। তখন মনে পড়ে গুরুদেবের লেখা গান 'ওরে ভাই ফাগুন লেগেছে বনে বনে'। তারপর একদিন আসবে বসন্ত উৎসব। সেদিন আমরা পলাশ ফুলের মালা পরে নাচ গান করব। তারপর লাল আবীরের রঙে মাটি আকাশ সবই রক্তিম হয়ে উঠবে। মনে পড়বে গুরুদেবের লেখা গান, 'যাও গো এবার যাওয়ার আগে রাঙিয়ে দিয়ে যাও।' এরকম নানা আনন্দের মধ্যে দিয়ে বসন্ত আমাদের মাতিয়ে রাখে। বসন্ত চলে যাওয়ার আগে গাছে গাছে আমের মুকুলগুলো বেশ বড় হয়ে ওঠে। তাই দেখে বোঝা যায় বসন্ত চলে যাচ্ছে আর গ্রীষ্ম আসছে। তারপর তার বিদায়ের পালা শুরু হয়। তখন গাছেরা তাদের ফুল দিয়ে মালা গেঁথে বসন্তকে জয়ের মালা পরিয়ে দেয়। সবাই যে যার সাজ খসিয়ে ফেলে বিষণ্ণ মনে বসন্তকে বিদায় দেয়। তখন মনে পড়ে গুরুদেবের লেখা গান, 'চলে যায় মরি হায় বসন্তের দিন চলে যায়'। আমরা বসন্তকে ঋতুরাজ বলি। সে সবার পরে সবার মনে আনন্দ দিয়ে রাজার মত আসে। তারপর চলে যায়। সে যখন চলে যায়, তখন আমি আবার সে কবে আসবে তার জন্যে অধীর অপেক্ষায় থাকি। আমার মনে হয় শুধু আমিই একা অধীর অপেক্ষায় বসে থাকি না। অন্যেরাও থাকে। কলকাতায় থাকলে বসন্তকে ঠিক ভাবে চিনতে পারি না। সেই সুবিধা হয় শান্তিনিকেতনে থাকলে। থাক আর বসন্তের বিদায়ের কথা লিখে লাভ নেই। এখন বসন্ত এসে গেছে। সামনে বসন্ত উৎসব। খুব মজা হচ্ছে। মনে খালি একটা কথা ঘুরছে, বসন্ত এসেছে, বসন্ত এসেছে।

সাগ্নিক গঙ্গোপাধ্যায়

গ্রাহক সংখ্যা ৫২০১। ৫ বছর ৮ মাস

ফাগুন এল

প্রিয়াঙ্কা পাত্র / ১৩ বছর / ১৬১৩

নানান রঙে মাতিয়ে এল ফাগুন রাণী দোল
পারুল, বসন, তিলোত্তমা খোল রে দুয়ার খোল।
বাতাস বহে ফুর ফুর ফুর,
ফুলের সুবাস মিষ্টি মধুর,
মনে নানান সুর।
নদী, পাহাড়, সাগর অতল
দুখীর মনেও লাগল রে দোল,
আয়রে সবাই আনন্দেতে রাঙিয়ে দিই জীবন!
দোলের পরশ মাতিয়ে দিল বিশ্ববাসীর মন।

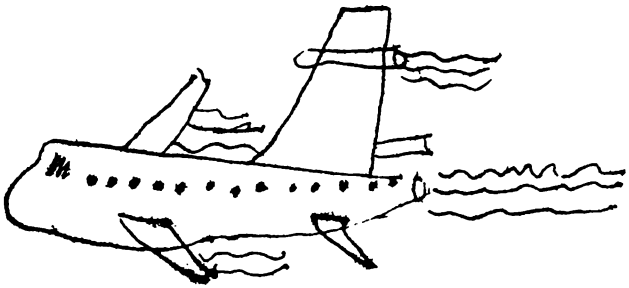

অপরাজিত চক্রবর্তী /৫ বছর / ২৫৬২

রোদ্দুর

দেবেশী চক্রবর্তী / ১৬ বছর / ৩৩৫৯

রোদ্দুর ঘাসের ডগায় শিশিরের উপর রামধনুর খেলা দেখছিল। তারপর একটা শিশিরের বিন্দু সে হাতে নিল। নিয়ে দেখল, তার হাতেও তা ঝলমল করছে। ভারি মজা লাগল তার। হাতটা একটু এপাশ ও ওপাশ নাড়াতে, জলের ফোঁটাও গড়িয়ে যেতে লাগল। খিলখিল করে হেসে উঠল সে। হঠাৎ হাত থেকে গড়িয়ে পড়ে গেল শিশিরের ফোঁটা। 'যাঃ' বলে উঠল রোদ্দুর। তার চোখে পড়ল। একটা হলদে প্রজাপতি ফুলের উপর বসে আছে। একটু ভালো করে প্রজাপতিটাকে দেখবে বলে কাছে যেতেই, হু .....স, উড়ে গেল প্রজাপতিটা। হঠাৎ কোন গাছ থেকে ডেকে উঠল এক নাম না জানা পাখি। অজানা পাখির ডাকে সে আনমনা হয়ে গেল। আবার ডাকল পাখিটা, আবার, আবার ডাকল। রোদ্দুর উঠে দাঁড়াল। তড়িৎ খেলে গেল তার শরীরে। অজানা পাখির সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে ছুটে চলল সে, দু হাত বাড়িয়ে। কোন কোন সময়ে সে থেমে কান পেতে শোনে, আবার পাখিটার ডাক শোনামাত্র খিল খিল করে হেসে ওঠে, আনন্দে। উৎসাহে চক চক করে তার বড় বড় চোখ। এমনি করে শেষমেষ সে খুঁজে পায় পাখিটাকে। সূর্যাস্তের সময়, শেষ রবিকিরণে স্নান করে রোদ্দুরের রাঙা মুখ ও তার কাঁধে বসা সেই পাখিটা। এমনি করে দিনের শেষে রোদ্দুরের বন্ধুত্ব হয় সেই পাখিটার সঙ্গে।

রোদ্দুর শহুরে ছেলে। তা সত্ত্বেও গাছপালা, ফুলপাখি এ সবকে সে প্রচণ্ড ভালোবাসে। তার কিন্তু সেলিম আলির মত অত পাখির সম্বন্ধে জানা নেই, সে অত গাছ, ফুল কিছুই চেনে না। তবুও সে ভালোবাসে। ভালোবাসে ঘরের কোণের চড়ুইদের বাসা বানানো দেখতে। কাকেদের চুপিচুপি খেতে দিতে, ছোট পাত্রে কড়াইশুঁটির গাছ লাগাতে। সে সমুদ্রে যায় নি, যায় নি গ্রামে। কিন্তু তবুও সে এই প্রকৃতিকে প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। ও, হ্যাঁ, বলতেই ভুলে গেছি। রোদ্দুর ছবি আঁকতে খুব ভালোবাসে। তার কাকার বদলির চাকরি। কাকাই তাকে সমুদ্রের, পাহাড়ের, জঙ্গলের গল্প শোনায়। রোদ্দুর মন দিয়ে শোনে আর মন থেকে ছবি আঁকে। এবার তার পরীক্ষা হয়ে যাওয়াতে সে চলে এসেছে দারজিলিং এর একটা গ্রামে, কাকার কাছে।

এখানে এসে তার কি আনন্দ। সব কিছু সে দু চোখ মেলে দেখছে। কাকু ভোরবেলা অফিসে চলে গেলে সে চুপিচুপি চলে আসে বনে। সেখানেই তার বন্ধুত্ব সেই পাখিটার সঙ্গে।

রোজকার মত সে রবির সঙ্গে খেলে বাড়ি ফিরছিল। হঠাৎ সে দুটো গুণ্ডামত লোককে দেখল ঝোপের আড়ালে কী যেন করছে। লুকিয়ে কাছে গিয়ে রোদ্দুর ওদের কথা স্পষ্ট শুনতে পেল। ওরা বলাবলি করছিল যে সেদিন রাত্রে ওরা নাকি এই পাহাড়ে বোমা বিস্ফোরণ করে সব গাছ, জন্তু, মানুষকে উড়িয়ে দেবে। রোদ্দুর শিউরে উঠল, তার মানে এই বন, যা তার কাছে নন্দন কাননের মত তা উড়িয়ে দেবে। তার বন্ধু রবি ও অন্যান্য সব জন্তুকে ধ্বংস করে দেবে। কখনোই তা

রোদ্দুর হতে দেবে না। সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছিল, বাড়ি ফিরতে ফিরতে অনেক রাত হয়ে গেল। কিন্তু হায়, বাড়ি গিয়ে দেখলে কাকা নেই। তাকে খুঁজতেই বেরিয়েছেন তিনি। রোদ্দুর আতঙ্কে শিউরে উঠল। আর কিছুক্ষণ পরেই তো বিস্ফোরণ হবে। তার কাকুও বনে! সে দুই দারোয়ানকে ডেকে সব বলল। একজনকে পাঠাল কাকুকে খুঁজতে, আর আর একজনকে পুলিস ডাকতে, রোদ্দুর নিজে গেল বিস্ফোরণ থামাতে। ঘন কালো অন্ধকার ভেদ করে রোদ্দুর ছুটে চলল। ছুটতে ছুটতে পৌঁছে গেল সেইখানে, যেখানে গুণ্ডারা বিস্ফোরকটাকে রেখেছিল। রোদ্দুর কিছু বুঝতে না পেরে, দাঁত দিয়ে ওটার সঙ্গে সংলগ্ন তারকে ছিঁড়তে লাগল। ঠোঁট দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল তবু সে শেষে, ছিড়তে পারল। রক্তাক্ত মুখ নিয়ে ধুঁকে ধুঁকে ক্লান্ত রোদ্দুর ফিরে যাচ্ছিল, এমন সময় পেছন থেকে কে যেন তার মাথায় সজোরে আঘাত করল। রোদ্দুর 'আঃ' বলে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। কাকু পুলিশ সমেত যখন বনে গেল, তারা সেই অন্ধকারে

রোদ্দুরকে খুঁজে পেল না। সেই রাত ছিল ভয়ানক রাত। কনকনে শীতের হাওয়া প্রলয়নৃত্য শুরু করলো। মড় মড়্ করে একটা গাছ ভাঙার আওয়াজ কাকুর কানে পৌঁছল।

ভোরের রাশি রাশি ঝরা পাতার উপর দিয়ে যেতে যেতে কাকু, পুলিস ও গ্রামবাসীরা দেখতে পেল, একটা ভেঙে পড়া গাছের তলায় বন্দী সেই দুটো গুণ্ডা। রাশি রাশি পাতার স্তর সরিয়ে, পরে পাওয়া গেল রোদ্দুরকে। সে মাটিতে শুয়ে ছিল রক্তাক্ত দেহে। তার আঙুলটা হঠাৎ নড়ে উঠল। সে আকাশের দিকে হাত বাড়িয়ে কী যেন ধরতে চাইল। না। ধপ করে পড়ে গেল হাতটা। তারপর আর নড়ল না। দূরে — অ — নে — ক, দূ — রে, এক অজানা পাখি যেন যন্ত্রনায় কেঁদে উঠল। ছোট্ট মিষ্টি একটা প্রাণ ওই দূরে কোথায়, ওই পাখির ডাকের প্রতিধ্বনির সঙ্গে হারিয়ে গেল। কুয়াশা ভেদ করে সূর্য তার ঝলমলে রবিকিরণ দিয়ে প্রকৃতির সন্তানের পিঠ চাপড়ে দিয়ে বলে উঠল — 'হ্যাঁ, রোদ্দুর, তুমি জিতেছ'।